অনেক দিনের মনের মানুষ

অনেক দিনের মনের মানুষ

দে'জ পাবলিশিং ॥ কলকাতা ৭০০০৭৩

স্নেহের
টুকুকে

এই লেখকের অন্যান্য বই

বৌবাজারের বৌদি
উর্বশী
বন্দিনী
স্বপ্নভঙ্গ
ফুটবলার
একান্ত নিজস্ব
ভবঘুরে
কয়েদী
নিউএম্পায়ার ক্লাব
কেরানী
ককটেল
প্রবেশ নিষেধ
ডিফেন্স কলোনী
ইমনকল্যাণ
সদর ঘাট
গোধূলিয়া
পার্লামেণ্ট স্ট্রীট
রাজধানীর নেপথ্যে
ভদ্দরলোক
আকাশ ভরা সূর্য তারা
ওয়ান আপ টু ডাউন
ডিপ্লোম্যাট
অ্যালবাম
ভালোবাসা
সোনালী
ম্যাডাম
রিটায়ার্ড
গল্পসমগ্র (১ম), (২য়)
রাগ আশাবরী
পিয়াসা
চীনাবাজার
এক চক্কর দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়া
শ্রেষ্ঠাংশে
ফুটপাথ
মেমসাহেব
নিউ মার্কেট
রম্ভা
নিমন্ত্রণ
ভি. আই. পি
লাস্ট কাউণ্টার
ব্যাচেলার
চিড়িয়াখানা
পূজা স্পেশাল
তোমাকে
উইংকমাণ্ডার
রিপোর্টার
অ্যালো ইণ্ডিয়ান
মোগলসরাই জংশন
এডিসি
স্বার্থপর
সাব-ইন্সপেক্টর
পেনফ্রেণ্ড এ্যাণ্ড ক্লাসফ্রেণ্ড
পিকাডিলী সার্কাস
হরেকৃষ্ণ জুয়েলার্স
জার্নালিস্টের জার্নাল
শ্রেষ্ঠ গল্প
ইওর অনার
ডার্লিং
রবিবার
প্রিয়বরেষু
নাচনী
ম্যারেজ রেজিস্টার

এই বইতে যে উপন্যাসগুলো আছে—

অন্যদিন

'এই গণেশ !'

দোকানের সামনে তিন-চারটি ছোট ছোট ছেলেমেয়ে। সবাই খদ্দের। কেউ পাঁচ পয়সার লজেন্স, দশ পয়সার টফি নেবে। কেউ নেবে শ্লেট-পেন্সিল অথবা একটা সানলাইট সাবান। গণেশ শেলফ্ থেকে সানলাইট সাবান নিতে গিয়েই ডাক শুনে পিছন ফিরে দেখল গোরা।

'কি গোরাদা, আজ এত সকাল সকাল বেরুচ্ছ?' দু' প্যাকেট উইলস্ ফ্লেক আর একটা টেক্কা মার্কা দেশলাই গোরার হাতে তুলে দিতে দিতে প্রশ্ন করে গণেশ।

গোরা পকেটে সিগারেট-দেশলাই রাখতে রাখতে বলল, 'মিস্ত্রীদের মাইনে দিতে হালুয়া টাইট হয়ে গেলে কি হয়, ইনকাম্ ট্যাক্সের ঝামেলা তো আছে।'

আর কথা বলার টাইম নেই গোরার। নিজেই ঝুঁকে পড়ে টফি-লজেন্স-বিস্কুটের কৌটা-বয়ামের ওপাশ থেকে দুটো টুকরো সুপুরি নিয়ে মুখে দিয়েই চলে গেল।

'দাও গণেশদা, তাড়াতাড়ি দাও। আমার ইস্কুল নেই বুঝি?'

কার্তিকদার মেয়ের কথা শুনেও গণেশ তাড়াতাড়ি করে না। হাসে। জিজ্ঞাসা করে, 'তুই কোন্ স্কুলে পড়িস?'

'শ্রী বিদ্যামন্দিরে। তাও জান না?'

টফি-লজেন্সের খদ্দেরদের মিটিয়ে শ্লেট-পেন্সিলের বাক্সটা পাড়তে যাবে, ঠিক সেই সময় রুমাল দিয়ে মুখ মুছতে মুছতে অনিল সরকার দোকানের সামনে এসে দাঁড়াতেই গণেশ চটপট উইলস্ ফিল্টার কিং-এর বড় একটা প্যাকেট এগিয়ে দিল। অনিলবাবু হাসলেন, গণেশও।

'আর কতক্ষণ দাঁড়াব বল তো গণেশদা? দেরি করে ইস্কুলে গেলে বড় দিদিমণি কি বকেন জান?'

বার বার উঠতে বসতে লুঙ্গিটা ঢিলে হয়ে গিয়েছিল। গণেশ লুঙ্গিটা ঠিক করে হাসতে হাসতে বলল, 'তোর বড় দিদিমণিকে বলিস আমার দোকানে এসে দেরী হয়ে গেছে।'

কার্তিকদার মেয়ে চোখ দুটো বড় বড় করে মাথা দোলাতে দোলাতে বলল, 'আহাহা, তাই বুঝি বলা যায়?'

শেলফ্-এর উপরের তাক থেকে শ্লেট-পেন্সিলের বাক্সটা পাড়তে পাড়তে গণেশ বলল, 'আমি বলছি তুই বলিস।'

'শেষকালে যদি বকুনি খাই?'

'তাহলে আমি তোর বড় দিদিমণিকেই বকে দেব।'

কার্তিকদার মেয়ে মুখ বেঁকিয়ে বলল, 'কি অসভ্য তুমি।'

কার্তিকদার মেয়ে দশ পয়সা দিয়ে শ্লেট-পেন্সিল নিয়েই চলে গেল! সঙ্গে সঙ্গে একঝাঁক খদ্দের।

'বি কুইক!' নন্দ গণেশের দোকানের ছোট্ট আয়নায় নিজের মুখ দেখতে দেখতে বলল।

গণেশ গম্ভীর হয়ে অন্য খদ্দেরদের পান-বিড়ি-সিগারেট দেশলাই দিতে দিতে বলল, 'তোকে সবচাইতে লাস্টে দেব।'

নন্দ তখনও আয়নায় মুখ দেখছে। বলল, 'কেন?'

গণেশ একটাকা-দু'টাকার নোট নিচ্ছে। হিসেব করে খুচরো পয়সা ফিরিয়ে দিচ্ছে। নতুন সিগারেটের প্যাকেট থেকে পাঁচটা ফোর স্কোয়ার খালি প্যাকেটে ভরে দিচ্ছে। রেলের বুকিং-ক্লার্কের মত চটপট হাত চলছে। সঙ্গে সঙ্গে হিসেব-নিকেশের কথাও চলছে। পাঁচটাকার নোটটা হাতে ধরে জিজ্ঞাসা করল, 'কালকের এক পঁচাত্তর কেটে নেব?'

'নিবি, নে।'

নন্দ একটু চড়া সুরে জিজ্ঞেস করল, 'কিরে, দিবি কি দিবি না তাই বল্!'

গণেশও একটু চড়া মেজাজে জবাব দেয়, 'তোর এত তাড়া কিসের রে?'

তখনও দু'তিনজন খদ্দের দাঁড়িয়ে। মায়া প্রায় ছুটতে ছুটতে এসে বলল, 'চট করে একটা লাক্স সাবান দাও তো গণেশদা।'

মায়াকে দেখেই নন্দর মুখ থেকে বিরক্তির ভাব উবে গেল। হাসতে হাসতে বলল, 'ফিল্ম-স্টারদের মত তুইও কি লাক্স মাখা ধরেছিস?'

মায়া একবার নন্দকে দেখেই মুখ ঘুরিয়ে নেয়। গণেশের হাত থেকে সাবান নিয়েই বলল, 'কলেজ যাবার সময় দাম দিয়ে যাচ্ছি।'

অন্য দু'তিনজন খদ্দের চলে যেতেই নন্দ বলল, 'তুই শালা বেশ আছিস।'

'কেন?'

'ইন্দিরা গান্ধীর গোলামী না করে তোর মত একটা বিড়ি-সিগারেটের দোকান খুললেও লাইফটা ভাল কাটাতে পারতাম।'

গণেশ নন্দর মনের দুঃখের কারণ বুঝতে পারে। গম্ভীর হয়ে বলল, 'তোর মত খচ্চর ছেলে দোকান খুললে কি এসব খদ্দের আসত?'

নন্দ হাসে। 'দে দে। আর দেরী করাস না।'

গণেশ ওকে এক প্যাকেট পানামা দিতে দিতেই জিজ্ঞাসা করল, 'উনি বুঝি বিডন স্ট্রীটের মোড়ে আজও দাঁড়িয়ে থাকবেন?'

নন্দ শুধু হাসল।

'তোদের টেলিফোন ভবনের বাইরে সাইনবোর্ড ঝুলিয়ে দেব, 'প্রজাপতি অফিস'।'

নন্দ হাতের ঘড়িটার উপর চোখ বুলিয়ে গিরীশ এভিনিউর দিকে এগুতেই গণেশ বলল, 'বিকেলে কিছু দিস।'

ও এগুতে এগুতেই একবার পিছন ফিরে তাকিয়ে শুধু বলল, 'পরশু।'

আকাশ দিয়ে মাঝে মাঝে একঝাঁক পাখী উড়ে যায়। তারপর কিছুক্ষণ নীল আকাশের কোলে একটা পাখীও দেখা যায় না। চারদিকে তাকিয়েও দেখা যায় না। গণেশের দোকানেও ঠিক তেমনি একঝাঁক খদ্দের আসার পর বেশ কিছুক্ষণ একজনও খদ্দের আসে না। বিশেষ করে সকালের দিকে।

আগে গণেশ ভাবত খদ্দেররা কি নিজেদের মধ্যে আলাপ-আলোচনা করে দোকানে আসে? একসঙ্গে দল পাকিয়ে না এসে সারাদিন ধরে এক-একজন করে এলেই তো ভাল হয়। এখন এসব ছেলেমানুষী কথা ভাবে না। সকালবেলার দিকে খদ্দের না থাকলেই যুগান্তর পড়ে।

'কিরে! একটা সিগারেট দিবি নাকি গণশা?'

কেষ্ট মিত্তির যে দোকানের সামনে দাঁড়িয়ে ছিলেন, তা গণেশ খেয়ালই করেনি। কোন কথা না বলে প্যাকেট থেকে একটা কাঁচি সিগারেট এগিয়ে দিতেই কেষ্ট মিত্তির বললেন, 'তোর কত হলো রে গণশা?'

গণেশ মনে মনে ভাবে রোজ রোজ এই হিসেব চাইবার কোন মানে হয়? যখন জানি এ সিগারেটের দাম পাওয়া যাবে না, তখন হিসেব রাখার ঝামেলা করি কেন? তাছাড়া আপনি তো ঘোড়ার চরণে সব খুইয়ে বসে আছেন। হিসাব মেটাবেন কেমন করে? হাজার হোক বাবার বন্ধু। রোজ একটা কাঁচি সিগারেট খেয়ে যাবেন। দামের কথা আপনাকে ভাবতে হবে না।

দড়ির আগুন থেকে সিগারেট ধরিয়ে একটা টান দিয়েই কেষ্ট মিত্তির আবার তাগাদা দেন, 'কত হলো বললি না?'

'পরে বলব।' খবরের কাগজ পড়তে পড়তে মুখ না তুলেই গণেশ জবাব দেয়।

কেষ্ট মিত্তির আস্তে আস্তে গুটি গুটি এগুতে এগুতে বললেন, 'তুই বিপিনের ছেলে। কত কষ্ট করে সংসার চালাচ্ছিস। বেশি পয়সাকড়ি পড়ে থাকলে সংসার চালাবি কেমন করে?'

কেষ্ট মিত্তির খানিকটা এগিয়ে গিয়েছেন। এবার গণেশ একবার মুখ তুলে তাকিয়ে হাসে।

ফড়িংয়ের মত লাফাতে লাফাতে ছোটভাই দোকানের সামনে এসে বলল, 'হ্যাঁরে গণেশ, তুই এখনও কেষ্ট মিত্তিরের ডায়ালগ শুনে হাসিস?'

গণেশ এক প্যাকেট রেড অ্যাণ্ড হোয়াইট ছোট্ট শো-কেসের পাশে রেখে বলল, 'কি করব ছোটভাইদা, এই একই কথা রোজ শুনলে হাসি পাবে না?'

ছোটভাই দু'টাকার একটা নোট দিয়ে বলল, 'তোর সব শোধ।' প্লাস্টিকের পার্স পকেটে পুরতে পুরতে বলল, 'আরেক দিন কেষ্টদাকে টাইট দিতে হবে।'

গণেশ হাসে। কয়েক মাস আগেকার ঘটনা মনে পড়ল। সেদিন রবিবার। দোকানের সামনে পাড়ার বেশ কয়েকজনের ভীড়। কেষ্ট মিত্তির যথারীতি এসে একটা কাঁচি সিগারেট নিয়েই গণেশের কাছে হিসেব জিজ্ঞাসা করল। সঙ্গে সঙ্গে ছোটভাই জিজ্ঞাসা করল, 'আচ্ছা কেষ্টদা, স্টারে উত্তম-সাবিত্রীর শ্যামলী দেখেছিলেন?'

'জোর করে নিয়ে গিয়েছিল।'

'উল্কা দেখেছিলেন?'

'ঐ বদনই…'

ছোটভাই সিনেমা-থিয়েটার না করলেও প্রায় অভিনেতাদের মতই জনপ্রিয়। ওর কথাবার্তা শুনতে সবারই ভাল লাগে। সবাই ওর মুখের দিকে তাকিয়ে রইল। কেষ্ট মিত্তিরকে পুরো কথাটা শেষ করতে না দিয়েই ছোটভাই বলল, 'কেষ্টদা হল্ট! ঐ শ্যামলী আর উল্কা চার-পাঁচশো নাইট ধরে চলে যে রেকর্ড করেছিল, আপনি তো সে রেকর্ডও ব্রেক করলেন।'

কেষ্ট মিত্তির কাঁচি সিগারেট টানতে টানতে বললেন, 'তার মানে?'

'তার মানে ওরা তো চারশো-পাঁচশো নাইট ধরে একই ডায়ালগ আউড়েছিল, কিন্তু আপনি তো হাজার হাজার নাইট ডায়ালগ বলে যাচ্ছেন—গণেশ, হিসেব কর।…

কেষ্ট মিত্তির রেগে ওঠেন, 'হিসেব না দিলে পেমেণ্ট করব কি করে?'

ছোটভাই গম্ভীর হয়ে বলল, 'গণেশ, ক্যালকাটা টার্ফ ক্লাবের সেক্রেটারীর কাছে কেষ্টদার বিলটা পাঠিয়ে দিস। কেষ্টদার সব কিছুই তো ওখানে জমা আছে। ওরাই ওঁর বিলের পেমেণ্ট দিয়ে দেবে।'

কেষ্ট মিত্তিরের সামনে কেউই জোরে হাসতে পারলেন না। মুখ টিপে টিপে সবাই হাসলেন।

কাঁচিতে খুব জোরে একটা টান দিয়ে কেষ্ট মিত্তির আস্তে আস্তে পার্কের দিকে এগুতে এগুতে বললেন, 'তুই বড় ফাজিল হয়েছিস।'

'তুমি যেভাবে কাট্ মারছ, শিশির ভাদুড়ীও এভাবে স্টেজ থেকে কাট্ মারতে জানত না।'

সকালে সবারই তাড়া। স্কুল-কলেজ-অফিস। কোর্ট-কাছারি-দোকান। কোন খদ্দেরই দু'এক মিনিটের বেশি দাঁড়ান না। চলে যান। দেখতে দেখতে দশটা বেজে যায়। অফিস-যাত্রীর ভীড় প্রায় শেষ।

লুঙ্গি আর গেঞ্জি পরে সিধুদা এলেন। গণেশ জিজ্ঞাসা করল, 'কি সিধুদা, আজ ছুটি?'

'আজ আমাদের অফিস ক্লাবের থিয়েটার আছে। দুটো-আড়াইটের মধ্যে হলে পেঁছিতে হবে। তাই…'

'এবার কি বই করছেন?'

'সাহেব-বিবি-গোলাম!'

'আপনি নিশ্চয়ই ভূতনাথ?'

সিধুদা আত্মপ্রসাদের হাসি হেসে বললেন, 'সবাই মিলে চেপে ধরলে তো না বলতে পারি না।'

'কোথায় হবে?'

'ঐ স্টারেই। তুই যাবি নাকি?'

'দোকান ছেড়ে কি করে যাই বলুন !'

'সেই জন্যই তো তোকে আর কিছু বলি না।'

'কি নেবেন ?'

'তোর কাছে ভাল ব্লেড আছে ?'

গণেশ হাসতে হাসতে জিজ্ঞাসা করল, 'আজ বুঝি পানামা দিয়ে দাড়ি কামাবেন না ?'

সিধুদা হাসলেন।

গণেশ শেলফ্-এর উপর থেকে একটা ছোট্ট বাক্স নিয়ে একটু ঘাঁটাঘাঁটি করে একটা সেভেন-ও-ক্লক ব্লেড এনে সিধুদাকে দিল, 'এই নিন।'

উনি ব্লেডটা হাতে নিয়েই জিজ্ঞাসা করলেন, 'কত রে ?'

গণেশ হাসতে হাসতে বলল, 'সিধুদার কাছ থেকে দাম নেওয়া যায়, কিন্তু ভুতনাথের কাছ থেকে তো দাম নিতে পারি না।'

এক টাকার একটা নোট এগিয়ে দিয়ে সিধুদা বললেন, ওসব 'বাজে কথা ছাড়।'

'সারা বছরই তো সবকিছুর দাম নিচ্ছি। এ ব্লেডের দাম না হয় না-ই নিলাম।'

'ভদ্রতা আর চক্ষুলজ্জার জন্যই দোকানটা তুই বড় করতে পারছিস না।'

সিধুদা চলে যেতেই মায়া এলো। লাক্সের দামটা এগিয়ে দিতেই গণেশ জিজ্ঞাসা করল, 'কলেজ যাচ্ছিস ?'

'হ্যাঁ।'

'তুই কলেজ লাইব্রেরী থেকে আমাকে তিনটে বই পড়াবি ?'

'কি কি বই ?'

'সরোজ রায়চৌধুরীর ময়ূরাক্ষী, গৃহ-কপোতী আর সোমলতা।'

'দাঁড়াও, টুকে নিই।' মায়া সঙ্গে সঙ্গে ব্লাউজের ভেতর থেকে ফাউণ্টেন পেন নিয়ে খাতার পিছন দিকে লিখল।

'যদি একসঙ্গে তিনটে বই…'

'ওসব তোমায় ভাবতে হবে না।' মায়া আর দাঁড়ায় না। চলে গেল।

স্কুল-কলেজের আরো অনেক ছেলেমেয়ে দোকানের সামনে দিয়ে যায়। কেউ-কেউ কিছু কেনে।

সিগারেটটা লুকিয়ে রেখে শশাঙ্ক বলল, 'দাও গণেশদা, একটা খাতা দাও।' সঙ্গে সঙ্গে কাউণ্টারের উপর একটা সিকিও রাখল।

'তুই কি রোজ রোজ খাতা না কিনে পারিস না ?'

'কি করব ? কলেজে রোজ খাতা হারিয়ে যায় !'

গণেশ আর কোন কথা না বলে একটা খাতা দেয়, আর মনে মনে ভাবে ঘুষখোর বাপের উপযুক্ত ছেলেই হয়েছে !

গিরীশ এভিনিউর দিকে দৃষ্টিটা পড়তেই দেখল সুনন্দা আসছে। পিছন ফিরে একবার টাইমপীস্ দেখল। দশটা কুড়ি। এক মিনিটের মধ্যে সুনন্দা

দোকানের সামনে এসেই বলল, 'কালির বোতল দুটো ঠিক করে রাখ। আমি এক্ষুণি...'

'পনেরো-কুড়ি মিনিটের মধ্যে চান-খাওয়া-দাওয়া করতে পারবি ?'

সুনন্দা হাসতে হাসতে বলল, 'ঘণ্টা পড়ার সঙ্গে সঙ্গে আমি ঠিক ইস্কুলে পেঁীছে যাব।'

গণেশও হাসে। বলে, 'ছোট্ট স্কুল হলেও তুই তো বড় দিদিমণি ! দূর থেকে তোকে না দেখা পর্যন্ত দারোয়ান ঘণ্টাই বাজাবে না।'

সুনন্দা আর দাঁড়ায় না। হাসতে হাসতে চলে গেল।

দু'একজন খদ্দের এলেন, গেলেন। পাড়ার দু'চারজন বেকার ছেলে কয়েক মিনিট গল্প করল। এরই মধ্যে গণেশ মাঝে মাঝে টাইমপীস্ দেখে। পৌনে এগারোটা হতেই সুলেখা কালির দুটো বোতল নামিয়ে রাখল। একটু পরেই অপরিচিত এক ভদ্রলোক এক প্যাকেট উইলস্ ফিল্টার কিং নিয়ে চলে যাবার সঙ্গে সঙ্গেই সুনন্দা এলো। 'কিরে, ক'টা বাজে ?'

গণেশ টাইমপীসের দিকে না তাকিয়েই বলল, 'শুধু শাড়ি পালটে যেতে আর কতক্ষণ লাগবে !'

'বাজে বকিস না। রীতিমত মাইশোর স্যাণ্ডেল সোপ দিয়ে চান করেছি।'

'কি করে বুঝব ?'

'কান টেনে দেব, বুঝলি ?' হাসতে হাসতে সুনন্দা শাসন করেই গম্ভীর-কণ্ঠে বলল, 'দে দে, তাড়াতাড়ি দে।'

গণেশ কালির বোতল দুটো এগিয়ে দিয়েই জিজ্ঞাসা করল, 'দুটো বোতল কি করে নিবি ?'

'তাই তো !'

'আমি পেঁীছে দেব ?'

'না না, তোকে পেঁীছে দিতে হবে না। তোর কাছে কোন ব্যাগ আছে ?'

গণেশ তাড়াতাড়ি উঠে গিয়ে দোকানের পিছন থেকে একটা ছোট ব্যাগ এনে তার মধ্যে বোতল দুটো রাখল। সুনন্দা ব্যাগটা হাতে নিয়েই বলল, 'যাচ্ছি।'

সুনন্দা আস্তে আস্তে দৃষ্টির বাইরে চলে গেলেও গণেশ অনেকক্ষণ ওর পথের দিকে তাকিয়ে রইল।

গণেশ একটু আনমনা হয়ে যায়। হবেই। প্রত্যেক দিন। সুনন্দা স্কুলে চলে গেলেই ও রোজ একটু আনমনা হয়ে যায়। মনে পড়ে কতদিনের কত কথা !

যুদ্ধের সময় রেড রোডের ধারে মার্কিন সৈন্যদের ছাউনি পড়েছিল। অনেকগুলো ছোট-বড় অফিসও ছিল। বিপিনবাবু ওখানেই চাকরি করতেন। ঐ যুদ্ধের বাজারেই একদিন টোপর মাথায় দিয়ে বিয়ে করলেন। তারপর

ভদ্রকালীর আস্তানা ছেড়ে রাজবল্লভ পাড়ায় চলে এলেন।

দিনগুলো বেশ কাটছিল, কিন্তু হঠাৎ একদিন জেনারেল ম্যাক আর্থারের কাছে জাপানীরা আত্মসমর্পণ করতেই সব ওলট-পালট হয়ে গেল। পৃথিবীর বুকে শান্তি ফিরে এলেও দারিদ্র্যের আগুন দাউ-দাউ করে জ্বলে উঠল বিপিনবাবুর সংসারে। ঐ শনির দশার শেষের দিকেই গণেশ এসে হাজির। বিপিনবাবু ঠিক করলেন, আর নয়। মদনবাবু উকিলের বাড়ির একটা ছোট ঘর আর বারান্দা ভাড়া নিয়েই শুরু করলেন পান-বিড়ি-সিগারেটের দোকান।

সারা রাজবল্লভ পাড়ার মানুষ চমকে উঠলেন। শিক্ষিত ভদ্রলোক পান-বিড়ি-সিগারেটের দোকান করায় কিছু মানুষ বিরূপ হলেও অনেকেই খুশি হলেন।

মদনবাবু সবাইকে বলতেন, 'বিপিন ঠিকই করেছে। শিক্ষিত ভদ্রঘরের ছেলেরা যতদিন ব্যবসা-বাণিজ্য শুরু না করবে ততদিন বাঙালীর রাহুর দশা কাটবে না।' দু' একবার গড়গড়ায় টান দিয়ে আবার বলতেন, 'পি সি রায় তো দিনরাত এই কথাই বলতেন।'

যে যা-ই বলুক, বিপিনবাবুর দোকান বেশ চলতে শুরু করল। দু'এক বছরের মধ্যে দোকানের চেহারাই বদলে গেল। গণেশের এখনও মনে পড়ে দোকানের কোণার দিকে বসে একজন মুসলমান কারিগর বিড়ি বানাত। কি তাড়াতাড়ি তার হাত চলত। বাপরে বাপ! ভাবলেও অবাক লাগে। গণেশ মাঝে মাঝে দোকানে এসে শুধু ওর বিড়ি বানানো দেখত। খুব ভাল লাগত। কখনও কখনও ভাবত ও যদি ঐ রকম বিড়ি বানাতে পারত তাহলে কি মজাটাই হতো!

এসব অনেক পুরনো দিনের কথা। আবছা আবছা মনে পড়ে গণেশের। তারপর যখন একটু বড় হলো তখন ছোড়দার হাত ধরে ও আর সুনন্দা দোকানে আসত। কিছুক্ষণ বসত। ওদের তিনজনের হাতে দু' চারটে লজেন্স দিয়ে বিপিনবাবু বলতেন, 'রসিদ, এদের একটু এগিয়ে দাও না!'

ছোড়দা বলত, 'না না, জ্যাঠামণি, আমিই এদের নিয়ে যেতে পারব। আমি তো একলা একলা স্কুলে যাই।'

বিপিনবাবু একটু হেসে বলতেন, 'তা তো জানি বাবা। তুমি আরো একটু বড় হলেই আর রসিদকে পাঠাবো না।'

সামনা-সামনি বাড়ির দুটি পরিবার। যোগীনবাবু গণেশের বাবার চাইতে বয়সে ছোট হলেও আগে সংসারী হয়েছিলেন। দুই ছেলে আর এক মেয়ে। মণ্টু, ঝণ্টু ও রাণী। যোগীনবাবু সাধারণ স্কুল-মাস্টার হয়েও বেশ রসিক মানুষ ছিলেন। বলতেন, 'আমার ছেলেরা যে রাজত্ব পাবে তাতে তো ওদের রাজা বলা যাবে না, কিন্তু মেয়ের চান্স আছে বলেই ওকে রাণী বলে ডাকি।'

যোগীনবাবুর স্ত্রী—গণেশের বড়মা সবার সামনেই বলতেন, 'আসলে মেয়েকে যে একটু বেশী ভালবাসেন সে কথা উনি স্বীকার করতে লজ্জা পান।'

গণেশের মা-বাবা ওদের কথা শুনে হাসতেন। যোগীনবাবু ছেলেমেয়ের

নামকরণে বেশ আধুনিক ছিলেন। তাছাড়া তিন ভাই-বোনের নামে বেশ মিল ছিল। সুদীপ, সন্দীপ, সুনন্দা। সুনন্দার মত গণেশও মণ্টুকে দাদা আর ঝণ্টুকে ছোড়দা বলত। বছরখানেকের বড় হয়েও সুনন্দাকে রাণী ডাকার অধিকার পায়নি গণেশ। সুনন্দা বলত, 'তুই আমাকে রাণী বলে ডাকবি না। তুই কি বড় হয়েছিস যে, আমাকে রাণী বলবি?'

সুখে দুঃখে, আপদে বিপদে দুটি পরিবারের সম্পর্ক দিনে দিনে একাকার হয়ে গেছে। এ বাড়ির ডাল, ও বাড়ির তরকারী খেয়ে খেয়ে দু'বাড়ির ছেলেমেয়ে বড় হয়েছে।

যোগীনবাবুর বাড়িতে আত্মীয়-স্বজনরা এলেই তিন ভাই-বোনে এ বাড়ি এসে গণেশের মাকে বলত, 'রাঙামা, আজ আমরা তোমার কাছে থাকব।'

গণেশের বাবাকে খেতে দিতে দিতেই ওর মা বলতেন, 'যা, বড় খাটের উপর শুয়ে পড়।'

সেদিন গণেশ আর সুনন্দার ভারী মজা। দাদা-ছোড়দা ঘুমিয়ে পড়লেও ওরা ফিস ফিস করে বক বক করেই চলত। তারপর গণেশের মা এসে বকুনি দিলেই ওরা চুপ করত, কিন্তু ঘুমুত না। তখন পালা করে গুণে গুণে পিঠে সুড়সুড়ি দেওয়া শুরু হতো। ঐ সুড়সুড়ি দিতে দিতেই কখন যে ওরা ঘুমিয়ে পড়ত তা ওরাও জানত না।

আনমনা উদাস দৃষ্টিতে গিরীশ এভিনিউর দিকে চেয়ে থাকতে থাকতে কত দিনের কথা গণেশের মনে হয়। দুজনের একসঙ্গে স্কুলে যাওয়া, টিফিন খাওয়া, বিকেলে এক্কা-দোক্কা চোর-চোর খেলা। তারপর শুরু হলো লুডো খেলা। যখন-তখন যেখানে-সেখানে। এই লুডো খেলার জন্য যে দুজনে কতদিন কতজনের কাছে বকুনি খেয়েছে তার ঠিক-ঠিকানা নেই।

আরো কত কি মনে পড়ে। যখন ভাই-বোন আনতে ওর মা হাসপাতালে যেতেন তখন ও থাকত বড়মার হেপাজতে। রাত্রে বড়মার পাশে শুয়ে গণেশ জিজ্ঞাসা করত, 'আচ্ছা বড়মা, হাসপাতালে গেলেই বুঝি ভাই-বোন পাওয়া যায়?'

হাতপাখার হাওয়া করতে করতে বড়মা বলতেন, 'তাই কি হয়? আগে থেকে ভগবান বললেই তবে হাসপাতালে ভাই-বোন পাওয়া যায়।'

সুনন্দা জিজ্ঞাসা করে, 'তোমাকে কবে ভগবান হাসপাতাল থেকে ভাই-বোন আনতে বলবেন?'

'তার কি কোন ঠিক আছে?'

এবার আবার গণেশের পালা, 'বাবা হাসপাতালে গেলেও ভাই-বোন পাবেন?'

'না, পুরুষদের ভগবান ছেলেমেয়ে দেন না।'

'কেন?'

'পুরুষরা অফিস যায় কিনা, তাই...'

সুনন্দা আর চুপ করে থাকতে পারে না। জানতে চায়, 'আমি হাসপাতালে

গেলেও একটা ভাই-বোন পাব ?'

'না।'

'কেন ?'

'আগে লেখাপড়া শিখতে হবে, বড় হতে হবে, বিয়ে করতে হবে, তারপর ভগবানের দয়া হলে হাসপাতালে গেলে...'

হঠাৎ রামায়ণের গল্প মনে হয় গণেশের। জিজ্ঞাসা করে, 'বড়মা, রাম কোন হাসপাতালে জন্মেছিল ?'

বড়মা একটু হেসে বলেন, 'উনি তো অযোধ্যার হাসপাতালে জন্মেছিলেন।'

সুনন্দার মনে পড়ল রামায়ণের গল্প। জিজ্ঞাসা করে, 'হনুমানের ল্যাজ ছিল কেন ?'

'হনুমানদের ল্যাজ হয়।'

'আমার কেন ল্যাজ নেই ?'

'দূর বোকা! তুই তো মানুষ।'

এসব কথা মনে পড়লেই গণেশের হাসি পায়, কিন্তু বেশিক্ষণ হাসতে পারে না। একটু পরেই কালো মেঘ মনের আকাশের সব আলো ঢেকে ফেলে। দিন কয়েকের অসুখেই দাদা মারা গেল। সেকথা মনে পড়লেই গণেশের চোখে জল এসে যায়। সুনন্দাদের বাড়ির চেহারাই বদলে গেল। ক'দিনের মধ্যে ওর বাবা-মা বুড়ো-বুড়ি হয়ে গেলেন। বন্ধ হয়ে গেল ওদের খেলাধুলা, রাত্রে বড়মার কাছে রামায়ণের গল্প শোনা।

দাদা মারা যাবার পর কোন ছেলেমেয়ের একটু সর্দি-জ্বর হলেই বড়মা কেমন ভয় পেতেন। গণেশ বা তিন বোনের কারুর একটু কিছু হলেও উনি দুশ্চিন্তায় ছটফট করতেন। এখনও করেন। এখনও যদি শুনতে পান গণেশের শরীর ভালো না, তাহলে দোকান পর্যন্ত ছুটে আসবেনই। বড়মাকে দেখেই গণেশ জিজ্ঞাসা করবে, 'কি বড়মা, কিছু চাই ?'

'না রে বাবা, কিছু চাই না। তোর নাকি শরীর খারাপ ?'

গণেশ হাসে। বলে, 'কে বলল আমার শরীর খারাপ ?'

'তোর মা বলল, রাণী বলল।'

'ওদের কথা বাদ দাও।'

'বাদ দেব কিরে ? তুই বরং এবেলা দোকান বন্ধ রাখ।'

'সত্যি বলছি বড়মা, আমার শরীর ঠিকই আছে।'

'তবে কি ওরা মিথ্যা বলল ?'

'কাল রাতে শরীরটা ভাল লাগছিল না বলে কিছু খাইনি।'

'তবে যে বলছিলি তোর শরীর খারাপ হয়নি ?'

কৈশোরেই রুক্ষতার জ্বালা ভোগ করতে শুরু করল গণেশ। পয়সা-কড়ি নিয়ে বাবা-মার কথাবার্তা প্রায়ই কানে আসত। ঐ সামান্য পান-বিড়ি-সিগারেটের দোকানের উপর নির্ভর করে ছ'টি প্রাণীর সংসার চালাতে বিপিন-

বাবু হিমসিম খেয়ে যেতেন।

গণেশের মা জিজ্ঞাসা করতেন, 'রাস্তায় বেরুলেই তো লোকের মুখে পান-বিড়ি-সিগারেট দেখি। তবে তোমার দোকানের বিক্রী কমছে কেন?'

বিপিনবাবু প্রথমে হাসতে হাসতে স্ত্রীর প্রশংসা করেন, আমি জানি তুমি বুদ্ধিমতি, কিন্তু এ তো একেবারে ইকনমিক্সের প্রফেসারের মত কথা বললে।'

'আচ্ছা হয়েছে। যা জিজ্ঞেস করলাম, তার জবাব দাও।'

'তুমি ঠিকই বলেছ, কিন্তু আজকাল ছেলে-ছোকরাই বেশি সিগারেট খায়…'

'তাতে তোমার কি হলো?'

'আমার দোকান তো শ্যামবাজারের মোড়ে নয় যে, অচেনা খদ্দেরদের নিয়েই দোকান চলবে। পাড়ার লোক হয়ে পাড়ার মধ্যে দোকান খুলেছি। সবাই তো আমার জানাশুনা। জানাশুনা ছেলেরা কি আমার কাছ থেকে সিগারেট কিনবে?'

গণেশ যখন একটু বড় হলো তখন থেকেই দু'এক ঘণ্টার জন্য ওকে দোকানে বসিয়ে বিপিনবাবু চান-খাওয়া-দাওয়া করতে বাসায় যেতেন।

গণেশ খেয়াল করত তার কাছ থেকে স্বদেশদাদের বন্ধুবান্ধবরা সিগারেট কিনলেও ওর বাবার কাছ থেকে কোনদিন কিনত না। আরো কতজনে ওর কাছ থেকে বিড়ি-সিগারেট কিনত। ওর বেশ মজা লাগত। মনে মনে ভাবত এ পাড়ার কে কে বিড়ি-সিগারেট খায় তা তো জানা গেল। এতগুলো মানুষের গোপন খবর জেনে গণেশ বেশ উত্তেজিত হয়ে বাড়ি ফিরত। সঙ্গে সঙ্গে সুনন্দাকে ডাকত, 'এই শোন, একটা প্রাইভেট কথা আছে।'

'তুই ছাদে যা। আমি এক্ষুণি আসছি।'

সুনন্দা ছাদে এলেই গণেশ ওর কানে কানে বলত, 'জানিস, স্বদেশদা, বিষ্টুদা, প্রদীপের মেজদা, তোদের ক্লাসের অলকার দাদা—সব সিগারেট খায়।'

'তুই কি করে জানলি?'

'আমার কাছ থেকেই কিনল।'

'তাই নাকি?'

'হ্যাঁ রে।'

'ওদের বাড়িতে যদি জানতে পারে?'

'ওরা তো লুকিয়ে লুকিয়ে খায়।'

আরো কত গোপন কথা হয় সুনন্দার সঙ্গে। তবে আগে প্রতিজ্ঞা করিয়ে নেয়, 'আমাকে ছুঁয়ে বল্ কাউকে বলবি না!'

'তোর গোপন কথা আমি কাউকে বলি?'

'না তা বলিস না, কিন্তু তবু আমাকে ছুঁয়ে বল্।'

সুনন্দা গণেশের বুকের উপর হাত রেখে বলে, 'এই তো তোকে ছুঁয়ে বলছি কাউকে বলব না।'

'বাবা বলেছিলেন ছটাই বিশ্বাসকে ধারে কিছু না দিতে…'

'কেন রে?'

'সে অনেক গোপন ব্যাপার।'

'তুই বল্ না আমাকে। আমি কি কাউকে বলবো?'

'ছটাই বিশ্বাসের কাছে বাবা অনেক টাকা পাবেন...'

'কত টাকা রে?'

'বোধহয় পঞ্চাশ-ষাট টাকা...'

'উরেঃ বাবা!'

'সে টাকা তো দিলই না, তারপর বাবাকে যা-তা বলেছে।'

'জ্যাঠামণিকে কি বলেছে রে?'

'বাবা টাকা চেয়েছিলেন বলে বাবাকে বিড়িওয়ালা বলেছে।'

সুনন্দা মুখ বিকৃত করে বলল, 'লোকটা কি অসভ্য!'

'তাই তো বাবা ওকে ধার দেন না, কিন্তু আমি পয়সা না নিয়েই এক প্যাকেট কাঁচি সিগারেট দিয়েছি।'

'কেন দিলি?'

'না বলতে কি রকম ভয় করল।'

'কেন? ভয় আবার কিসের?'

'ভাবলাম যদি আমাকে একটা থাপ্পড় মারে!'

'অতই সোজা নাকি? থাপ্পড় মারলে মজা দেখিয়ে দিতাম না!'

এই হচ্ছে সুনন্দা। এই হচ্ছে রাণী। ছোটবেলা থেকেই তীব্র আত্মসম্মান-বোধ। স্বাধীনচেতা। ন্যায়-অন্যায় বিচার করার ক্ষমতা। তাছাড়া সব সময় গণেশকে সাহস আর সহায় জুগিয়ে এসেছে। শ্রাবণধারা চোখে দেখা যায়, কিন্তু মাঘের হিম অনুভব করতে হয়।

গণেশ ঠিক বুঝতে না পারলেও অনুভব করত কে যেন ওকে সবুজ-সতেজ করে এগিয়ে যাবার পথে ঠেলে দিচ্ছে। বুঝতে পারল সেই সর্বনাশের রাত্রিতে।

কিছুকাল ধরেই বিপিনবাবুর শরীরটা খারাপ হয়েছিল। টুকটাক ওষুধপত্রও খেতেন, কিন্তু বিশেষ উন্নতি দেখা গেল না। দিনকতক হরিপদ কবিরাজের কাছেও যাতায়াত করলেন। তাতেও ফল হলো না। দেখলেই মনে হতো অসুস্থ, কিন্তু ভিতরে ভিতরে এত খারাপ হয়ে গেছে, তা কেউই জানত না। হাসপাতালে যাবার তিনদিনের মধ্যেই সব শেষ।

পাড়ার সবাই ছুটে গেল হাসপাতালে। ছোটভাই, গোরা, দেবী, অসিত ও আরো কে কে যেন বিপিনবাবুকে কাঁধে করে নিয়ে এলো পাড়ায়।

তারপর?

তারপর আর কি? সাধারণ মধ্যবিত্ত সংসারের যে-কোন বিপিনবাবু চলে গেলেই যা হয় আর কি। প্রথমে কালবৈশাখীর মাতলামি, তারপর ঝড় থামলেও চারিদিকে থমথমে অন্ধকার। এক পা এগুবার পথও দেখা যায় না।

ছোট তিনটে বোন কাঁদতে কাঁদতে ঘুমিয়ে গেছে। গণেশ মা-র দিকে তাকাতে পারছে না। ভয় করছে। এখনও একটা দিন পুরো হয়নি। সকাল থেকে সন্ধ্যার মধ্যেই মা যে এভাবে বদলে যেতে পারেন গণেশের কল্পনার বাইরে।

ছাদের এক কোণায় একলা একলা বসে বসে গণেশ কত কি ভাবছিল। খবর পেলেই কাকারা আসবেন, কাঁদবেন, চলে যাবেন। তারপর ? তারপর কি হবে ? মা আর তিনটি ছোট বোনকে নিয়ে বাঁচবে কিভাবে ? বড়মা আর জ্যেঠু কত সাহায্য করবেন ? ওঁরাও তো আমাদেরই মত···

হঠাৎ সুনন্দা এসে পাশে বসল। জট-পাকানো চুলগুলোর মধ্যে আঙুল দিয়ে দিয়ে আস্তে আস্তে জট ছাড়িয়ে দিচ্ছিল। সমবেদনার ছোঁয়ায় গণেশের চোখে জল এলো। কাঁদতে কাঁদতে বলল, 'আমরা কিভাবে বাঁচব রে সুনন্দা ?'

সুনন্দা আঁচল দিয়ে ওর চোখের জল মুছিয়ে দিতে দিতে বলল, 'ভয় পাচ্ছিস কেন ? আমরা তো আছি।'

'লেখাপড়া না হয় বন্ধ করলাম, কিন্তু সংসার চালাব কি করে ?'

'ছ-মাস পরে হায়ার সেকেণ্ডারী পরীক্ষা। এখন কি লেখাপড়া বন্ধ করা যায় ?'

'না রে সুনন্দা, আমার আর লেখাপড়া হবে না।'

'হবে না বললেই হবে না ? লেখাপড়া তোকে করতেই হবে।'

একটু পরে যোগীনবাবুও এলেন। বললেন, 'লক্ষ্মী বাবা আমার, কাঁদিস না। যাদের মাথায় দায়িত্বের বোঝা চাপে তাদের তো কাঁদলে চলবে না বাবা।'

গণেশ কথা বলে না। দুটো হাঁটুর উপর মুখ রেখে নীরবে শুধু চোখের জল ফেলে। সুনন্দাও মাঝে মাঝে আঁচল দিয়ে নিজের চোখ মুছছে।

যোগীনবাবু বললেন, 'যুদ্ধ করার আগেই তুই ভাবছিস কেন হেরে গেছিস ? তোকে লেখাপড়া শিখে মানুষ হতেই হবে।'

গণেশ আর লুকিয়ে লুকিয়ে কাঁদতে পারে না। কাঁদতে কাঁদতে বলল, 'না জ্যেঠু, আমার আর কিছু হবে না।'

'না বাবা, লেখাপড়া তোকে শিখতেই হবে।'

যোগীনবাবুও স্কুল-মাস্টার। এ. ভি. স্কুলের অনেকের সঙ্গেই ওঁর পরিচয়। উনি নিজে গিয়ে স্কুলের মাস্টারমশাইদের বলে এলেন, 'গণেশকে দোকান সামলাতেই হবে। তা না হলে তিনটে ছোট বোন আর মাকে বাঁচাতে পারবে না। টেস্টে ওকে আটকাবেন না। তারপর আমি দেখব কি করতে হয়।'

শুধু গণেশ নয়, সারা রাজবল্লভ পাড়ার কেউ ভাবেনি ও পাস করবে। কিন্তু সত্যি যেদিন রেজাল্ট বেরুল, জানা গেল গণেশ সেকেণ্ড ডিভিসনে পাস করেছে।

সেদিন যোগীনবাবু নিজেও চোখের জল ফেলেছিলেন। গণেশকে বুকের মধ্যে জড়িয়ে ধরে বলেছিলেন, 'পুত্রশোক পাবার পর আজ প্রথম একটু আনন্দের আস্বাদ পেলাম।'

দু' বাড়ির লোকজনের ভীড়ের মধ্যেও লুকিয়ে-চুরিয়ে সুনন্দা এক ফাঁকে গণেশের কানে কানে বলল, 'দেখলি তো আমার ভালোবাসার জোর ?'

গণেশ চমকে উঠে সুনন্দার দিকে তাকাতেই ও ঘর থেকে ছিটকে বেরিয়ে গেল।

॥ দুই ॥

একবার ভেবেছিল দোকান বেচে দিয়ে যা হোক একটা চাকরি করতে করতে ইভনিং শিফটে কলেজে পড়বে। অনেকেই তো চাকরির সঙ্গে সঙ্গে লেখাপড়া চালিয়ে যায়। কিন্তু দোকান বিক্রির কথা মাকে বলতেই চোখ দুটো ছলছল করে উঠল। মুখে আপত্তি জানালেন না। বললেন, 'কি আর বলব বল্ ! যা ভাল বুঝিস তাই কর। তবে একবার রাণীর বাবাকে জিজ্ঞাসা করিস।'

গণেশ আর এগুতে পারল না। শেয়ার বাজারে যাঁরা নিত্য লক্ষ-লক্ষ কোটি-কোটি টাকার শেয়ারের বেচা-কেনা করেন, তাঁরা শুধু লাভের অংকটাকেই ভালবাসেন। কোম্পানীকে ভালবাসার মতো মন তাঁদের নেই। কিন্তু যাঁরা সবকিছুর বিনিময়ে রাস্তার মোড়ে, গলির ভেতর ছোট্ট ছোট্ট দোকান গড়ে তোলেন তাঁদের কাছে ঐটাই স্বপ্ন, ঐটাই সাধনা। ছোট্ট একটা শেলফ্, মামুলি একটা শো-কেস করতে পারলেই ওঁরা আনন্দে উত্তেজনায় চঞ্চল হয়ে ওঠেন।

প্রথম যেদিন ওদের দোকানে সামনের ছোট্ট শো-কেসটা এলো, সেদিন গণেশ যে কাঁচের উপর কতবার হাত বুলিয়েছিল তার ঠিক-ঠিকানা নেই। তারপর ছুটতে ছুটতে বাড়ি গিয়ে বলেছিল, 'মা, মা, আমাদের নতুন শো-কেস এসেছে।'

মা আঁচলে হলুদের হাত মুছতে মুছতে রান্নাঘর থেকে বেরিয়ে এসে জিজ্ঞাসা করলেন, 'কেমন হয়েছে রে ?'

'খুব সুন্দর !'

'ওর ভেতর জিনিস রেখেছেন ?'

'হ্যাঁ।' গণেশ সঙ্গে সঙ্গে জিজ্ঞাসা করল, 'তুমি দেখতে যাবে না ?'

খুব ইচ্ছা করলেও একবার রান্নাঘরের দিকে তাকিয়ে বললেন, 'এখন কি করে যাই বল্ ?'

গণেশ তিন বোন আর সুনন্দাকে নিয়ে তক্ষুনি একবার দোকান ঘুরে এলো।

রাত্রে বিপিনবাবু বাসায় আসার সঙ্গে সঙ্গে গণেশের মা খুশির হাসিতে মুখখানা ভরিয়ে জিজ্ঞাসা করলেন, 'হ্যাঁগো, শো-কেসটা খুব সুন্দর হয়েছে ?'

বিপিনবাবু হাসতে হাসতে বললেন, 'দোকানের চেহারাই বদলে গেছে।'

'তাই নাকি ?'

'সত্যি খুব ভাল দেখাচ্ছে। এর পর কিছু টাকা হলে একটা লম্বা চৌকো শো-কেস বানাব।'

চায়ের জল উনুনে চাপাতে চাপাতে গণেশের মা বললেন, 'মদনমোহনতলা যাবার গলির মুখের দোকানে যেমন আছে…'

'হ্যাঁ, হ্যাঁ, ঐ ধরনের।'

এখনও যখন দোকানে খদ্দেরের ভীড় থাকে না, যখন দোকানের সবকিছুর উপর দিয়ে চোখ বুলিয়ে নিতে নিতে মনে মনে হিসেব করে কি কি মালের অর্ডার দিতে হবে, তখনই এই শো-কেসটার কথা মনে পড়ে।

মণীন্দ্র কলেজের ফর্ম এনেও জমা দিল না গণেশ। তিন বোনের মধ্যে বীণাই বড়। ক্লাস সেভেনে পড়ে। সংসারের অবস্থা জানে। বুঝতে পারে। সংসারের অর্ধেক ঝামেলা তো ওকেই সামলাতে হয়। ও একবার জিজ্ঞাসা করল, 'দাদা, তুই কলেজে ভর্তি হবি না?'

'না রে।'

'দিনে না হলেও সন্ধ্যেবেলায় তো পড়তে পারিস।'

'ঠিক ঐ সময়ই তো দোকানে সব চাইতে বেশি বিক্রি হয়।'

বীণা আর প্রশ্ন করেনি।

গণেশ কলেজে পড়ার কথা ভুলে গেল। ভুলে গেল আরো অনেক কিছু। এখন শুধু দোকানের কথাই ভাবে। ভবিষ্যতেও ভাববে।

সেদিন রবিবার। গণেশ দুপুরে খেতে এসে দেখল বড়মা আর সুনন্দা বসে আছে। কথায় কথায় বড়মা বললেন, 'দোকানটা একটু দাঁড়িয়ে গেলে তুই আবার কলেজে ভর্তি হয়ে যাস।'

সুনন্দা বলল, 'সে কি আর সম্ভব হবে? একদিকে সংসার, অন্যদিকে দোকান সামলে কি কেউ কলেজে পড়তে পারে?'

গণেশ হাসতে হাসতে বলল, 'দেখেছ বড়মা, আমার চাইতে পুরো এক বছরের ছোট হলেও সুনন্দার কি দারুণ বাস্তব-জ্ঞান!'

সুনন্দাও হাসতে হাসতে জবাব দিল, 'ভুলে যাস না, ছোড়দা হচ্ছে বাবার মেয়ে, আর আমি হচ্ছি ছেলে।'

পরে একদিন সুনন্দা গণেশকে বলেছিল, 'কলেজে ভর্তি হতে পারলি না বলে দুঃখ করিস না। কলেজে না পড়লেও শিক্ষিত হওয়া যায়।'

গণেশ কিছু বলেনি। সুখ-দুঃখের কথা ও আর ভাবে না। জোয়ার-ভাঁটার মতো সুখ-দুঃখ যখন ইচ্ছে আসুক, আবার চলে যাক। কর্তব্য আর দায়িত্ব ছাড়া আর কিছু ভাবে না।

ছোট্ট টাইমপীসটা যখন অবোধ শিশুর মতো কাঁদতে শুরু করে তখন চোখ মেলে তাকিয়েও গণেশ বিশ্বাস করতে পারে না রাত্রির মেয়াদ ফুরিয়ে এসেছে। পাশ ফিরে শুয়ে জানালা দিয়ে রাস্তার দিকে চোখ পড়তেই দেখে তখনও রাস্তায় আলো জ্বলছে। নেড়িকুত্তাগুলোও চিৎকার করছে না। ওরাও মাঝ-রাত্তিরের লড়াই-ঝগড়ার পর ক্লান্ত হয়ে ঘুমুচ্ছে।

গণেশ আবার চোখ বন্ধ করে। ঘুম ভেঙে যায় গণেশের মা-র, কিছুতেই ডাকতে পারেন না ছেলেকে। লেখাপড়া ছেড়ে দিয়ে যে ছেলে ভোর থেকে

মাঝরাত্তির পর্যন্ত দোকানে থাকে, খাটছে, তার এমন গাঢ় ঘুম ভাঙাতে পারেন না।

হঠাৎ একটা সাইকেল চলে যাবার আওয়াজেই গণেশ উঠে পড়ে। মুখ-হাত ধুয়ে দোকানে যায়। একটু পরেই রুটির গাড়ি আসে। শো-কেসে রুটি সাজাতে সাজাতেই খবরের কাগজের হকারদের ছুটোছুটি শুরু হয়, প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই খদ্দের আসাও আরম্ভ হয়।

সবচাইতে আগে আসে বোসবাড়ির চাকর। দুটো হাফ পাউন্ড রুটি। কোন কোন দিন অরবিন্দ ব্যানাজীর চাকর বোসবাড়ির চাকরকে হারিয়ে দেয়।

'গণেশদা, আজ দু'পাউন্ড দেবেন।' দু'টাকার নোট এগিয়ে সতীশ বলল।

শো-কেস থেকে দু' পাউন্ড রুটি বের করতে করতে গণেশ বলল, 'আজ বুঝি বাড়িতে অনেক লোক?'

'বাবুর ছোট শালীরা এসেছেন যে!'

'কবে এলেন?'

'কাল রাত্রে।'

'ওরা তো এখনও বম্বেতেই...'

সতীশ মাথা নেড়ে বলল, 'না। ওরা তো এখন দিল্লীতে।'

গণেশ পয়সা ফেরত দিতে না দিতেই অন্য খদ্দেররাও আসতে শুরু করেন। হরিণঘাটার দুধ নিয়ে ফেরার পথে পর পর কয়েকজন আসেন। এঁরা সবাই পাঁউরুটির খদ্দের। কেউ কেউ হয়তো অন্য কিছু।

মায়ার দাদু আর অনিল সরকারের বাবা রোজ মর্নিং-ওয়াক করে ফেরার পথে গণেশের দোকানের সামনে এসে দাঁড়াবেন। তখনও ওঁদের আলোচনা চলছে। লাঠিতে ভর দিয়ে মায়ার দাদু বললেন, 'সত্যি বলছি সরকার মশাই, এসব দেখে-শুনে আর বাঁচতে ইচ্ছে করে না। আমরা কি এরই জন্য নাইনটিন থার্টিতে গান্ধীজির কথায় কলেজ ছেড়ে বেরিয়ে এসেছিলাম?'

সরকার মশাই হাসলেন। বললেন, 'কাল অনিলের শ্বশুর-মশাইও ঠিক এই কথাই বললেন। দেশের অবস্থা এ রকম হবে জানলে কি পলিটিক্স করতাম?'

'আমার নাতনী মায়াকে চেনেন তো?'

'ওই তো যাকে ভর্তি করা নিয়ে আপনাকে খুব ছুটোছুটি করতে হলো?'

'দ্যাট্স রাইট। ও কি বলে জানেন?'

'কি?'

'বলে, দাদু, তুমি সারাদিন কংগ্রেসের শ্রাদ্ধ করছ, কিন্তু ভোট দেবার বেলায় তো জোড়া বলদে ছাপ দিতে ভুল কর না।...'

সরকার মশাই হো-হো করে হেসে উঠলেন।

ওঁর হাসি থামলে মায়ার দাদু বললেন, 'আমি কি জবাব দিই জানেন?'

'কি?'

'বলি, দিদি, মন তো চায় তোকে নিয়ে ঘর করি কিন্তু এমনই অভ্যাস

হয়ে গেছে যে, তোর দিদাকে ছাড়তে পারি না।'

দুই বৃদ্ধ একসঙ্গে হাসিতে ফেটে পড়তেই গণেশের দোকানের তিন-চারজন খদ্দের চমকে ওঠেন। একজন মন্তব্য করেন, 'আমরা ছোকরারা হাসতে ভুলে গেছি কিন্তু বুড়োদের রস দ্যাখ!'

সিধুদা একটু রেগে বললেন, 'তোরা একটু ভদ্রভাবে কথা বলতে শেখ।'

ছ্যাদা আর পটল গিরীশ এভিনিউর দিকে এগিয়ে যেতে যেতে একটু জোরেই বলল, 'এ্যামেচার হিরোইনদের নিয়ে স্ফূর্তি করে আমাদের আবার ভদ্র হতে বলছে।'

সবার কানেই কথাটা গেল। সবার খারাপ লাগল। সিধুদা ওদের দিকে তাকিয়ে আপন মনে বললেন, 'তোমরা যদি আমার ছেলে হতে তাহলে গলা টিপে মেরে ফেলতাম।'

অনিল সরকারের বাবা বললেন, 'ওদের উপর রাগ করো না সিধু। আমরা যদি খারাপ হই তাহলে আমাদের ছেলেমেয়েরা তো খারাপ হবেই!'

'কিন্তু কাকাবাবু, ওরা বড্ড বেড়ে গেছে।'

মায়ার দাদু হাসতে হাসতে বললেন, 'সিধু, এইসব কথাই সরকার মশাইকে বলছিলাম।…'

সিধুদা তখনও রেগে আছেন। বললেন, 'এরা বলাবলির বাইরে চলে গেছে মেজকাকা। পিঠের উপর দু'চার ঘা চাবুক পড়লে সব ঠাণ্ডা হয়ে যাবে।'

'চাবুক মারতে হলে আমাদেরও দু'চার ঘা খাবার দরকার। উই আর নো লেস রেসপনসিবল ফর দ্য মেস দ্যান দিজ বয়েজ।'

অনিল সরকারের বাবা শার্টের বুকপকেট থেকে একটা টাকা বের করে এগিয়ে দিয়ে বললেন, 'গণেশ বাবা, একটা ভাল এক্সারসাইজ বুক দে তো।'

'এক টাকা দামেরই দেব জ্যেঠু?'

'দে।'

সঙ্গে সঙ্গে পিছনের শেলফ্ থেকে একটা এক্সারসাইজ বুক নিয়ে খুব জোরে ধুলো ঝেড়ে এগিয়ে দিল।

মায়ার দাদু বললেন, 'আমাকে একটু নস্যি দিবি না?'

'একটু পরেই পাঠিয়ে দিচ্ছি দাদু।'

'তুই আর দোকান ছেড়ে যাবি কেন? আমিই কাউকে পাঠিয়ে দেব।'

সিধুদা বারো আনা খুচরো দিয়ে এক পাউন্ড পাঁউরুটি নিয়ে চলে গেলেন।

গিরীশ এভিনিউ অনেক বড় ও ব্যস্ত রাস্তা হলেও মানুষের ভীড় কম, কিন্তু রাজবল্লভ পাড়ায় ঢুকলেই মানুষের কলগুঞ্জন শোনা যাবে। ভোর থেকে মাঝরাত্তির পর্যন্ত মানুষ আসছে যাচ্ছে। সবাই আসা-যাওয়া করেন না। এই রাজবল্লভ পাড়াতেই শুধু তাঁদের বিচরণ।

গণেশ এখানেই বড় হয়েছে! আশৈশব একই বাড়ি। একই পাড়া। সব কিছু চিনত, জানত, কিন্তু এখন দোকানে সারা দিন কাটাতে গিয়ে দেখল

কাউকেই সে চিনত না, জানত না। শুধু নাম-ধাম আর চেহারাটা জানলেই কি মানুষকে চেনা হয় ?

মা বা বোনেরা কিছু জিজ্ঞাসা না করলেও সুনন্দা মাঝে মাঝেই জিজ্ঞাসা করে, 'হ্যাঁরে, সারা দিন-রাত্তির দোকানে কাটাতে বিরক্ত লাগে না ?'

'প্রথম প্রথম লাগলেও এখন খারাপ লাগে না।'

'সে-কি রে ?' সুনন্দা অবাক হয়ে আবার প্রশ্ন করে, 'ভোর সাড়ে চারটে-পাঁচটা থেকে রাত সাড়ে এগারোটা-বারোটা পর্যন্ত ঐ এক দোকানের মধ্যে বন্দী থাকতে রাগ হয় না ?'

গণেশ একটু হেসে বলল, 'না।'

'বাজে কথা বলিস না। তোর কষ্টের কথা শুনলে সবার মন খারাপ হয়ে যাবে বলে তুই চেপে যাচ্ছিস।'

গণেশ আবার হাসল। বলল, 'সত্যি বলছি আজকাল আর খারাপ লাগে না। বরং ভালই লাগে।'

সুনন্দা তবুও বিশ্বাস করতে পারে না। জিজ্ঞাসা করে, 'ভাল লাগে মানে ?'

'সারা দিন-রাত্তিরে এত রকমের কাস্টমার আসে যে, তাদের দেখতে দেখতে, কথাবার্তা শুনতে শুনতে সময়টা বেশ কেটে যায়।'

দুপুরবেলা খেতে এসে গণেশ ঘণ্টাখানেক বাড়িতে থাকে। সুনন্দার স্কুল-পর্ব শেষ। রোজ সকালে খবরের কাগজ খুলে দেখে হায়ার সেকেণ্ডারীতে রেজাল্ট বেরুবার কোন খবর আছে কিনা। তারপর সারাদিন ছুটি। দুপুর-বেলায় রোজ এ বাড়িতে আসে।

'রাণী, আমার হাত বন্ধ। তুই গণেশের একটা জায়গা করে দে তো।'

'দিচ্ছি জ্যেঠিমা।'

সুনন্দা বারান্দা ঝাঁট দেবার পর আসন পাতে, জল দেয়। 'হয়ে গেছে জ্যেঠিমা।'

'গণেশ চান করে বেরিয়েছে ?'

'হ্যাঁ।'

'তুই ওকে বসতে বল্। আমি ভাত দিচ্ছি।'

খেতে খেতে মা-র সঙ্গে সংসারের কিছু কথাবার্তা। এক গ্রাস ভাত মুখে দিয়েই গণেশ বলে, 'এ রাম! দোকান থেকে তোমার চাল আনতে ভুলে গেলাম তো!'

'আমার চাল মানে ?'

'শুনেছিলাম দিল্লীতে ভাল চাল পাওয়া যায়। তাই গোরাদাকে বলেছিলাম…'

'তুই আবার ওকে বলতে গেলি কেন ?'

'তাতে কি হলো ? গোরাদা তো মাঝে মাঝেই দিল্লী যান। তাই বলেছিলাম অসুবিধা না হলে তোমার জন্য একটু চাল আনতে।··

'নিশ্চয়ই অনেক দাম ?'

'দামের কথা জিজ্ঞাসা করেছিলাম, কিন্তু গোরাদা কিছু বললেন না।'

'আমার জন্য আর এসব বাজে খরচ করিস না।'

এবার সুনন্দা কথা বলে, 'আপনার জন্য একটু ভাল চাল আনা বুঝি বাজে খরচ হলো ?'

এখন কি আর ভাল-মন্দ খাবার বয়েস, না সময় ?'

খাওয়া-দাওয়ার পর একটু বিশ্রাম করতে করতেই গণেশ আর সুনন্দার কথা হয়। সুনন্দা বলল, 'চৌরঙ্গী পার্ক স্ট্রিটে দোকান হলে না হয় নিত্য-নতুন মানুষ দেখতিস, কিন্তু এখানে তো সবাই পাড়ার লোক।'

গণেশ হাসতে হাসতে বলল, 'দোকানে বসে পাড়ার লোকদেরই কি কম মজার কথা শুনি বা জানতে পারি ?'

একবার সুনন্দার সারা শরীরের উপর দিয়ে দৃষ্টি বুলিয়ে নিয়ে বলল, 'তুই নেহাত বড় হয়ে গেছিস, তা নয়তো তোকে নিয়ে একটা দিন দোকানে বসাতাম। দেখতিস কি মজার ব্যাপার !'

ভুল করে সুনন্দাও একবার দেখে। জিজ্ঞাসা করে, 'আমি বুঝি খুব বড় হয়ে গেছি ?'

'তোদের বাড়ির বড় আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে একবার ভাল করে নিজেকে দেখিস।'

এক সেকেন্ড চুপ করে থাকার পর গণেশ বলল, 'তুই আমাদের দোকানে বসলে তো এ পাড়ার অন্য সব দোকানগুলোর লালবাতি জ্বলবে।'

শুনতে ভাল লাগলেও হাই উঠিয়ে সুনন্দা বলল, 'এক থাপ্পড় খাবি।'

গণেশ এক লাফ দিয়ে চৌকি থেকে নেমেই দেওয়ালের পেরেক থেকে চাবির গোছা নিয়ে দোকানে চলে গেল।

সত্যি দিনগুলো বেশ কাটছে। বেচা-কেনা লাভ-লোকসান, যাই হোক খদ্দেরদের বেশ লাগে গণেশের।

'গণেশদা, দুটো উইলস্ সিগারেট দাও তো।' খুচরো পয়সা শো-কেসে রাখতে রাখতে বিশুদার ছেলে বলল, 'বাবা চাইলেন।'

খুচরো পয়সাগুলোর দিকে চোখ বুলিয়ে গণেশ জিজ্ঞাসা করল, 'উইলস, না উইলস্ ফ্লেক চাস ?'

বিশুদার ছেলে একবার ওর বন্ধুর দিকে তাকিয়েই বলল, 'উইলস্।'

'প্লেন, না ফিল্টার ?'

'বাবা যা খান তাই দাও।'

'তোর বাবা তো উইলস্ ফ্লেক খায়।'

বিশুদার ছেলে একটু ঘাবড়ে গিয়ে বলল, 'তাহলে তাই দাও।'

উইলস্ ফ্লেক সিগারেট এগিয়ে দিতেই বিশুদার ছেলে চিলের মতো ছোঁ মেরে নিয়ে চলে গেল।

গণেশ একটু হাসল। মনে মনে ভাবল কতই বা বয়স হবে বিশুদার

ছেলের ! বড়জোর ন' দশ। না হয় এগারো। তার বেশী কিছুতেই নয়। কিন্তু এরই মধ্যে সিগারেট টানা ধরেছে। বড় হলে কি টানবে ?

'কিরে ? ওদিকে তাকিয়ে কি দেখছিস ?'

নন্দর কথায় গণেশ দৃষ্টি গুটিয়ে এনে বলল, 'বিশুদার ঐ পুঁচকে ছেলেটাও সিগারেট টানা শুরু করেছে।'

'যে ইচ্ছে সিগারেট টানুক। তাতে তোর কি !'

'আমার আবার কি ? কিন্তু খারাপ তো লাগে।'

'ব্যবসা করতে বসে ঐ সব খারাপ-টারাপ লাগা ছাড়।'

'তা তুই আজকে, এই দুপুরবেলাতেই অফিস থেকে চলে এলি ?'

নন্দ হাসল। আনন্দের, পরিতৃপ্তির হাসি।

'কি ব্যাপার রে ? হাসছিস যে ?' গণেশ আবার প্রশ্ন করল।

নন্দ আশেপাশে দেখে নিয়ে একটু কাছে এগিয়ে এসে বলল, 'খেয়ে-দেয়ে সিনেমায় যাব।'

'শুধু সিনেমায় গেলে এত হাসতিস না। নিশ্চয়ই কিছু ব্যাপার আছে।' গণেশ হাসতে হাসতে ওর মুখের দিকে চাইল।

নন্দ আরো এগিয়ে এলো। বলল, 'শোন, খুব প্রাইভেট ব্যাপার। কাউকে বলিস না।'

'আচ্ছা যা বলবি বল্। আমি আবার কাকে তোর কথা বলতে যাব ?'

নন্দ পকেট থেকে একটা ছোট্ট রঙীন কাগজ বের করে ওর দিকে এগিয়ে দিয়ে বলল, 'এটা লুকিয়ে রেখে দে। দুটো থেকে সওয়া দুটোর মধ্যে অসিতের বোন শ্যামলী তোর এখানে কিছু কিনতে আসবে…।'

'মানে, যে টেলিফোনে কাজ করে… ।'

'হ্যাঁ, হ্যাঁ, যে টেলিফোনে কাজ করে।'

গণেশ একবার হাতের ছোট্ট রঙীন কাগজটা দেখে জিজ্ঞাসা করল, 'এটা কি সিনেমার টিকিট ?'

হঠাৎ বোসবাড়ির চাকরটা এসে দু'প্যাকেট চার্মিনার নিয়ে যাবার পর নন্দ বলল, 'শ্যামলীকে তুই লুকিয়ে এই টিকিটটা দিয়ে দিস।'

'শেষকালে আমাকে যদি কিছু বলে ?'

'কিচ্ছু বলবে না।'

নন্দ হাসল। গণেশও হাসল।

একটা কৌটোর মধ্যে টিকিটটা রেখে দিয়ে গণেশ শুধু বলল, 'বন্ধু-বান্ধবের বোনের সঙ্গে এসব করা কি ঠিক হচ্ছে রে ?'

নন্দ এক বিদ্রূপের হাসি হেসে বলল, 'এত স্ট্রং নীতিজ্ঞান নিয়ে তো তুই দোকান চালাতে পারবি না।'

নন্দ চলে গেল। গণেশ মুজতবা আলির শবনম পড়তে শুরু করল। কলেজে ভর্তি হতে না পারলেও পড়াশুনা ছাড়েনি। বরাবরই পড়াশুনার ঝোঁক ছিল, কিন্তু এমনই অদৃষ্ট যে, সেই পড়াশুনাই ওকে ছাড়তে হলো। পড়াশুনা

ছাড়ার কথা শুনলেই সুনন্দা রেগে যেত, 'কলেজে না পড়লেই কি পড়াশুনা ছাড়া হলো ?'

'স্কুল-কলেজে না পড়লে কি পড়াশুনা হয় ?'

'কলেজে দুটো-তিনটে লেকচার শুনলেই বুঝি তুই পণ্ডিত হয়ে যেতিস ?' সুনন্দা হঠাৎ সংযত হয়ে বলে, 'দোকানে তো সব সময় খদ্দেরের ভীড় থাকবে না। তুই দোকানে বসে বসেই পড়তে পারবি।'

সকালবেলার ভীড় কেটে যাবার পরই গণেশ পাশ থেকে বই তুলে নেয়। পড়ে। খদ্দের এলে পাশে সরিয়ে রাখে। চলে গেলে আবার শুরু করে। তবে দুপুরেই শান্তিতে পড়তে পারে।

শবনম পড়তে পড়তে গণেশ বিভোর। মনে মনে বোধহয় কাবুল নদীর পাড়ে বসে বসে শবনমকে মুগ্ধ হয়ে দেখছিল আর ভাবছিল···

'এত মন দিয়ে কি পড়ছো ?'

কে ? শবনম ?

চমকে উঠে মুখ তুলে দেখল, না, শ্যামলী। তাড়াতাড়ি বইটা বন্ধ করতে করতে বলল, 'মুজতবা আলির শবনম পড়ছিলাম।'

কৌটো থেকে রঙীন কাগজটা বের করে একবার এদিক-ওদিক তাকিয়ে শ্যামলীর হাতে দিয়ে বলল, 'ঠিক আছে তো ?'

শ্যামলী একটু হাসল। বলল, 'আচ্ছা চলি।'

গণেশ চুপ করে বসে রইল। ভাবল কিভাবে দিনগুলো বদলে যাচ্ছে। বাবা যাবার পর তিন বছর ধরে দোকানে বসছে। খদ্দেরদের দেখছে। কিন্তু এরই মধ্যে কত মানুষ বদলে গেল।

ছোড়দা হায়ার সেকেণ্ডারী পাস করে দুর্গাপুরে একটা প্রাইভেট কারখানায় ট্রেনিং নিচ্ছে। সুনন্দা সকাল বেলায় মণীন্দ্র কলেজে পড়ছে। তারপর এগারোটা থেকে আড়াইটে পর্যন্ত বাচ্চাদের একটা স্কুলে কাজ করছে। গণেশও বড় হয়েছে। ব্যবসা করছে। ইচ্ছা করলে দুজনেই দু' পাঁচ টাকা ব্যয় করতে পারে, কিন্তু···

'কি এত ভাবছিস ?'

সুনন্দার গলা শুনেই গণেশ চমকে উঠল। বলল, 'তোর স্কুল হয়ে গেল ?'

ওর কথার জবাব না দিয়ে সুনন্দা পাল্টা প্রশ্ন করল, 'এক্ষুনি শ্যামলী এসেছিল, তাই না ?'

'তুই কি করে দেখলি ?'

হাত দিয়ে গিরীশ এভিনিউ দেখিয়ে বলল, 'ঐদিককার ফুটপাথে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে এক বন্ধুর সঙ্গে কথা বলতে বলতে দেখলাম।'

'হ্যাঁ, এসেছিল।'

'থাকে বাগবাজার স্ট্রিটে আর এলো তোর দোকানে ?'

'পরে বলব।'

'হ্যাঁরে, মা যেন কি চেয়েছিলেন ?'

গণেশ ওর কথার জবাব না দিয়ে শেলফ্ থেকে মাইশোর স্যাণ্ডেল সাবান নামিয়ে ওকে দিল।

সুনন্দা ঠোঁট বেঁকিয়ে জিজ্ঞাসা করল, 'মা বুঝি আমার জন্য মাইশোর স্যাণ্ডেল সোপ…'

'বড়মা যা চেয়েছিলেন তা তাঁর কাছে পেঁৗছে গেছে। তোকে যা দিচ্ছি তুই নিয়ে যা।'

সাবানটা নেড়ে চেড়ে দেখতে দেখতে সুনন্দা জিজ্ঞাসা করল, 'কত দাম রে?'

'তুই দাম দিবি নাকি?'

'তা তো বলিনি।'

'তবে?…'

'তবু…'

'কোন দরকার নেই। বাড়ি গিয়ে সাবান মেখে ভাল করে চান কর।'

'তুই কি চিরকালই আমাকে মাইশোর স্যাণ্ডেল সোপ মাখাবি?'

'চিরকাল দিতে দিবি কি?'

পাড়ার দোকান। তাছাড়া সামনা-সামনি বাড়িতে থাকে। সবাই জানে দু'বাড়ির মধ্যে কি দারুণ ঘনিষ্ঠতা। দোকানের সামনে দাঁড়িয়ে দু' পাঁচ মিনিট গল্প করলে কেউ কিছু মনে করেন না। কার্তিকদার স্ত্রী মেয়েকে নিয়ে রিক্সা করে যাচ্ছিলেন। মেয়েকে দেখিয়ে সুনন্দাকে জিজ্ঞাসা করলেন, 'পড়াশুনা করছে কি?'

সুনন্দা মাথা নেড়ে বলল, 'হ্যাঁ।'

কার্তিকদার স্ত্রীর রিক্সা একটু দূরে চলে যেতেই সুনন্দা বলল, 'তুই এই মাইশোর স্যাণ্ডেল সোপ দিয়ে দিয়ে আমার এমন বদ অভ্যাস করে দিয়েছিস যে, আর কোন সাবান ব্যবহারই করতে পারি নে।'

'কোন অভ্যাসই চিরকাল থাকে না।'

'তাছাড়া তোর দেওয়া সাবান ছাড়া অন্য-কারুর সাবানও নিতে পারি না।'

'আমার মতো সিগারেটওয়ালা আর কিছু চায় না।'

গণেশ ঠাট্টা করে বললেও সুনন্দা আর এক মুহূর্ত দাঁড়াল না। ঝড়ের বেগে চলে গেল।

তিন-চারদিন সুনন্দার সঙ্গে দেখা হলো না। দুপুরবেলায় খেয়ে-দেয়ে দোকানে আসার সময় রোজ ও-বাড়ির জানালার সামনে দাঁড়িয়ে গণেশ জিজ্ঞাসা করে, 'বড়মা, রাণী মাস্টারণীর কি খবর?'

'স্কুল থেকে এসেই ক'দিন ধরে শুয়ে পড়ছে। ও নিজেও কিছু বলে না, জিজ্ঞাসা করলেও চুপ করে থাকে।'

'মডার্ণ মেয়েদের ব্যাপার-স্যাপার বোঝা খুব কঠিন ব্যাপার।'

সুনন্দা ক'দিন ধরে দোকানের সামনে দিয়ে যাতায়াত করছে না। গণেশ

বার বার ঘড়ি দেখে। রাস্তার এদিক-ওদিক তাকায়। কিন্তু সুনন্দার দেখা পায় না। খদ্দের আসছে, যাচ্ছে, লেনদেন হচ্ছে, কিন্তু তবু গণেশ খুশি হতে পারে না। একটা বিচ্ছিরি বিরক্তি ভাব সব সময় মনের মধ্যে জমে রয়েছে। কাউকে বলতে পারে না, বোঝাতে পারে না অজস্র দুঃখ-কষ্ট-জ্বালা-যন্ত্রণার মধ্যে ঐ আবাল্য বান্ধবীর ভালবাসা ছাড়া তো আর কোন আনন্দের স্বাদ সে পায় না। কিন্তু ঐ ক্ষীণ রসের ধারাটুকুকেও যদি দিগন্তবিস্তৃত মরুপ্রান্তর গ্রাস করে নেয়, তাহলে কি হবে ?

সেদিনও গণেশ জিজ্ঞাসা করল, 'কি বড়মা, আজও কি রাণী মাস্টারণী শুয়ে আছে ?'

'হ্যাঁ বাবা।'

'সকালে কলেজ যাচ্ছে, দুপুরে মাস্টারণী হচ্ছে আর বাড়িতে এলেই যখন শুয়ে পড়ছে তখন মনে হয় বিয়ে করার শখ হয়েছে।'

গণেশের কথা শুনে বড়মা চলে যেতেই ঘরের কোণার চৌকিতে শুয়েই সুনন্দা মুখ তুলে বলল, 'বাজে বকবক না করে সিগারেট বেচতে যা।'

কথাটা শুনেই গণেশ চমকে উঠল। মুহূর্তের জন্য একবার অপলক দৃষ্টিতে সুনন্দার দিকে তাকিয়েই ও দোকানে চলে গেল।

সেদিন রাত্রে দশটা বাজতে না বাজতেই গণেশ দোকান থেকে বাসায় ফিরল। সাড়ে এগারোটা-বারোটার আগে যে কোনদিন বাড়ি আসে না তাকে এত তাড়াতাড়ি ফিরতে দেখেই মা জিজ্ঞাসা করলেন, 'কিরে, শরীর খারাপ লাগছে নাকি ?'

'না।'

'তবে আজ এত তাড়াতাড়ি এলি ?'

গণেশ একটু রাগ করেই বলল, 'রোজ ভোর পাঁচটা থেকে রাত বারোটা পর্যন্ত বিড়ি-সিগারেট বেচতে কি ভাল লাগে ?'

মা চুপ করে রান্নাঘরে চলে গেলেন। কি বলবেন ? বলার তো কিছু নেই। এই বয়সের ছেলেরা পড়াশুনা করবে, ঘুরবে, ফিরবে, বেড়াবে। প্রাণভরে হাসবে, খেলবে, কিন্তু গণেশের কিছুই হলো না। বারো মাস, তিনশো পঁয়ষট্টি দিন দোকানে পড়ে থাকে। দুর্গাপুজোর ক'দিনও দোকান বন্ধ রাখতে পারে না।

বলে, 'মা, এদিকে বাগবাজার, ওদিকে কুমোরটুলির পুজো। গিরীশ এভিনিউতে দিনরাত্তির লোক গিজগিজ করছে। এখন দোকান বন্ধ রাখা যায় ?'

'অন্তত বিজয়ার দিন দোকান বন্ধ রেখে একটু ঘুরতে বেরুবি।'

গণেশ হাসতে হাসতে বলল, 'তোমার মাথা খারাপ হয়েছে মা ? বিজয়ার দিন তো রাত দেড়টা-দুটো পর্যন্ত খদ্দের থাকবে।'

'তাই বলে কি বছরকার এমন দিনে একবারও মায়ের মুখ দেখবি না ?'

'যারা সারা বছর ফাঁকি দিয়ে বোনাস পায়, মা শুধু তাদেরই দেখতে

আসেন। আমাদের মতো পানওয়ালা-বিড়িওয়ালাদের তো দেখতে মা চান না।'

এই ছেলে যদি অভিমান করে রাত দশটায় দোকান থেকে বাড়ি ফেরে, তাহলে মা কি বলবেন? গণেশের হাত-মুখ ধোয়া হলেই বীণা আসন বিছিয়ে এক গেলাস জল দেয়। মা খেতে দেন। গণেশ খেতে বসে। খেতে খেতে বলল, 'ভাল খদ্দের পেলে দোকান বেচে দিতাম।

'হঠাৎ একথা বলছিস কেন?'

'বাইরে থেকে যে যত মিষ্টি কথাই বলুক, মনে মনে বিড়ি-সিগারেট-ওয়ালাকে সবাই ঘেন্না করে।'

'কেন? কেউ কিছু বলেছে?'

গণেশ একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে বলল, 'সে আর তুমি শুনে কি করবে? একটা সুবিধে মতন চাকরি পেলে সত্যি দোকানটা বেচে দিতাম।'

বাণী বলল, 'একদিক দিয়ে ভালই হয়। তুই তাহলে আবার কলেজে পড়তে পারবি।'

'কলেজে পড়ি আর না পড়ি টেরিকটের জামা-প্যান্ট পরে রাস্তায় বেরুলেই কেউ আমাকে সিগারেটওয়ালা বলে অপমান করতে সাহস করবে না।'

দুদিন পরে দুপুরের দিকে গণেশ সকালবেলার খবরের কাগজটা ভাল করে পড়ছিল। কাগজ পড়তে পড়তেই বুঝল কোন খদ্দের এসেছে। মুখ না তুলেই জিজ্ঞাসা করল, 'কি চাই?'

'তোকে চাই।'

গণেশ চমকে উঠে দেখল সুনন্দা। একবার খুশিতে মন ভরে উঠলেও পরমুহূর্তে ম্লান হয়ে গেল। জিজ্ঞাসা করল, 'কিছু চাই?'

'তুই আমার উপর খুব রাগ করেছিস, তাই না?'

'ভদ্দরলোকদের উপর রাগ করার অধিকার কোন পান-বিড়ি-সিগারেট-ওলার তো থাকতে পারে না।'

'তুই তো পান-বিড়ি বিক্রি করিস না।'

'পান-বিড়ি-সিগারেট একই ব্যাপার।'

সুনন্দা ভোরবেলায় উঠে কলেজ গেছে। তিন-চার ঘণ্টা বকবক করেছে। এখন বাড়ি ফিরছে। একটু বিশ্রাম করেই পড়তে বসবে। ক'মাস পরেই পার্টটু পরীক্ষা। মিনিট খানেক চুপ করে দাঁড়িয়ে থেকে জিজ্ঞাসা করল, 'তুই নাকি দোকান বিক্রি করে দিবি?'

'বিক্রি করলে জানতেই পারবি।'

'তুই আমার উপর দারুণ রেগে আছিস।'

'বললাম তো সে অধিকার বা সাহস আমার নেই।'

'একটা সাবান দিবি?'

গণেশ একটু উঠে গিয়ে একটা মাইশোর স্যান্ডেল সোপ এনে এগিয়ে দিতেই সুনন্দা হাতে নিল।

'দাম পাব না ?'

সুনন্দা একটু হাসল। বলল, 'হ্যাঁ।'

সুনন্দা আর দাঁড়াল না। চলে গেল। গণেশ আবার খবরের কাগজ খুলে বসল, কিন্তু কিছুতেই পড়তে পারল না।

রাত্রে বাড়ি ফিরে হাত-মুখ ধুয়ে খেতে বসার পর মা বললেন, 'তোর বালিশের তলায় একটা খাম আছে। রাণীদের স্কুলের কি জরুরী অর্ডার। দেখতে ভুলে যাস না।'

গণেশ শুধু শুনল, কিছু বলল না।

শ্রীবিদ্যামন্দির ছোট্ট প্রাইমারী স্কুল। পাড়ার বাচ্চা-কাচ্চারাই পড়ে। পাড়ার মেয়েরাই মাস্টারণী। সুনন্দা হেডমিস্ট্রেস। বড়দিদিমণি। প্রত্যেক মাসেই স্কুলের কিছু কাগজ-কালি-কলম খাতাপত্তর লাগে। সুনন্দা গণেশকে অর্ডার দেয়। গণেশ যোগাড় করে সাপ্লাই দেয়। পরের মাসে বাচ্চারা মাইনে দিলে গণেশ ওসব জিনিসের দাম পায়। সুনন্দা কলেজে ভর্তি হবার সঙ্গে সঙ্গেই স্কুলে চাকরি করছে। প্রায় তিন বছর হতে চলল। এই তিন বছর ধরেই গণেশ ওদের স্কুলের ওসব জিনিস সাপ্লাই দিচ্ছে।

শুতে যাবার সময় গণেশ খামটা ওর হাফশার্টের বুকপকেটে রেখে দিল। খুললও না।

পরের দিন সকালে পাঁউরুটির খদ্দেরদের ভিড় কাটার পর স্কুলের অর্ডার দেখার জন্য খামটা খুলতেই গণেশ স্তম্ভিত হয়ে গেল। 'অপরিচিত'র ম্যাটিনী শো'র একটা টিকিট। সঙ্গে ছোট্ট একটি চিরকুট, 'আসতেই হবে। এটা আমার দাবী।' নীচে লেখা, 'তোর সুনন্দা।'

একটু তাড়াতাড়ি দুপুরবেলায় খেতে গেল গণেশ। বলল, 'কিছু মালপত্তরের ব্যবস্থা করার জন্য এক্ষুনি বড়বাজারে ক্যানিং স্ট্রীটে যাচ্ছি।'

'কখন ফিরবি ?'

'আটটা পর্যন্ত তো বাজারই খোলা থাকে। ফিরতে ফিরতে সাড়ে আটটা-ন'টা তো হবেই।'

অন্ধকার হলে গিয়ে সুনন্দার পাশে বসতেই গণেশ একটু হাসল। সুনন্দা এক হাত দিয়ে ওর একটা হাত ধরে বলল, 'আমি জানতাম তুই আসবিই।'

॥ তিন ॥

বিপিনবাবু যখন দোকান চালাতেন তখন ডানদিকে সিগারেট-দেশলাই, বাঁ দিকে বিড়ি আর মাঝখানে কয়েকটা বয়ামে কিছু টফি-লজেন্স-বিস্কুট। এছাড়াও অতি সাধারণ কিছু স্টেশনারী জিনিসপত্র। গণেশ বিড়ি বিক্রি বন্ধ করে দিয়েছে, আগে ভদ্দরলোকেরাও বিড়ি খেতেন, বন্ধু-বান্ধবদের খাওয়াতেন। দেখতে দেখতে দিনগুলো বদলে গেল। বাড়ির চাকর-বাকররাও বিড়ি খাওয়া ছেড়ে দিয়েছে। সিগারেট খায়। কেউ পাশিং শো, কেউ প্লাজা, কেউ বা অন্য কিছু। ভদ্দরলোকদের অভ্যাসও পাল্টে গেছে। আগে মধ্যবিত্ত ভদ্দরলোক হলেই পাঁচ আনা দিয়ে এক প্যাকেট কাঁচি নিতেন। অনেকে ক্যাভেণ্ডার খেতেন। তখন ডাক্তার-এঞ্জিনিয়ার-গেজেটেড অফিসাররাও কাঁচি খেতেন। বিয়ে-বাড়িতে বরযাত্রীদেরও দেওয়া হত কাঁচি। সঙ্গে থাকত ক্যাপস্টান।

গণেশ যখন দোকানে এলো তখন পুরনো জমিদারী প্রথার মত কাঁচি-ক্যাপস্টানের যুগ শেষ। এখন তো শুধু অভয় ডাক্তার আর দু'একজনের জন্য ক্যাপস্টান রাখে। খুচরো ক্যাপস্টান বিক্রি বন্ধ করে দিয়েছে। দশটা সিগারেট বেচতে তিন-চারদিন পার হয়ে যায়। গণেশ দোকানে এসেই দেখল সিগারেট বিপ্লব এসেছে। সবাই চায় ফিল্টার টিপড্। টেরিকটের জামা-প্যাণ্ট ব্যবহার করার মত ফিল্টার টিপড্ সিগারেট খাওয়াও যুগধর্ম।

কখনও কখন গণেশ ভাবে বিড়ি-সিগারেটের ইতিহাস লিখলেও সমকালীন সমাজের অনেক কিছু জানা যাবে। পৃথিবীর লক্ষ-লক্ষ কোটি-কোটি মানুষ ধূমপান করেন, কিন্তু ধূমপানের ইতিহাস কেউ লিখেছেন বলে ও কারুর কাছে শোনেনি। অনিল সরকারের কাছে গণেশ শুনেছে রাণী এলিজাবেথের সময় ইংরেজ সাম্রাজ্য বিস্তারের প্রেরণায় স্যার ওয়ালটার র‍্যালে উত্তর আমেরিকার ভার্জিনিয়া থেকে আলু আর তামাক এনে ইংল্যাণ্ডে চালু করেন। ক্যাপস্টান সাহেব সিগারেট আবিষ্কার করেন, একথা ও অনেকের কাছে শুনেছে, কিন্তু এসব তো দু,চারশো বছরের কথা। তার আগে? চীন-ভারত, মিশর-পারস্য, গ্রীস-রোমের মত প্রাচীন সভ্যতার যুগে কি তামাকের ব্যবহার ছিল না?

গণেশ মনে মনে ভাবে তামাক নিয়ে উপন্যাস লিখলে সাহেব-বিবি-গোলামের মতই মনোগ্রাহী হবে। এই ক'বছর দোকান চালাতে গিয়েই কি কম বিবর্তন ও মজার ঘটনা দেখল!

যাত্রার মত থ্রি ক্যাসেলস, ব্ল্যাক এ্যাণ্ড হোয়াইট ও আরো কিছু সিগারেট হিরোশিমা-নাগাসাকিতে এ্যাটম বোমা পড়ার সঙ্গে সঙ্গে ভারতবর্ষ থেকে উধাও হয়ে গেল। যাত্রা ফিরে এলো সগৌরবে। জোড়াসাঁকো, হাটখোলা, শোভা-

বাজারের গৌরবসূর্য অস্তমিত হবার পর চিৎপুর আবার খবরের কাগজের পাতায় উঁকি দিতে শুরু করল। ফিরে এলো থ্রি ক্যাসেলস, ব্ল্যাক অ্যাণ্ড হোয়াইট, কিন্তু ফিরে পেল না পুরনো দিনের গৌরব। পুজোর সময় অনেকেই একটু দামী, একটু নামকরা সিগারেট খায়। গোরা থ্রি ক্যাসেলস কিনতেই ছোটভাই বলল, 'এসব বিলিতী কোম্পানীর ধেনো গিলে কি লাভ বল্ তো?'

গোরা তর্ক করে, 'ওরে মরা হাতী লাখ টাকা।'

দেবী বলে, 'বাজে বকিস না গোরা। লাটসাহেবের বাড়িতে থাকলেই আগের দিনের লাটসাহেবের মত লাটসাহেবী করা যায়?'

ছোটভাই বলল, 'মুরোদ থাকে তো ইণ্ডিয়া কিংস্ নে। নয়তো উইলস্ ফিল্টার কিং নে।'

দেবী বলল, 'হ্যাঁ, হ্যাঁ, সেই ভাল। তিন টাকা মিটারের ছিট কাপড়ে ম্যাক্সি পরাই তো লেটেস্ট ফ্যাশান।'

পুজোর সময় ছাড়া গণেশ খুব বেশি রকমের সিগারেট রাখে না যা চলে তাই রাখে, উইলস্ প্লেন-ফিল্টার, ফিল্টার কিংস্, উইণ্ডসর, ফোর স্কোয়ার, পানামা, চার্মিনার। এগুলোই বেশি রাখে। আরো পাঁচ-সাত রকমের সিগারেট রাখে, তবে কম। ডিমাণ্ড নেই। এটা রাজবল্লভ পাড়ার দোকান। এখানে রেড বার্ড, টেলিগ্রাফ চলে না। ওগুলো টিটাগড়-ব্যারাকপুর-নৈহাটি বা মোমিনপুর, খিদিরপুরের কলকারখানার আশেপাশের দোকানে খুব চলে।

গণেশ যখন ছোট ছিল মাঝে মাঝে বাবার সঙ্গে দোকানে আসত! দু পাঁচ মিনিট পর পরই ক্যাভেণ্ডারের খদ্দের আসত। ও বাবার কাছে শুনেছে আগে ক্যাভেণ্ডারের টিনের সুটকেসে বই নিয়ে ছেলেমেয়েরা স্কুলে যেত। দোকানে দোকানে ক্যাভেণ্ডার ভরা থাকত। তারপর হঠাৎ হারিয়ে গেল। সিগারেটের দাম বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে ক্যাভেণ্ডার আবার উঠছে।

গণেশ সোসিওলজি পড়েনি, কিন্তু এই ক'বছর দোকান চালাতে চালাতে বুঝেছে এ যুগে রুচির স্থায়িত্ব বড় কম। তাছাড়া রুচি আর অর্থনৈতিক চাপে রুচি হারছে।

'গণেশ, এক প্যাকেট উডবাইন দে তো।'

গণেশ অবাক। জিজ্ঞাসা করল, 'কি ব্যাপার বিশুদা, একেবারে উইলস্ থেকে উডবাইন?'

'পরশু দিন শালীর বিয়েতে গিয়েছিলাম, দেখিসনি?'

'দেখিনি মানে? যাবার সময় আপনি কত কথা বললেন। তারপর দু' প্যাকেট গোল্ডফ্লেক...'

বিশুদা চোখ নাচিয়ে বললেন, 'ঐ এক দিনে একশো দশ টাকা খসে গেল।'

হঠাৎ অনিল সরকার পাশে এসে দাঁড়িয়ে জিজ্ঞাসা করলেন, 'কিরে বিশু, কি হলো?'

'দ্যাখ না! উইলস্-এর বদলে উডবাইন নিচ্ছি বলে গণেশ অবাক হচ্ছে।'

'অবাক তো হবেই ! ওর সেল কমে গেলে…'

বিশুদা ওকে আর বলতে দিলেন না, 'মাসে মাসে দু' আড়াই হাজার পেয়ে তোর বুদ্ধিটা একেবারে গেছে।'

অনিল সরকার একটু চাপা হাসি হাসতে হাসতে বললেন, 'জান গণেশ, বিশু আমার ক্লাসফ্রেণ্ড ?'

গণেশ বলল, 'খুব ছোটবেলা থেকে বন্ধুত্ব জানি, কিন্তু ক্লাসফ্রেণ্ড জানতাম না।'

অনিল সরকার বললেন, 'গণেশ, ওকে উইলস্‌ দাও। আমি দাম দিচ্ছি।'

বিশুদা বললেন, 'তোর পয়সায় উইলস্‌ খাব কেন রে ? খেলে গোল্ডফ্রেক খাব।'

'বেশ, তাই নে।'

কার্তিকদা আগে বহুকাল ক্যাপস্টান খেয়েছেন। ছাত্র-জীবন থেকে বিয়ের দু'চার বছর পর পর্যন্ত। তারপর উইলস্‌। এখন সিমলা।

সিধুদা বললেন, 'কার্তিকদা, তোমার এ অধঃপতন আর চোখে দেখতে পারি না।'

সিমলার প্যাকেট হাতে নাড়াচাড়া করতে করতে কার্তিকদা বললেন, 'কেন, সিমলার স্ট্যাণ্ডার্ড কি এতই খারাপ ?'

সিধুদা মাথা নাড়তে নাড়তে বললেন, 'নট ফর ইউ কার্তিকদা। এর চাইতে তুমি সিগারেট খাওয়া ছেড়ে দাও।'

'ছেড়ে দাও বললেই ছেড়ে দাও ?'

'সিগারেট খাওয়া তো ভাল না। একবার রাগ করে ছেড়েই দাও না।'

'তার বদলে কি ধরব ?'

'কিছু ধরতে হবে না।'

কার্তিকদা একটু করুণ হাসি হেসে বললেন, 'সিধু, দিস ইজ ইণ্ডিয়া। এখানে বিড়ি-সিগারেট, বউ আর সিনেমা ছাড়া তো আনন্দ করার কিছু নেই। ও তিনটের কোনটাই আমরা ছাড়তে পারব না।'

কার্তিকদা সিমলার প্যাকেটটা পকেটে পুরে চলে গেলেন ! সিধুদা চুপ করে দাঁড়িয়ে রইলেন।

রাজবল্লভ পাড়া একটা বিরাট অঞ্চল নয়। রাজা রাজবল্লভ স্ট্রীট, লক্ষ্মী দত্ত লেন, রাধামাধব গোস্বামী লেন ও দু' একটা অলিগলি নিয়ে রাজবল্লভ পাড়া একদিকে গিরীশ এভিনিউ আর অন্যদিকে চিৎপুরের মাঝখানে চ্যাপ্টা হয়ে পড়ে আছে।

কলকাতার মানচিত্রে রাজবল্লভ পাড়া খুঁজে পাওয়াই দুষ্কর। তা হোক। এটা একটা মিনি কলকাতা। সব রকমের মানুষ এখানে আছেন। গরীব-বড়লোক, শিক্ষিত-অশিক্ষিত, বেকার-তিনচার হাজারী, গান্ধীবাদী-মার্কসবাদী, পুলিশের দালাল-চীনের অনুরাগী, কবি-সাহিত্যিক-অভিনেতা-

অভিনেত্রী। সামন্ততন্ত্রের প্রতিনিধি, আমলাতন্ত্রের সাধক-বুর্জোয়া। আরো কত রকমের মানুষ যে এই ছোট্ট পাড়াটার মধ্যে ঠাসাঠাসি করে আছেন তা বাইরের মানুষ ভাবতে পারবেন না। এখানে তান্ত্রিক আছেন, আছেন কৃষ্ণ-চৈতন্যভক্ত। ডাক্তার, কবিরাজ, উকিল, মাস্টারের ছড়াছড়ি। এঁদের অনেকেই গণেশের খদ্দের। এঁদের নিয়ে ওর সংসার।

'স্বদেশদা।'

'কি রে?'

'মাসীমাকে বলবেন আজ বিকেলেই যেন কাউকে পাঠিয়ে রুটি নিয়ে নেন। কাল সকালে রুটির গাড়ি আসবে না।'

'আচ্ছা বলব।'

'ভুলে যাবেন না। ভুলে গেলে মাসীমার কাছে আমায় বকুনি খেতে হবে।'

স্বদেশদা চলে গেলে গণেশ আবার প্রবোধেন্দু ঠাকুরের অনুবাদ করা কুমার-সম্ভব পড়ে।

'কী রে কেমন লাগছে?'

ইউনিভার্সিটি থেকে ফেরার পথে সুনন্দা সামনে দাঁড়িয়ে প্রশ্ন করতেই গণেশ হাসতে হাসতে আবৃত্তি করল—

'সহসা হরণ করে নিল হর
প্রিয়ার কটির বস্ত্র
দুহাতে হরের ঢাকে দুটি আঁখি
কোথা পাবে উমা অস্ত্র…'

সুনন্দাও হাসে। বলে, 'তোকে এ বইটা এনে দেওয়াই ভুল হয়েছে।'

'বই নেবার আগে বুঝি জানতিস না কালিদাস কি লিখেছেন?'

'জানব না কেন? কিন্তু ভাবিনি কুমার-সম্ভব পড়ে এত ফাজিল হয়ে যাবি।'

গণেশ হাসে। চাপা হাসি হাসতে হাসতে বলল, 'হাজার হোক ইউনিভার্সিটিতে পড়িস। খুব কায়দা করে আমাকে ট্রেনিং দিয়ে দিলি।…'

সুনন্দা তির্যক দৃষ্টিতে একবার গণেশকে দেখেই তরতর করে বাড়ির দিকে চলে গেল।

গণেশ ওর পথের দিকে তাকিয়ে থাকতে থাকতে ভাবে কিভাবে কতগুলো বছর কেটে গেল। দেখতে দেখতে সুনন্দা স্কুল-কলেজ পার হয়ে ইউনিভার্সিটিতে ঢুকল। সেদিনের সেই ছোট্ট বীণার বিয়ে হয়ে গেল। বীণার বিয়ের রাত্রের একটা কথা মনে পড়ল গণেশের।

ছোটমামা বিয়ের প্রস্তাব করতেই গণেশ ঘাবড়ে গিয়েছিল। ভাবতে পারেনি ও বোনের বিয়ে দিতে পারবে। শেষ পর্যন্ত হয়ে তো গেল। ক্লান্তিতে দেহটা ভেঙে পড়লেও একটা বিচিত্র পরিতৃপ্তিতে গণেশ ছাদের এক কোণায় চুপচাপ বসেছিল, অনেক রাত হয়েছে। নীচে মা, বড়মা, ছোটমামা

বা আরো কয়েকজন কাজকর্মে ব্যস্ত থাকলেও বিয়ে-বাড়ির কল-কোলাহল নেই। গণেশ বীণার কথাই ভাবছিল। হঠাৎ বাসর ছেড়ে সুনন্দা এসে জিজ্ঞাসা করল, 'কি রে, কিছু হয়েছে?'

গণেশ মাথা নেড়ে বলল, 'কিছু না।'

'তবে এত কি ভাবছিস?'

'ভাবছি বীণার কথা।'

'বীণার কি কথা ভাবছিস?'

'ভাবছি দু'চার বছরের মধ্যে আমার ভাগ্নে হবে। তাকে নিয়ে আমি দোকানে যাব, টফি দেব, চকোলেট দেব…'

সুনন্দা হাসতে হাসতে জিজ্ঞাসা করল, 'তারপর?'

'তারপর হয়তো টানাটানি করতে গিয়ে দোকানের একটা বয়মই ভেঙে ফেলবে, কিন্তু আমি একটুও বকতে পারব না।'

গণেশ স্বপ্ন দেখতে দেখতে মদির হয়ে একবার সুনন্দার দিকে তাকায়। সুনন্দাও মুগ্ধদৃষ্টিতে একবার গণেশের দিকে তাকায়। তারপর ওর কানের কাছে মুখ নিয়ে খুব চাপা গলায় বলে, 'ভয় নেই, আমাদের ছেলেও বয়াম ভাঙবে।'

গণেশ চমকে উঠে তাকাবার আগেই সুনন্দা নীচে নেমে যায়।

সুনন্দার পথের দিকে চেয়ে থাকতে থাকতে ঐ কথাগুলো আবার মনে পড়ল। তারপর আবার দৃষ্টি গুছিয়ে এনে কুমার-সম্ভব পড়তে শুরু করল।

'হ্যাঁরে, তোর কাছে বসন্ত মালতী আছে?'

সুনন্দা ফিরে আসায় গণেশ অবাক হয়। জিজ্ঞাসা করল, 'ঠিক করে বল্ তো কুমার-সম্ভবের খোঁজ নিতে এলি, না কি সত্যি সত্যিই বসন্ত মালতী…'

'যা জিজ্ঞেস করছি তার জবাব দে।'

'বসন্ত মালতী দিয়ে কি করবি?'

'ভাতে খাব।'

'তাছাড়া তোকে বসন্ত মালতী দিলে তো দাম পাব না। আর কত লোকসান দেব তোর জন্যে?'

'আমার অদৃষ্টেই তো দোকান চলছে… ।'

'তাই নাকি?'

'একশো বার। আমি না থাকলে এ দোকান চলতো?'

গণেশ এবার কথার মোড় ঘুরায়। জানতে চায়, 'সত্যিই তোর বসন্ত মালতী চাই?'

'সত্যিই চাই।'

'আচ্ছা পেয়ে যাবি।'

সুনন্দা চলে গেলেও সুনন্দার কথাই ভাবে গণেশ। ভাবে অতীত, বর্তমান, ভবিষ্যতের কথা। ছোটবেলা থেকে এমন ঘনিষ্ঠভাবে মানুষ হয়েছে যে, ওকে

কিছুতেই দূরের মানুষ ভাবতে পারে না। ও কলেজে ভর্তি হবার পর গণেশের ভয় হয়েছিল এবার নিশ্চয়ই পাল্টে যাবে। না, তিন বছরের কলেজ-জীবনে ওর কোন পরিবর্তন হলো না। বরং পরিণত দেহ-মন নিয়ে আরো কাছে এলো।

'এখন আর তুই আমার সঙ্গে বেশি মেলামেশা করিস না।'

গণেশের কথায় সুনন্দা অবাক হয়ে জিজ্ঞাসা করে, 'কেন?'

'হাজার হোক তুই কলেজে পড়ছিস।'

'কলেজে না পড়েই তোর যা পড়াশুনা তা ক'টা ছেলেমেয়ের আছে রে?'

'তাছাড়া...'

গণেশ থামে। সুনন্দার দিকে তাকিয়ে তাকিয়ে মিট মিট করে হাসে।

'তাছাড়া বলে থামলি কেন?'

'তাছাড়া দিনে দিনে তুই এত সুন্দরী হচ্ছিস যে, আমার সঙ্গে মেলামেশা করা মানায় না।'

'তা এসব কথা আগে ভাবিসনি কেন? এখন এসব কথা ভেবে তো কোন লাভ নেই।'

টুক্‌রো টুক্‌রো আরো কত স্মৃতি, কত কথা মনে পড়ে। ভাবতে গিয়েও খুশিতে মন ঝলমল করে ওঠে। জীবনের অসংখ্য ব্যথা-বেদনার মাঝখানে সুনন্দাই তো এক টুক্‌রো শান্তি, আনন্দের ইঙ্গিত। কলেজ-স্কুল-যাতায়াতের পথে ঐ সামান্য দু'পাঁচ মিনিটের জন্য দোকানের সামনে ওর উপস্থিতি গণেশকে সতেজ সজীব করে রেখেছে ভোর থেকে মাঝরাত্তির পর্যন্ত। শনি-রবি বা বৃহস্পতিবার—কোনদিনই গণেশ দোকান বন্ধ রাখেনি। এসব দোকান বন্ধ থাকে না। প্রতিদিনের রুজি-রোজগার দিয়ে যাদের প্রতিদিনের ক্ষুধার নিবৃত্তি করতে হয় তারা দোকান বন্ধ রাখতে পারে না।

তবু মাসে অন্তত একবেলা দোকান বন্ধ রাখতেই হয় সুনন্দার অনুরোধে। এই পৃথিবীতে বহু জনের দাবী উপেক্ষা করা যায়, কিন্তু একটা সজল চোখের অনুরোধ উপেক্ষা করার মত ক্ষমতা খুব বেশি মানুষের নেই।

আরো কত দিন পার হয়ে গেল। শেষ হলো সুনন্দার কলেজ-জীবন, শুরু হলো বিশ্ববিদ্যালয়ের পালা। এই রাজবল্লভ পাড়ার গলিতে বসেই গণেশ কত কি আবর্তন-বিবর্তন দেখল। কোন পরিবর্তন দেখল না সুনন্দার।

'দ্যাখ গণেশ, এম. এ. পাস করার পর আমি একটা ভাল চাকরি যোগাড় করবই। তারপর তোর দোকানটার একটা কিছু করতে হবে।'

গণেশ চা খেতে খেতে চুপ করে শোনে।

সুনন্দা বলে, 'প্রত্যেক মাসে মাসে দু' একশো টাকা ঢাললেই দোকানের চেহারা বদলে যাবে।'

বেয়ারা বিল নিয়ে এলো। গণেশ তিনটে টাকা দিয়ে আবার চায়ের কাপে চুমুক দিল।

'কিরে, চুপ করে আছিস কেন? মাসে মাসে দুশো একশো টাকা দিলে

বুঝি দোকানের কিছু হবে না ?'

'হবে না কেন ? ব্রজেনদা বলেছেন টুয়েন্টি ফাইভ পার্সেন্ট পেমেন্ট করলে উনি এক হাজার টাকার মাল দেবার ব্যবস্থা করতে পারবেন।'

'বাকি টাকা ?'

'পরের বার মাল নেবার আগে শোধ করতে হবে।'

'তুই পঞ্চাশ টাকা যোগাড় করতে পারবি ?'

'কি হবে পঞ্চাশ টাকা দিয়ে ?'

'পারবি কিনা তাই বল্ !'

'চার-পাঁচ দিনের মধ্যে যোগাড় করতে পারব।'

'আমি তোকে কালই দুশো টাকা দিয়ে দেব। ব্রজেনদাকে বল্ !'

'এ কি তোর নিজের টাকা ?'

'অন্যের টাকা হলে কি তোকে দিতে পারতাম ?'

'কিন্তু…'

'তোর এই কিন্তুটা ছাড় তো।'

এক সপ্তাহের মধ্যে ক্যানিং স্ট্রীটের মডার্ণ স্টোরের গাড়ি এসে থামল রাজবল্লভ পাড়ার মোড়ে। পেটি বোঝাই মাল নামল। গণেশের দোকানের পিছনের বড় শেল্‌ফটা ভরে গেল। বিকেলবেলায় সব খদ্দেরদের মুখেই জিজ্ঞাসা। গণেশ সবাইকে বলল, 'ব্রজেনদা ক্রেডিটে মাল পাবার ব্যবস্থা করে দিয়েছেন।' বাড়িতেও এর বেশি কাউকে কিছু বলল না।

রাত্রে একটু তাড়াতাড়িই দোকান বন্ধ করে ফিরে গেল গণেশ। তখনও মা, বড়মা, সুনন্দার গল্পগুজব চলছে। বড়মা জিজ্ঞেস করলেন, 'কিরে, আজ যে দশটা বাজতে বাজতেই ফিরলি ?'

'আজ আপনি আমাকে খেতে বলেছেন বলেই তো তাড়াতাড়ি এলাম।'

সবাই হাসলেন।

বড়মা শুধু গম্ভীর হয়ে জিজ্ঞাসা করলেন, 'সত্যি তুই আমার এখানে খাবি ?'

'এমন করে জিজ্ঞাসা করলে কেউ খেতে পারে ?'

বড়মা সঙ্গে সঙ্গে উঠলেন। বললেন, 'আমি যাচ্ছি, তুই হাত-মুখ ধুয়ে আয়।'

গণেশ সঙ্গে সঙ্গে বড়মাকে জড়িয়ে ধরে বলল, 'না, না, বড়মা, আপনার কষ্ট করতে হবে না।'

'কষ্ট আর কি, তুই আয়।'

গণেশের মা বললেন, 'আমার রান্নাবান্না হয়ে গেছে। তুমি আবার কষ্ট করবে কেন ? অন্য একদিন খাইয়ে দিও।'

'সেই ভাল বড়মা। আজ বরং সুনন্দাই আমাদের এখানে ক্যানাডিয়ান গম গিলুক।'

সুনন্দা হাসতে হাসতে বলল, 'আমার খাওয়া-দাওয়া অনেকক্ষণ শেষ।'
'তাহলে তুই বসে বসে খাওয়া দ্যাখ।'
'তুই কি আমার গুরুদেব যে, বসে বসে তোর খাওয়া দেখব ?'
'আমাকে একটু ভক্তি-শ্রদ্ধা কর। তা না হলে তোর কপালে বর জুটবে না।'
বড়মা চলে গেলেন। মা রান্নাঘরে খাবার-দাবার গরম করতে গেলেন। গণের একবার মা-র ঘরে ঢুকে দেখল দু'বোন শুয়ে আছে। জিজ্ঞাসা করল, 'কি রে, তোরা ঘুমিয়েছিস ?'
কোন জবাব পেল না। গণেশ পাশের ঘরের দরজার কাছে গিয়ে ইশারা করে সুনন্দাকে ডাকল। সুনন্দা ওর কাছে যেতেই পকেট থেকে ছোট্ট একটা প্যাকেট বের করে গণেশ বলল, 'এটা তুই ব্যবহার করিস।'
'এটা কি ?'
'ফ্রেশ সেণ্ট।'
'কোথায় পেলি ?'
'তোর জন্যে যোগাড় করেছি। মাখিস কিন্তু !'
সুনন্দা হাসতে হাসতে মাথা নাড়ল।
সুনন্দার চলে যাবার পথের দিকে তাকিয়ে থাকতে থাকতে এমনি আরো কত মিষ্টি-মধুর স্মৃতির কথা মনে হয়। কিন্তু হঠাৎ মনের ঈশান কোণে এক টুকরো কালো মেঘ দেখা দেয়। যখন ও এম. এ. পাস করবে, অধ্যাপিকা হবে, তখনও কি···

একটা দশ নয়া পয়সা দেখিয়ে দিলীপদার ছেলে জিজ্ঞাসা করল, 'দুটো টফি হবে গণেশদা ?'
'কে কে খাবি বল্ ?'
'আমি আর আমার বোন।'
ছোট্ট মেয়েকে কোলে নিয়ে দিলীপদার স্ত্রী একটু দূরে দাঁড়িয়ে হাসছেন।
গণেশ জিজ্ঞাসা করল, 'মা খাবেন না ?'
'না।'
'কেন ?'
'মা-বাবা টফি খায় না।'
গণেশ বয়াম থেকে দুটো টফি বের করে এগিয়ে দিয়ে বলল, 'তাহলে দুটোই নিয়ে যা।'
বলাই দোকানের সামনে দিয়ে যেতে যেতে বলল, 'তোর কাঁচিখুড়োর অবস্থা খুব খারাপ।'
গণেশ ঠিক বুঝতে না পেরে জিজ্ঞাসা করল, 'কার অবস্থা খারাপ ?'
'তোর কাঁচিখুড়ো। কেষ্ট মিত্তির।'
আর কিছু জিজ্ঞাসা করার সুযোগ পেল না গণেশ। বলাই হন্ হন্ করে চলে গেল।

বিকেলের দিকে ডাঃ সরোজ ঘোষকে আসতে-যেতে দেখল গণেশ। সন্ধ্যার পর পাড়ার সবাই অফিস থেকে ফেরার পরই ছোটভাই গণেশের দোকান থেকে সিগারেট নিতে নিতে অমিতকে বলল, 'হেডঅফিস থেকে কেষ্টদার কাছে আর্জেণ্ট টেলিগ্রাম এসেছে, কাম শার্প। তাড়াতাড়ি খাওয়া-দাওয়া করে আয়।'

গণেশ বলল, 'ছোটভাইদা, তুমি একটু দোকানের সামনে দাঁড়াবে? আমি একটু কেষ্টকাকাকে দেখে আসব।'

'যা ঘুরে আয়।'

গণেশ একলাফে দোকান থেকে নেমে রাস্তায় পা দিতেই দেবী এসে বলল, 'কেষ্টপ্রাপ্তি হয়ে গেছে।'

গণেশ এক মুহূর্তের জন্য ভাবল। তারপর বলল, 'তোমরা যাও ছোটভাইদা, আমি দোকান বন্ধ করেই যাচ্ছি।'

…কেষ্ট মিত্তিরকে নিয়ে সবাই ঠাট্টা করতেন। একটা গেঞ্জি আর লুঙ্গি পরে সারাদিন কাটিয়ে দিতেন। পাড়ার ছেলে-ছোকরারা মাঝে মাঝে ইয়ার্কি-ফাজলামি করত, কিন্তু কেষ্ট মিত্তির কিছু গ্রাহ্য করতেন না। শুধু পাড়ার ছেলেদের টিপ্পনী নয়, আরো অনেক কিছুই উনি অগ্রাহ্য করতে পারতেন।

যখন ফোর্ট উইলিয়ামের চারপাশে সাহেবদের আড্ডা বসত আর মেম-সাহেবরা ঘোড়ার গাড়িতে চৌরঙ্গীপাড়ায় ঘুরে বেড়াতেন, তখন জানবাজার থেকে বাগবাজারের মধ্যে যে ক'জন বাঙালীকে সাহেবরাও খাতির করতেন তার মধ্যে সিদ্ধেশ্বর মিত্তির ছিলেন অন্যতম। সিদ্ধেশ্বর মিত্তির রাণী রাসমণির জামাতা মথুরবাবুর বিশেষ বন্ধু ছিলেন এবং সেই সূত্রে দক্ষিণেশ্বরে যাতায়াত করতেন।

এই সিদ্ধেশ্বর মিত্তিরের ঘোড়ার গাড়ি চড়ে রামকৃষ্ণদেব বহুবার গিরিশ ঘোষের থিয়েটার দেখতে গিয়েছেন। সিদ্ধেশ্বর মিত্তিরের একমাত্র ছেলে বীরেশ্বর মিত্তিরকে নিয়ে হাজার পাতার উপন্যাস লেখা যায়। কেষ্ট মিত্তির হাসতে হাসতে বলতেন, 'বাড়িতে চার-পাঁচটা ঘোড়ার গাড়ি ও দু'খানা ফোর্ড গাড়ি থাকা সত্ত্বেও আমি পেটে থাকার সময় মা রোজ হেঁটে হেঁটে গঙ্গাস্নান করতে যেতেন।'

বঙ্কু বিশ্বাস বিড়ির টান দিয়ে জিজ্ঞাসা করতেন, 'কেন?'

'মা সবাইকে জানাতে চাইতেন যে, তিনি গর্ভবতী। কারণ তা না হলে হয়তো আমার জন্মকাহিনী নিয়ে অনেক কাহিনী রটে যেতে পারত।'

বঙ্কু বিশ্বাস পার্টিশানের পরে কলকাতায় এসে রাজবল্লভ পাড়ায় বাস করছেন। সিদ্ধেশ্বর মিত্তিরের ইতিহাস তিনি জানেন না, শোনেন নি। তাই আবার জিজ্ঞাসা করলেন, 'কেন?'

কেষ্ট মিত্তির গণেশের দোকানের কাঁচি সিগারেটে ছোট্ট টান দিয়ে বললেন, 'বাবা যে মাসের উনত্রিশদিনই সোনাগাছি-রামবাগানের পতিতাদের

বাড়িতে রাত কাটাতেন।' একটু থেমে, একবার দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে উনি বললেন, 'আমার বাবার মত মাতাল বদমায়েস বোধহয় বাংলাদেশে আর জন্মাবে না, কিন্তু আমার মা সাক্ষাৎ ভগবতী ছিলেন।'

মায়ার দাদু শ্যাম পার্ক থেকে ছোট নাতনীকে নিয়ে বেড়িয়ে ফেরার সময় একটু দাঁড়িয়ে জিজ্ঞাসা করলেন, 'কি কেষ্ট, কি গল্প হচ্ছে?'

কেষ্ট মিত্তির তাড়াতাড়ি কাঁচি সিগারেটটা ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে বললেন, 'বঙ্কুর কাছে আমার বাবা-মার কথা বলছিলাম।'

'সত্যি বলছি বঙ্কু, অমন পুণ্যবতী মহিলা আমি কখনও দেখিনি। জন্ম জন্ম সাধনা করে কেষ্ট অমন মা পেয়েছিল।'

কেষ্ট মিত্তির বঙ্কু বিশ্বাসের দিকে তাকিয়ে জিজ্ঞাসা করলেন, 'আমার মা কিভাবে মারা যান জান?'

'কিভাবে?'

'ঠাকুরের খড়মে প্রণাম করার সময় মা দেহত্যাগ করেন।'

বঙ্কু বিশ্বাসের চোখ-মুখ দেখেই মায়ার দাদু বুঝলেন উনি ঠিক ধরতে পারেননি। তাই বললেন, 'কেষ্টদের বাড়িতে রামকৃষ্ণদেবের খড়ম আছে। সেই খড়ম ওর মা রোজ পুজো করতেন এবং একদিন সকালে পুজোর শেষে ঐ খড়মে প্রণাম করতে করতেই উনি দেহত্যাগ করেন।'

বঙ্কু বিশ্বাস এবার চমকে উঠেন, 'তাই নাকি?'

'তাই তো বলছিলাম অমন মা-র পেটে জন্মে কেষ্ট ধন্য হয়ে গেছে।'

মায়ার দাদু চলে যাবার পর কেষ্ট মিত্তির হাসতে হাসতে বললেন, 'জান বঙ্কু, একবার শরৎ চাটুজ্যের কাছে বাবা গিয়েছিলেন।...'

বঙ্কু বিশ্বাস সঙ্গে সঙ্গে জিজ্ঞাসা করলেন, 'কেন?'

'বাবা শরৎ চাটুজ্যেকে বলেছিলেন, মেসের ঝি সাবিত্রীর সঙ্গে সতীশের একটু এদিক-ওদিক হওয়া নিয়ে 'চরিত্রহীন' লিখে আমার মত রিয়েল চরিত্র-হীনদের আপনি অপমান করেছেন।'

বঙ্কু বিশ্বাস হো-হো করে হেসে উঠলেন।

কেষ্ট মিত্তিরও হাসলেন। বললেন, 'বাবা তো শরৎ চাটুজ্যেকে চ্যালেঞ্জ করেছিলেন, যদি পারেন আমার মত লোকদের নিয়ে লিখুন। তা না হলে বাঘের ছাল গায়ে জড়িয়ে বেড়ালের মত মিউ মিউ করবেন না।'

বীরেশ্বর মিত্তিরের ছেলে হয়েও কেষ্ট মিত্তির শুধু অবিবাহিতই থাকেননি, কোন মেয়ের প্রতিও তাঁর দুর্বলতা ছিল না। কেষ্ট মিত্তির নিজেই হাসতে হাসতে সবাইকে বলতেন, সোনাগাছিতে বাবার এমন রেপুটেশন ছিল যে বাবার মৃত্যুর পর আমাকে নিয়েও টানাটানি শুরু করল অনেকে। প্রথমে আপত্তি জানালেও শেষ পর্যন্ত না গিয়ে পারলাম না।'

কেষ্টদা একটু থামলেন।

'আঃ কেষ্টদা, এমন জায়গায় কেউ ব্রেক করে?' ছোটভাই একটু জোরেই বলল।

'তোরা বিশ্বাস করবি কিনা জানি না, কিন্তু আমি ঠাকুরের পাদুকা ছুঁয়ে বলতে পারি পর পর দুদিন যে দুটি মেয়ের কাছে গিয়েছিলাম তাদের ঠিক আমার মায়ের মতন দেখতে…'

'তাই নাকি?' বন্ধু বিশ্বাস প্রশ্ন করেন।

'তাই তো দুদিনই ওদের দুজনকে প্রণাম করে পালিয়ে এসেছিলাম।' কেষ্ট মিত্তিরের চোখদুটো ছলছল করে উঠেছিল। একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে বললেন, 'আমাকে কেউ বলল পাগল, কেউ বলল মাতাল, কিন্তু আমি মনে মনে বুঝলাম ওই মার পেটে দশ মাস দশ দিন থেকে আমার দ্বারা একাজ হবে না।'

কেষ্ট মিত্তিরের মৃতদেহের সামনে দাঁড়িয়ে গণেশের মনে পড়ল বাবা মারা যাবার পর উনি মাকে বলেছিলেন, 'কেঁদো না মা, কেঁদো না। মা কি কখনও বিধবা হন?'

॥ চার ॥

'কিগো গোরাদা, আজ এত রাত করে ফিরছ ?' গোরা দোকানের সামনের দাঁড়িয়ে পার্স বের করতেই গণেশ প্রশ্ন করল।

'আর বলিস না, পাগল হয়ে গেলাম।'

'কেন ? কি হলো ?'

'রোজ রোজ ঝামেলা কি ভাল লাগে ?'

দেবী পাশে এসে দাঁড়িয়ে জিজ্ঞাসা করল, 'কি ব্যাপার রে গোরা ? খুব গরম গরম ছাড়ছিস মনে হচ্ছে !'

গোরা দু' প্যাকেট উইলস্ ফ্লেক গণেশের হাত থেকে নিয়ে বলল, 'তোদের মত সুখের পায়রা তো না, যে মেজাজ গরম হবে না ?'

'আমরা সুখের পায়রা, তাই না ?'

'তোদের মত অকর্মণ্য লক্ষ লক্ষ সরকারী কর্মচারীর জন্যই তো দেশটা ডুবছে।'

দেবী পকেট থেকে পানামা বের করে গণেশের দেশলাই দিয়ে জ্বালিয়েই একটা টান দিল। বলল, 'তোরা বিজনেস করে লুট করছিস আর দোষ চাপাচ্ছিস আমাদের ঘাড়ে !'

'ওরে তোরা যদি ফাঁকি দেওয়া আর ঘুষ নেওয়া বন্ধ করতিস তাহলে কেউই কিছু লুট করতে পারত না।'

গোরাও সিগারেটের প্যাকেট খুলল। একটা ধরাল। ওদের কথাবার্তা শুনে ছোটভাই, অমিত, মান্না, শক্তি গণেশের দোকানের সামনে এসে হাজির। দুজনের মধ্যে যে কোন আলোচনাই হোক, এখানে দশজন জুটে যাবেই। অনেক কিছুরই এখানে অভাব, অভাব নেই শুধু আলোচনার আর তর্ক-ঝগড়া করার মানুষের। আজ বিকেলে কি কাণ্ডটাই হলো ! শুরু হলো মোহনবাগান নিয়ে, শেষ হলো ইণ্ডিয়ান এয়ারলাইন্সের স্ট্রাইক নিয়ে।

'কিরে ছনে, খুঁড়িয়ে হাঁটছিস কেন ? স্পোর্টিং ইউনিয়নের কাছে ঠ্যাঙানি খেয়ে না তো ?'

ছনেরা তিন পুরুষ ধরে মোহনবাগানের সাপোর্টার। ছনের বাবার মেজ-মামা ১৯১১-র শীল্ড চ্যাম্পিয়ন টিমের গোলকীপার ছিলেন। ছনেদের বাইরের ঘর মোহনবাগানের পুরনো দিনের ছবিতে ভর্তি। পাড়ায় ইস্টবেঙ্গলের সাপোর্টারও কম নেই। ওদের কেউ কোন কারণে ও বাড়িতে গেলেই ছবিগুলোর দিকে তাকিয়ে বলবে, 'এগুলো এবার চৌরঙ্গীর মিউজিয়ামে দিয়ে দে। হাজার হোক হিস্টোরিক্যাল ছবি। তাছাড়া আর কতকাল ধরে শুধু এই পুরনো ছবিগুলোই দেখবি ?'

ছনের বাবা, কাকা আর বড়দা মোহনবাগানের মেম্বার। ছনে ওদের কোন একটা কার্ড নিয়ে মোহনবাগানের প্রত্যেকটা খেলা দেখে। আজও গিয়েছিল। হাফ টাইমের দশ মিনিট আগে স্পোর্টিং ইউনিয়নই প্রথম গোল করে। হাফ টাইমের পর অনেকক্ষণ লড়াই করে সে গোল শোধ করে দেয় মোহনবাগান। শেষ পর্যন্ত ঐ ওয়ান-অল।

ছনেকে ছাতি হাতে নিয়ে গম্ভীর হয়ে ফিরতে দেখেই শশী টিপ্পনী কাটল। ছনে প্রথমে অগ্রাহ্য করল। সঙ্গে সঙ্গে আরেকজনের চিমটি, 'কি রে, লীগ চ্যাম্পিয়ন হবার আনন্দে কি কথা বলতে পারছিস না ?'

ছনে একবার ঘৃণার দৃষ্টিতে ওদের দিকে তাকিয়ে ইংরেজিতে বলল, 'লেট দ্য ডগস্ বার্ক। আই ডোণ্ট কেয়ার।'

বাস। দাউ দাউ করে জ্বলে উঠল আগুন। দেখতে না দেখতে রাজবল্লভ পাড়ার মোড়ে ভীড় জমে গেল। দু' দলেই সমান সমর্থক। তর্ক-ঝগড়া-চেঁচামেচি চলল ঘণ্টাখানেক ধরে। ছনে কখন কাট মেরেছে কেউ জানে না। ছনে বাড়ি গিয়ে স্নান করে পায়জামা-পাঞ্জাবি পরে ঘাড়ে বগলে পাউডার দিয়ে হাসতে হাসতে পাশে এসে দাঁড়িয়ে বলল, 'কিরে শশী, এখনও ঘেউ ঘেউ করছিস ?'

শশী হাসতে হাসতে জিজ্ঞাসা করল, 'তুই লড়িয়ে দিয়ে কেটে পড়েছিলি ?'

'তবে কি করব ?'

'চল, আমিও কেটে পড়ি।'

ছোটভাই চিৎকার করে বলল, 'হল্ট! ঐ দেখুন শশী আর ছনে হাসতে হাসতে চলে যাচ্ছে। নো মোর মোহনবাগান-ইণ্টবেঙ্গল। নেক্সট্ আইটেম।'

ছোটভাইয়ের মুখের কথা শেষ না হতে হতেই বোসদা পাশে এসে দাঁড়িয়ে বললেন, 'অফিসেও লড়াই, পাড়াতেও লড়াই! কি ব্যাপার রে ?'

বোসদা ইণ্ডিয়ান এয়ারলাইন্সে চাকরি করেন। কিছুদিন ধরে ইণ্ডিয়ান এয়ারলাইন্সের বিমান আকাশে উড়ছে না। পাইলট-ইঞ্জিনিয়ারদের সঙ্গে কর্তৃপক্ষের লড়াই চলছে। রোজ সকালবেলায় খবরের কাগজে খবর বেরুচ্ছে। বঙ্কু বিশ্বাস বললেন, 'তোমাদের অফিসের লড়াইয়ের কথা বাদ দাও। পাইলট-গুলোর এত রস বেড়ে গেছে যে, ওদের একটু ঠাণ্ডা করা দরকার।'

মানা বলল, 'পাইলটদের বদমায়েসী যদি শুনতে চাও তাহলে বোসপাড়ার শিবু চৌধুরীর বোনের কাছে যেও। তিন বছর এয়ারহোস্টেসের চাকরি করে পালিয়ে আসার পথ পায়নি।'

পাকা আমে একটু বাতাস লাগলেই টপাটপ মাটিতে পড়তে শুরু করে। গণেশের দোকানের সামনে, রাজবল্লভ পাড়ার মোড়ের আলোচনায় কেউ একজন মতামত দিলেই হলো। পাকা আমের মত টপাটপ মতামত পড়তে শুরু করবেই। প্রায় ঘণ্টা খানেক ধরে ইণ্ডিয়ান এয়ারলাইন্স নিয়ে বিতর্ক চলার পর গুণময়কে পাশ দিয়ে যেতে দেখেই সবাই ওকে ঘিরে ধরলেন। বঙ্কুদা জিজ্ঞাসা করলেন, 'কবে ফ্লাই করছ গুণময় ?'

'সামনের শুক্রবার।'
'সবকিছু রেডি ?'
'মোটামুটি। রিজার্ভ ব্যাঙ্কের পারমিটটা কাল আনব।'
নন্দদা বললেন, 'অসুবিধে হলে আমাদের সতুকে বলো।'
গুণময় জিজ্ঞাসা করল, 'কোন্ সতুবাবুর কথা বলছেন ?'
'নিবেদিতা লেনের সতু চৌধুরী। রিজার্ভ ব্যাঙ্কের বেশ বড় অফিসার।'
'আমার সঙ্গে আলাপ নেই।'
ছোটভাই বলল, 'তুই গণাকে চিনিস তো ?'
'হ্যাঁ।'
'গণার বড়দা।'
'তাই নাকি ?'
'হ্যাঁ। তুই নিশ্চয়ই চিনিস।'
'না, গণার বড়দাকে আমি চিনি না।'
বঙ্কুদা বললেন, 'চল, এক্ষুণি ওর সঙ্গে আলাপ করিয়ে দিচ্ছি।'
বঙ্কুদার সঙ্গে গুণময় চলে যেতেই সবাই ওর প্রশংসায় ব্যস্ত হয়ে উঠলেন। মোহনবাগান, ইস্টবেঙ্গল, ইণ্ডিয়ান এয়ারলাইন্সের কথা ভুলে গেলেন।

গণেশ দোকানে বসে বসে সারা দিন-রাত্তিরই কত কি আলোচনা শুনছে। বারো মাস, তিনশো পঁয়ষট্টি দিন। পৃথিবীর সব কিছু নিয়ে আলোচনা হয়। ভিয়েতনাম থেকে কলকাতা কর্পোরেশন, মার্কসবাদ-গান্ধীবাদ থেকে উত্তমকুমার-রাজেশ খান্না, বঙ্গদর্শন-সবুজপত্র থেকে নিরোধ। কোন কিছু বাদ নেই।
এসব আলোচনা শুনতে গণেশের ভালই লাগে। অনেক কিছু জানতে পারে, শিখতে পারে। দোকানে খদ্দেরের ভীড় না থাকলে ও নিজেও মাঝে মাঝে যোগদান করে। নিজের মতামত জানায়।
গণেশ খুচরো পয়সা গোরাকে ফিরিয়ে দিয়ে বলল, 'যাই বল দেবীদা, সব রকম কল্লাপসানের জন্মভূমিই হচ্ছে সরকারী অফিস। এখন অবশ্য আস্তে আস্তে সব জায়গায় ছড়িয়ে পড়েছে।'
দেবী তর্ক করে, 'ঘুষ খাওয়া শেখাল তো ব্যবসাদাররা।'
গোরা উইলস্ ফ্লেকে টান দিয়ে বলল, 'গভর্ণমেণ্ট অফিসে যারা কাজ করে তারা সব কচি খোকা, তাই না রে দেবী ?'
দেবী হাসে।
'হাসতে লজ্জা করে না ? একশো টাকার বিজনেস পেতে হলেও দশ টাকা ঘুষ দিতে হয়, তা জানিস ?'
'লাভ হয় বলেই তো দিস।'
'জানিস, এত রাত্রে কেন বাড়ি ফিরছি জানিস ?'
'কেন ?'

'পি-ডবলিউ-ডি-র এক এঞ্জিনিয়ার সাহেবের বাড়িতে আজ দুদিন ধরে ছ'জন মিস্ত্রী কাজ করছে। তাদের কাজ দেখতে গিয়েছিলাম।'

'এ্যাণ্টি-করাপসান ডিপার্টমেণ্টে রিপোর্ট করিস না কেন?'

গোরা হো-হো করে হেসে উঠল। বলল, 'তাহলে আমার আর রাইটার্স বিল্ডিংয়ে ঢুকতে হবে না।'

গণেশ বলে, 'বাবা মারা যাবার পর নানা কারণে এখানে ও বর্ধমান কোর্টে আমাকে কয়েকবার যাতায়াত করতে হয়েছিল। কোর্ট-কাছারির লোকজন যে এরকম বেহায়া নির্লজ্জ হয় তা আমার ধারণা ছিল না।'

অনেক কিছুই গণেশের ধারণা ছিল না। রাতের আকাশ যারা আলোয় ভরিয়ে দেয় তারা যে এক-একটি অগ্নিবলয় তা দূর থেকে বোঝা যায় না। দূর থেকে জানা যায় না ওরা জ্বলছে, হাহাকার করছে একটু প্রাণের স্পর্শ পাবার জন্য। বিপিনবাবু নিছক জীবিকার তাগিদে দোকান করেন। গণেশও তাই। প্রথম প্রথম সময় পেলেই গণেশ যোগ-বিয়োগ গুণ-ভাগ করত। লাভ-লোকসানের হিসাব করত। না করে উপায় ছিল না। সব সময় ভয় করত যদি রেশন তুলতে না পারে? যদি টাকা কম পড়ার জন্য সিগারেট না নিতে পারে? যদি ভোরবেলায় রুটির গাড়ি এসে দাঁড়াবার সঙ্গে সঙ্গে বিয়াল্লিশ টাকা দিতে না পারে? তাহলে, তাহলে কি হবে?

এখনও হিসাব করে। সাপ্লায়ারদের পেমেণ্ট করার কথা ভাবে। কিন্তু আগের মত ভয় পায় না। এখন জেনে গেছে দোকান বড় করার ক্ষমতা ওর না থাকলেও দোকান চালাবার ক্ষমতা ওর আছে। এ ছাড়াও জেনে গেছে সংসারের টানাটানি থাকলেও কোনমতে চালিয়ে নিতে পারবে।

'একটা কাজ করে দিবি সুনন্দা?'

'কি কাজ?'

'তুই কয়েকটা চিঠি লিখে দিবি?'

'কেন, তুই বুঝি চিঠি লিখতে পারিস না?'

'এমনি চিঠি নয় রে। কিছু কিছু মালপত্তরের জন্য কয়েকটা কোম্পানীকে চিঠি দিতে হবে।' গণেশ চা খেতে খেতে একটু থামল। বলল, 'আগস্ট-সেপ্টেম্বরে অন্তত শ' দুই টাকা এক্সট্রা আয় না করলে পুজোর খরচ চালাব কি করে?'

সুনন্দা বলল, 'পরশু দিন আমি একটা-দেড়টার মধ্যেই ইউনিভার্সিটি থেকে ফিরে আসব। তুই দুপুরবেলায় খেতে এসে বলে দিস কি লিখতে হবে।'

চা খাওয়া শেষ হলেও গণেশ চুপ করে থাকে। কি যেন ভাবে।

সুনন্দা জিজ্ঞাসা করল, 'কি এত ভাবছিস?'

একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে বলল, 'এমন কিছু না। এই সংসারের কথাই ভাবছি।'

'এমন কি হলো যে এত ভাবছিস?'

'গত বছর পুজোর সময় বোনদের দু'খানা শাড়ি দেবার পর কিছুতেই

মাকে আর দুটো শাড়ি দিতে পারলাম না। তাছাড়া খেয়াল করেছিস মা-র বিছানায় কোন চাদর নেই ? পুরোনো ছেঁড়া শাড়িগুলো দিয়েই মা চাদরের কাজ চালিয়ে নিচ্ছেন।'

সুনন্দা সবই জানে। অতি শৈশব থেকেই এবাড়ি আসা-যাওয়া করছে। এখনও যখন-তখন আসে। কোন কিছুই ওর অজানা নয়। বরং গণেশের চাইতে অনেক বেশি জানে। গণেশ আর কতক্ষণ বাড়িতে থাকে। দুপুর বেলায় খেতে এসে ঘণ্টা খানেক—ঘণ্টা দেড়েক ; কদাচিৎ কখনও দু'ঘণ্টাও হয়ে যায়, কিন্তু তার বেশি কখনই নয়। তারপর সেই রাত বারোটা-সাড়ে বারোটায় এসেই চান করে খেতে বসে। জরুরী দু'চারটে কথাবার্তা হয় তারপর সোজা বিছানায় লুটিয়ে পড়ে। গণেশ এত ক্লান্ত, ক্ষুধার্ত হয়ে বাড়ি আসে যে, খুব জরুরী না হলে মা কোন কথাই ওকে বলেন না।

সুনন্দা একটু চুপ করে থাকার পর বলল, 'অত ভাবিস না। সব সংসারেরই তো এক অবস্থা।'

'তা ঠিক।' গণেশ সুনন্দার দিকে তাকিয়ে বলল, 'একটা কথা বলছি। কাউকে বলিস না।'

'তোর কোন কথাই তো আমি কাউকে বলি না।'

'প্রায়ই দুপুরের দিকে নাদুর মা এসে আমার কাছ থেকে আট আনা-এক টাকা নেন। দু'একবার দু'এক টাকা ফেরত দিয়েছেন। কিন্তু আমি কখনও চাই না।···'

'কিন্তু ওদের সংসারের তো এমন অভাব হওয়া উচিত নয়!'

গণেশ হেসে বলল, 'বাইরে থেকে দেখে কি মানুষের ভিতরের খবর জানা যায় ? গত সপ্তাহে রেশনের টাকা চাইতে এসে নাদুর মা কেঁদে ফেললেন···'

'কেন ?'

'ওঁর কথা শুনে মনে হলো নাদুর বাবার কিছু ব্যাপার আছে।'

সুনন্দা যেন আকাশ থেকে পড়ল, 'বলিস কি !'

একটু আত্মপ্রসাদের হাসি হেসে গণেশ বলে, 'তেল-সাবান-সিগারেট বিক্রি করলে কি হয়, কম মানুষের ভিতরকার খবর জানতে পারলাম না। যাদের অতি সাধারণ ভেবেছি, তাদের অনেকেই সাধারণ নয়···'

'যেমন ?'

'শিবনাথ সান্যালকে চিনিস ?'

'নিবেদিতা লেনে থাকেন তো ?'

'ঠিক ধরেছিস। উনি কেমন লোক ?'

'কেমন আবার ? একজন সাধারণ ভদ্দরলোক।'

'ট্রাম কোম্পানীর একজন সাধারণ কেরানী, কি বল্ ?'

গণেশ প্রশ্ন করেই সুনন্দার দিকে তাকিয়ে বলল, 'ভদ্রলোক লুকিয়ে লুকিয়ে এম. এ. পাশ করে এখন ডক্টরেটের জন্য রিসার্চ করছেন।'

'সত্যি ?'

'যখন খবরের কাগজে ছবি বেরুবে, তখনই বুঝতে পারবি আমি···'

'কিন্তু তুই কি করে জানলি?'

'রেশন ব্যাগে ভর্তি বই-খাতা তো আমার দোকানেই উনি রাখেন।' গণেশ একটু থেমে হাসতে হাসতে বলল, 'কেউ পড়ার বই রেখে যান, কেউ আবার রেসের বই রেখে যান। কেউ কেউ প্রেমপত্রও রেখে যায় আমার দোকানে।'

সুনন্দাও হাসে! বলে, 'তাহলে ভালই আছিস, কি বল্?'

'ভাল কি ওদের জন্য আছি? ভাল আছি তোর জন্য।'

'তাহলে স্বীকার করিস?'

'একশো বার স্বীকার করি। তুই পাশে না থাকলে আমি এত দিন দোকানদারী করতাম নাকি? কবে ছেড়ে-ছুড়ে পালিয়ে যেতাম।'

'তা আমি জানি।'

দুঃখ-দারিদ্র্যের অন্ধকার অরণ্যে যাঁরা বিচরণ করেন তাঁরাও একটা ক্ষীণ আলোর রেখা দেখতে পান। সেই সামান্য আলোতেই তাঁরা আস্তে আস্তে এগিয়ে চলেন। ঐ ক্ষীণ আলো যেদিন নিভে যাবে সেদিন তাঁর চলার পথের শেষ।

'আশুকাকাকে চিনিস?'

সুনন্দা জিজ্ঞাসা করল, 'কোন্ আশুকাকা?'

'নবীন ময়রার দোকানের ঠিক উল্টোদিকের গলিতে থাকেন।···'

'যে বাড়িতে জন্মাষ্টমী হয় তো?'

'হ্যাঁ। বিহারের ভূমিকম্পে আশুকাকার মা-বাবা মারা যান। অনেকটা আমার মত অবস্থায় পড়ে ওকে চায়ের দোকান খুলতে হয়, কিন্তু তোরই মত একজন ওর জীবনে এসে অনেক কিছু পাল্টে দেয়।···'

'তারপর?'

'তারপর আর কি? মিউজিয়ামে কাজ করতে করতে ওখানকারই একজন রিসার্চ অফিসারের সঙ্গে প্রেম করে উনি বিয়ে করেন, আর সেইজন্যই আশু-কাকা একদিন সবকিছু ছেড়ে-ছুড়ে সন্ন্যাসী হয়ে গেলেন।'

সুনন্দা গণেশের কানের কাছে মুখ নিয়ে বলল, 'ভয় নেই। আমি তোকে সন্ন্যাসী হতে দেব না।'

'অত জোর করে বলিস না সুনন্দা। মেয়েদের জীবনে কখন কি ঘটে যায় কিচ্ছু বলা যায় না।'

'সে তো পুরুষদের জীবনেও ঘটতে পারে। মেয়েদের দোষ দিচ্ছিস কেন?'

'ইতিহাস বলে মেয়েরাই বেশি বিশ্বাসঘাতকতা করে।'

সুনন্দার মুখের চেহারাটা পাল্টে গেল। ভ্রূ কুঁচকে বলল, 'তুই কি আমাকে সন্দেহ করছিস?'

'ছি ছি! তোকে সন্দেহ করব কেন?'

'তুই যদি চাস তাহলে আমি কালীঘাটের মন্দিরে গিয়ে মায়ের পা ছুঁয়ে প্রতিজ্ঞা করতে পারি···'

'দূর পাগল।...'

সুনন্দার গলার স্বর ভারী হয়ে গেছে। বলল, 'তাহলে এসব আজেবাজে কথা আমাকে বলবি না।'

'আচ্ছা আচ্ছা, আর বলব না। তুই কাঁদিস না।'

আঁচল দিয়ে চোখ মুছে সুনন্দা বলল, 'পাড়া-বেপাড়ার কম ছেলে আমার দিকে নজর দেয়নি, কিন্তু কেউ বলতে পারবে না আমি এক পা এগিয়েছি।'

'তা আমি জানি।'

'তবে এসব আশু-বিশুকাকার গল্প আমাকে শোনাবার কি দরকার ছিল?'

রাজবল্লভ পাড়ার সর্বাঙ্গে দৈন্যের ছাপ। গিরিশ এভিনিউ থেকে রাজবল্লভ পাড়ায় ঢুকলেই সে দৈন্য চোখে পড়ে। একটা বাড়িও চকচকে নয়। বাড়িগুলো যে কবে তৈরি হয়েছিল তা কেউ জানে না।

বাড়িগুলো তৈরি হবার পর আর কোনদিন রাজমিস্ত্রীরা এসব বাড়ি স্পর্শ করেছে বলে মনে হয় না। শুধু দত্তদের বাড়ি ছেলেমেয়েদের বিয়ের আগে চুনকাম হয়। আর কোন বাড়িতে তাও হয় না। অনিল সরকারের মত কয়েকজন ভাগ্যবানের দল দু'এক বছর অন্তর নিজেদের পয়সায় ঘরের ভিতরগুলো চুনকাম করে নিলেও বাইরের চেহারা বদলায় না। বাড়িগুলোর মত মানুষগুলোর চেহারার মধ্যেও বিচিত্র মিল। রোদ-জল-ঝড়ে প্রায় সবার রঙই তামাটে। গালগুলো তুবড়ে গেছে। চোখগুলো গুহার মধ্যে থেকে উঁকি দিচ্ছে। চেহারার কথা কেউ তুললেই ছোটভাই বলে, 'পঁচিশ বছর ধরে প্রফুল্লদের ক্যান্টিনে ক্যানাডিয়ান গম আর কুমড়োর ছক্কা খেয়ে আর কি চেহারা হবে বাপু?'

মিল পোশাকেও। পাড়ার মধ্যে বয়স্করা লুঙ্গি-গেঞ্জি আর ছোকরার দল পায়জামা হ্যান্ডলুমের রেডিমেড পাঞ্জাবি। অফিসে যাবার জন্য প্যান্ট-বুশসার্ট। সিধুদার মত দু'চারজন মোটা লোক শুধু প্যান্টের সঙ্গে সার্ট পরেন। অনেকে ধুতি-পাঞ্জাবি। কোট-প্যান্ট পরলেও গলায় টাই থাকে না, পায়ে থাকে পাম্পসু। অর্থাৎ পোশাক দেখলেই বোঝা যায় হিন্দু-মুসলমান-ইংরেজ এককালে এদেশের মসনদ অলংকৃত করেছে। ইংরেজি শিক্ষিত লোকের অভাব এ পাড়ায় না থাকলেও আধুনিক-মনের মানুষ খুব কম। আধুনিক ছেলেরাও খুড়ো-জ্যাঠার সামনে চার্মিনার টানে না।

একটু যাঁরা বয়স্ক, যাঁদের পকেটে কিছু মালকড়ি থাকে তাঁরা সুযোগ পেলে বে-পাড়ায় হুইস্কী খেলেও এ পাড়ায় পান-জর্দার উপরে কখনই উঠবেন না। আরও আরও অনেক দ্বন্দ্ব। দ্বন্দ্ব নেই শুধু অর্থ আর প্রতিপত্তির। পাড়ার মধ্যে সবাই সমান। শিক্ষিত-অশিক্ষিত, ধনী-মধ্যবিত্ত-দরিদ্র। এ পাড়ার ধর্মই এই। বাড়ির দরজায় নেমপ্লেট লটকিয়ে এখানে কেউ আত্মমর্যাদা প্রচার করেন না। তেল-সাবান-সিগারেট বিক্রি করলেও সুনন্দার কাছে গণেশের মর্যাদায় ঘাটতি হয়নি।

ইউনিভার্সিটি স্টুডেণ্টস ইউনিয়নের ইলেকশনের আগে অসীম সরকার নিজে এসেই সুনন্দার সঙ্গে আলাপ করল, 'নমস্কার! আমার নাম অসীম সরকার।'

সুনন্দাও সঙ্গে সঙ্গে নমস্কার করে বলল, 'আমার নাম...'

'বলতে হবে না। আমি জানি। আপনি যখন ফ্রী থাকবেন তখন আপনার সঙ্গে একটু কথা বলতে চাই।'

'কি ব্যাপারে?'

'নাথিং পার্সোনাল। ইলেকশনের...'

'কিন্তু আমি তো ইলেকশনের ব্যাপারে বিশেষ ইণ্টারেস্টেড নই।'

অসীম হেসে বলল, 'একটু যদি আলোচনা করি তাতে কি আপনার আপত্তি আছে?'

'আপনি যদি কিছু বলতে চান শুনতে পারি, কিন্তু আমার কিছু বক্তব্য নেই।'

ইলেকশনের সুড়ঙ্গপথে অসীম যখন আস্তে আস্তে এগুতে শুরু করল, তখন সুনন্দা একদিন গণেশকে বলল, 'তোর একটা ভাল ছবি চাই।'

গণেশ অবাক হয়ে জানতে চাইল, 'আমার ছবি দিয়ে কি করবি?'

'দরকার আছে।'

'হঠাৎ আমার ছবির কি দরকার হলো?'

'ইউনিভার্সিটির দুটো-একটা ছেলে এত বিরক্ত করা শুরু করেছে যে, ঠিক করেছি পার্সে তোর একটা ছবি রাখব।'

গণেশ হাসে।

সুনন্দাও হাসে। বলে, 'হাসির কথা নয়। সত্যি তোর একটা ছবি চাই।'

'তারপর?'

'তারপর আবার কি? যখন-তখন এমনভাবে পার্স খুলব যে, তোর ছবিটা ওরা দেখতে পায়।'

'তারপর?'

'তারপর আবার কি হবে?'

'ওদের উচ্ছ্বাসে ভাঁটা পড়তে বাধ্য।'

'যদি আর কেউ ঐ ছবি দেখতে পায়?'

'আমার পার্স আবার কে দেখবে?'

'আমাদের বা তোদের বাড়ির যদি কেউ...'

'কেউ আমার জিনিসপত্তরে হাত দেয় না। আর নেহাত যদি কেউ দেখে তো দেখুক।'

'দেখুক বললেই হলো? সবাই কি ভাববেন বল্ তো?'

সুনন্দা হাসতে হাসতে বলল, 'তুই কি ভাবছিস কেউ কিছু বোঝেন না? সবাই সব কিছু বুঝতে পারেন।'

কথাটা শুনেই গণেশ লজ্জা পায়। জিজ্ঞাসা করে, 'তুই কি করে জানলি ?'

'যখন-তখন বেণু-রেণুর বিয়ের কথা হয়, কিন্তু কখনও আমার বিয়ের কথা কাউকে বলতে শুনেছিস ? মা-বাবা জানেন আমাকে নিয়ে ওদের চিন্তা করতে হবে না।'

কার্তিকদার স্ত্রী ছোট্ট মেয়ের হাত ধরে দোকানের সামনে দিয়ে যাচ্ছিলেন।

গণেশ ডাকল, 'বৌদি, আমার বড় কাস্টমারকে নিয়ে কোথায় চললেন ?'

'একটু লিলিদের বাড়ি যাচ্ছি।'

গণেশ শুনেও শুনল না। ইশারা করে কার্তিকদার ছোট্ট মেয়েকে ডেকে দুটো টফি ওর হাতে দিয়ে বলল, 'একটা তোর, একটা ভাইয়ের।'

কার্তিকদার ছোট্ট মেয়ে জানল না আনন্দ যখন আসে তখন তা সূর্যের আলোর মত চারিদিকে ছড়িয়ে পড়বেই।

॥ পাঁচ ॥

দেশে কত কি ঘটে গেল। তর্ক-ঝগড়া, মারামারি-কাটাকাটি, খুনোখুনি, বিক্ষোভ-হরতাল-বন্ধ, গুলি-গোলা-যুদ্ধ। গণেশ কিছু দেখল, কিছু শুনল, কিছু অনুভব করল। এখনও প্রতি দিন, প্রতি মুহূর্তে অনেক কিছু অনুভব করে। সারা দিন-রাত্তির দোকানদারী করতে করতে যাদের সব সময় সামনে দিয়ে ঘোরাফেরা করতে দেখত, তাদের অনেককেই আর দেখে না। দেখবে না। মানুষ গিজগিজ করছে রাজবল্লভ পাড়ায়। যাঁরা দূর থেকে দেখেন, যাঁরা অপরিচিত তাঁরা জানেন না, বোঝেন না এ পাড়ার মানুষের কাছে এদের প্রত্যেকের প্রয়োজনীয়তা আছে।

'এই ছ্যাদা, শোন!'

দোকানে বসেই গণেশ শুনল বিজয়দার মা ছ্যাদাকে ডাকছেন। ছ্যাদা সঙ্গে সঙ্গে হাতের জ্বলন্ত পানামাটা ফেলে দিয়ে এগিয়ে গেল, 'মাসিমা ডাকছেন?'

'একটা কাজ করে দিবি বাবা?'

'কি কাজ?'

'বোস ফার্মেসী থেকে সুধীর ডাক্তারকে একটু ডেকে আনবি বাবা? তোর মেসোমশায়ের শরীরটা বড়ই খারাপ হয়েছে।'

'এক্ষুণি যাচ্ছি।'

'একটা রিক্সা করে নিয়ে আসিস। বেশি দেরী করিস না বাবা। কাল রাত্তির থেকে উনি খুবই কষ্ট পাচ্ছেন।'

'না, না, দেরী করব না।'

সুধীর ডাক্তারকে এনে দিয়েই ছ্যাদা গণেশের দোকানে এসে একটা পানামা ধরাল। ঐ পানামা টানতে-টানতেই মোড়ের মাথায় বন্ধুদের কাছে গেল। একটু পরেই মাসিমা আবার ডাকলেন, 'ছ্যাদা, একটু এদিকে আয়!'

ছ্যাদা এগিয়ে যেতেই প্রেস্‌ক্রিপসন আর একটা ময়লা পাঁচ টাকার নোট দিয়ে বললেন, 'ওষুধটা এনে দিবি?'

'দিচ্ছি।'

ছ্যাদা টাকা আর প্রেস্‌ক্রিপসন পাঞ্জাবির পকেটে পুরেই সতুকে ডাকল, 'এই সতু, শোন!'

সতু এলো।

'আমি সুধীর ডাক্তারের ল্যাবরেটরীতে যাচ্ছি। তুই মা-র কাছ থেকে র‍্যাশন কার্ড আর টাকা নিয়ে দোকানে লেখাপড়ার কাজ শুরু করে দে, আমি আসছি!'

গণেশ দোকানে বসে বসে শুধু দেখে, শোনে।

'এই ছ্যাদা, এই সতু, শোন!'

ছ্যাদা, সতু এগিয়ে যায়।

'হাত পাত!'

'মাসিমা, কি ব্যাপার?'

'কিচ্ছু ব্যাপার না, বলছি হাত পাত।'

ছ্যাদা, সতু হাত পাততেই মাসিমা ওদের হাতে দুটো-দুটো কাঁচাগোল্লার সন্দেশ দিয়ে বললেন, 'আমার ছোটভাই বনগাঁ থেকে এনেছে।'

ফিরিঙ্গিপাড়ার সাহেবদের কাছে ছ্যাদা, সতু ছোটলোক। ভ্যাগাবণ্ড। আনকালচার্ড। এরা রাজনৈতিক নেতাদের দুশ্চিন্তার কারণ, লালবাজারের গোয়েন্দাদের শিকার। এদের নিয়ে প্ল্যানিং কমিশনের ঠাণ্ডা ঘরে গবেষণা হয়, ক্যালকাটা ইনফরমেশন সেণ্টারে সেমিনার হয়, মহামহোপাধ্যায় সর্বশাস্ত্রবিশারদ সাংবাদিকরা এদের নিয়ে খবরের কাগজের পাতা ভরিয়ে তোলেন। প্রকাশ্যে না বললেও অনেকেই মনে করেন এরা সমাজের ক্যান্সার, টিউমার। এরা জঞ্জাল, এরা ঘৃণ্য।

আজ ছ্যাদাও নেই, সতুও নেই। এরা সব সময় গণেশের দোকানের আশেপাশে ঘোরাঘুরি করত। রাজবল্লভ পাড়ায় এখনও মানুষ গিজগিজ করছে, কিন্তু তবুও গণেশ কেমন শূন্যতার স্বাদ পায়। ছ্যাদা-সতুর অভাবে সামান্য আপদে-বিপদেই মাসিমা কেমন ভয় পান।

দিনগুলো সত্যি বদলে গেল। প্রতিদিন বদলে যাচ্ছে। সিগারেটের দাম হু-হু করে বাড়ছে। প্রত্যেক খদ্দেরকে বোঝাতে হয়, কোম্পানীর ঘরে মালের অভাব নেই, কিন্তু কিছুতেই ঠিক দামে সাপ্লাই দেবে না।

'সে কি রে?'

'হ্যাঁ সিধুদা। হোলসেলে মাল কিনলেও রিটেলের দাম দিতে হচ্ছে।'

'রসিদ দিচ্ছে?'

'হোলসেল রেটের রসিদ দিচ্ছে।'

'তুই তাহলে বেশি দিবি না।'

'তাহলে মালও পাব না।'

সিধুদা চলে যান। অনুরোধের আসরের মতো ঐ একই পুরনো রেকর্ড দিনের পর দিন প্রতি খদ্দেরকে একই কথা শোনাতে হয়। পাড়ার সবাই জানেন গণেশ বেশি দাম নেবে না, নিতে পারে না।

তবু কখনও কখনও কেউ কেউ তর্ক করবেনই, 'কি ব্যাপার রে গণেশ? কাটাপোনা-গঙ্গার ইলিশের মতো যা ইচ্ছে দামে সিগারেট বেচতে শুরু করেছিস নাকি?'

গণেশ রাগে না। দোকানদারদের রাগতে নেই। রাগ করার অধিকার নেই। কাউণ্টারের ওপাশের সবাই ভদ্দরলোক, আর এ-পাশের সবাই চোর, ছোটলোক। বলল, 'কোম্পানী যেমন দামে দেবে সেই রকমই আমরা বিক্রি করব।'

'তুই ছোঁড়া আগে বেশ ভাল ছিলি। আস্তে আস্তে বেশ ওস্তাদ হয়ে উঠেছিস।'

হাতের পাঁচটা আঙ্গুলের মতো সব মানুষ সমান হতে পারে না। কেউ কেউ আরো এগিয়ে যান। ভুলে যান দোকানদাররাও তাদেরই মত সাধারণ মধ্যবিত্ত ভদ্রঘরের ছেলে। সিগারেট পকেটে পুরতে পুরতে কোন কোন খদ্দের বলেন, 'এদের ঠ্যাঙানি না দিলে ঠিক হবে না।'

রাগে, দুঃখে, অপমানে গণেশ চিড়িয়াখানার বন্দী বাঘের মত অসহায় দৃষ্টিতে শুধু একবার খদ্দেরকে দেখে, কিন্তু একটি শব্দ উচ্চারণ করে না। আগে এসব কথা শুনতে হতো না গণেশকে। যাঁরা রাগ করেন না তাঁরাও চুপ করে সিগারেট কিনে চলে যান। কিছু মন্তব্য প্রায় সবাই করেন। মন্তব্য করার কারণ আছে, যুক্তি আছে। সিগারেট কোম্পানীগুলো মেছোবাজারের ছ্যাঁচড়া দোকানদারদের মত হয়ে গেছে। ট্যাক্স বাড়াবার ছ'মাস আগে থেকেই দাম বেশি নিচ্ছে, কিন্তু রসিদ দেবে না। গণেশ অনিল সরকারকে জিজ্ঞাসা করে, 'সিগারেট কোম্পানীগুলো এরকম করছে কেন বলুন তো? এভাবে দোকানদারী করা তো দায় হয়ে উঠেছে।'

অনিল সরকার একটু হেসে বললেন, 'আসল কথা হচ্ছে অন্যান্য ব্যবসাদারদের মতো এরাও ব্ল্যাক-মানি করতে শুরু করেছে। কিছু নিজেরা মারছে, কিছু পলিটিক্যাল পার্টিতে দিচ্ছে।'

গণেশ রাজনীতি করে না, অর্থনীতি বোঝে না, কিন্তু বইপত্তর খবরের কাগজ পড়ে। বহুজনের আলাপ-আলোচনা শোনে। সিগারেট ব্যবসায়ে যে গুরুতর কিছু ঘটছে, তা-ও বেশ বুঝতে পারে। তা না হলে এই দু'তিন বছরের মধ্যে এত কালের পুরনো নিয়মকানুনগুলো উল্টে-পাল্টে গেল কেন? গণেশ খুব আগ্রহের সঙ্গে জিজ্ঞাসা করল, 'আচ্ছা দাদা, কিভাবে এসব হয় বলুন তো?'

অনিল সরকার নিজেও একটা সিমেণ্ট কোম্পানীর এ্যাসিস্ট্যাণ্ট সেলস্ ম্যানেজার। ব্যবসা-বাণিজ্যের দুনিয়ার অনেক খবর রাখেন। উনি আবার একটু হেসে বললেন, 'সব ব্যবসারই একটা নিজস্ব চেন আছে। সোল ডিস্ট্রিবিউটার থেকে শুরু করে তোমাদের মত ছোট ছোট স্টকিস্ট পর্যন্ত। অন্যান্য ব্যবসাদারদের মত সিগারেটওয়ালারাও জানে রোজ মিনিমাম এত সিগারেট বিক্রি হবেই।'

'এত হিসেব ওরা রাখে?'

'অফকোর্স! সারা দেশের কথা তো বাদই দাও, ওরা আমাদের বাগবাজার-শ্যামবাজারে কত সিগারেট চাই, তাও জানে।'

'আচ্ছা, তারপর?'

'ধর কোম্পানী যে মালটা এক কোটি টাকায় বিক্রি করে সেটা বাজারে বিক্রি হয় সওয়া এক কোটি টাকায়। পঁচিশ লাখ টাকা হচ্ছে সোল ডিস্ট্রিবিউটার থেকে শুরু করে তোমাদের মত ছোটখাট দোকানদারদের

কমিশন। এখন ধর কোম্পানীই যদি এক কোটি টাকার মাল এক কোটি দশ পনেরো লাখ টাকায় সোল ডিস্ট্রিবিউটারকে দেয় তাহলে বাজার থেকে প্রায় দেড় কোটি টাকা উঠে আসবে···'

'বলেন কি ?'

'কোম্পানী থেকে শুরু করে ছোটখাট স্টকিস্টরা পর্যন্ত বেশী প্রফিট পায় বলে ওরা সবাই খুশি।'

গণেশের মনে অনেক প্রশ্ন আসে। জিজ্ঞাসা করে, 'আমরা না হয় নেহাতই ছোট দোকানদার, কিন্তু সোল ডিস্ট্রিবিউটার যে বেশী পেমেণ্ট করল তার রসিদ পাবে ?'

'না।'

'তাহলে সে পেমেণ্ট করবে কেন ?'

'কারণ সে জানে দশ লাখ টাকা বেশি পেমেণ্ট করে সে বিশ লাখ টাকা উঠিয়ে নেবে। তাছাড়া এই দশ লাখ টাকা ওর উপরি পাওনা। বিশ-পঞ্চাশ হাজার বা লাখ টাকা খরচ হলেও তো তার দুঃখ নেই।'

গণেশ শুনে তাজ্জব বনে যায়।

অনিল সরকারই আবার কথা বললেন, 'হিসেবের বাইরের এই কোটি কোটি টাকা নিয়েই তো ব্যবসাদাররা স্ফূর্তি করে, ঘুষ দেয়, পলিটিক্যাল পার্টি-গুলোতে চাঁদা দেয়।'

'সব ব্যবসাতেই কি এই অবস্থা ?'

'যে সব জিনিসের চাহিদা আছে, সে-সব ব্যবসাতেই এই অবস্থা।'

'এ দেশের কি হবে বলুন তো দাদা ?'

অনিল সরকার হাসতে হাসতে পাল্টা প্রশ্ন করল, 'এ দেশের কথা কেউ ভাবে নাকি গণেশ ?'

অনিল সরকার উইলস্ ফিলটার কিংয়ের প্যাকেট নিয়ে চলে যাবার পরও গণেশ চুপ করে ভাবে। না ভেবে পারে না। সিগারেটের কথা ভাবতে ভাবতে আরো কত কথা মনে পড়ে।

বীণার বিয়েটা যেমন চট করে হয়ে গেল, বেণুর তা হচ্ছে না। এর পরেও রেণু আছে। বোন দুটোর বিয়ে না দেওয়া পর্যন্ত শান্তি নেই। অত বড় বোনকে বাড়িতে চুপচাপ বসিয়ে রাখার কোন মানে হয় না। তাই মণীন্দ্র কলেজে ভর্তি করে দিয়ে ভেবেছিল ছ'মাস-একবছরের মধ্যেই বিয়ে দিয়ে দেবে। কিন্তু তা হলো না।

সামনের বার রেণুও হায়ার সেকেণ্ডারী দেবে। পাশ করলে ওকেও কলেজে ভর্তি করতে হবে, কিন্তু এই সামান্য দোকানের উপর নির্ভর করে দুটি বোনকে কলেজে পড়ানো সহজ নয়। মাঝে মাঝে গণেশ ভাবে ওরা পড়াশুনা করুক, চাকরি করুক। বিয়ের জন্য এত ব্যস্ত হবার কি আছে ? কিন্তু মার একটুও মত নেই।

আগে এত ভাবত না। ভাবার অবকাশ ছিল না। ইউনিভার্সিটি

যাতায়াতের পথে দু'পাঁচ মিনিটের জন্য সুনন্দা দোকানে দাঁড়াবেই। এ ছাড়া দুপুরে খেতে গেলে অথবা রাত্রে বাড়ি ফিরলে দেখা হতোই। এখন হয় না। এম. এ. পাশ করার পর পরই পুরুলিয়া নিস্তারিণী কলেজে চাকরি পেয়ে চলে গেছে। প্রথম প্রথম গণেশের খুব খারাপ লাগত। কিছুতেই দোকানে মন বসাতে পারত না।

সত্যদা কলকাতা এলে গণেশ বলল, 'সত্যদা, আর দোকানদারী করতে ভাল লাগছে না। আপনাদের ওখানে আমাকে একটা চাকরি দিন।'

সত্যদা সিগারেট-দেশলাই পকেটে রেখে বললেন, 'যখনই কলকাতা আসি তখনই তো তুই একথা বলিস, কিন্তু বেশ তো চালিয়ে যাচ্ছিস।'

'না না সত্যদা, সত্যি আর পারছি না। সেই ভোর পাঁচটা থেকে রাত বারোটা পর্যন্ত দোকানদারী করতে কারুর ভাল লাগে?'

'তা তো বটেই।'

'তাছাড়া সিগারেট কোম্পানীগুলো থার্ডক্লাশ বেনিয়া ফার্মের মত এমন ছ্যাঁচড়ামি শুরু করেছে যে, সহ্য করা যায় না।'

সত্যদা হাসতে হাসতে বললেন, 'বালীগঞ্জ-পার্কসার্কাসের সাহেবদের দিয়ে আর কত ভাল কোম্পানী চলবে? সন্ধ্যার পর দু'গেলাস মদ গিললেই যদি মডার্ণ হওয়া যেত তাহলে আর দুঃখ কি ছিল?'

'ঠিক বলেছেন।'

সত্যদা বাড়ির দিকে এগুতেই গণেশ জিজ্ঞাসা করল, 'ক'দিন আছেন?'

'পরশু রাত্রে রওনা হবো।'

'আবার কবে আসছেন?'

'কবে মানে? প্রত্যেক মাসেই তো আসছি।'

'যাই হোক, এবার আমার একটা কিছু করুন।'

'দোকান চালাতে চালাতে চাকরি হয় না। যদি সত্যি চাকরি করতে চাস তাহলে সোজা আমার কাছে চলে আসবি। তারপর আমার দায়িত্ব।'

যুদ্ধ শেষ হবার পর বিপিনবাবু যখন বেকার হয়ে পড়লেন তখন প্রায় বছর খানেক উনি সত্যদার প্রাইভেট টিউটর ছিলেন। বিপিনবাবু পরবর্তী-কালে বিড়ি-সিগারেটের দোকান করলেও পুরনো দিনের এই ছাত্রের কাছে ষোলআনা সম্মান পেয়েছেন। এখনও বিজয়ার দিন উনি গণেশের মাকে প্রণাম করতে যান। গণেশকে ছোটভাইয়ের মতই ভালবাসেন। বিলেত থেকে এম. আর. সি. পি. পাস করে এসে হিন্দুস্থান স্টিলের হাসপাতালে অত ভাল চাকরি পাওয়া সত্ত্বেও উনি পাড়ার সবার কাছে পুরনো দিনের সত্যই আছেন।

দোকানদারী ছেড়ে চাকরি করার কথা গণেশ আজকাল প্রায়ই মাকে বলে, 'সেই ভোরবেলা থেকে এই মাঝরাত্তির পর্যন্ত দোকানদারী করতে আর ভাল লাগছে না। তাছাড়া রোজ রোজ সিগারেটের দাম বাড়ছে বলে সারা-দিনই খদ্দেরদের সঙ্গে খিটিমিটি লেগে আছে।'

চাকরি করার ব্যাপারে বেণুর খুব উৎসাহ। সঙ্গে সঙ্গে বলল, 'হ্যাঁ, হ্যাঁ, দাদা, তুই চাকরি নে।'

মা বললেন, 'চাকরি কি দরজায় পড়ে আছে যে, হাত বাড়িয়ে…'

'তুমি জান না মা, দাদাকে কত লোক ভালবাসে। দাদা চাইলে এক সপ্তাহের মধ্যে চাকরি পেতে পারে?'

'ভালোবাসলেই কি সবাই চাকরি দিতে পারে?'

গণেশ এতক্ষণ ওদের কথা শুনছিল। এবার বলল, 'আর যে-ই মিথ্যে কথা বলুক, সত্যদা নিশ্চয়ই আজেবাজে কথা বলবেন না।'

মা জিজ্ঞাসা করলেন, 'সত্য কি বলেছে?'

'আজই সত্যদাকে নানা ঝঞ্ঝাট-ঝামেলার কথা বলছিলাম। তারপর চাকরির কথাও বললাম।' গণেশ একটু হেসে মা-র দিকে তাকাল।

'তা সত্য কি বলল, তা তো বলবি!'

'বললেন সোজা ওঁর ওখানে চলে যেতে। তারপর ওঁর দায়িত্ব!'

বেণুও হাসতে হাসতে মাকে বলল, 'শুনলে তো?' এবার গণেশের দিকে তাকিয়ে বলল, 'সত্যদাকে বলে আমাকেও একটা চাকরি জুটিয়ে দে। তারপর মাকে দেখিয়ে দেব দুই ভাইবোনে মিলে কিভাবে সংসারের চেহারা বদলে দিতে হয়!'

গণেশ বলল, 'হাসির কথা নয় রে বেণু। আমি আর তুই চাকরি করলে সত্যি আমাদের অবস্থা পাল্টে যাবে।'

বেণু গণেশকে একটু ইশারা করে মা-র দিকে তাকিয়ে বলল, 'আমি চাকরি পেলে প্রত্যেক বছর ছুটিতে হরিদ্বার-লছমনঝুলা মথুরা-বৃন্দাবন ঘুরতে যাব।'

মা একটু শুকনো হাসি হেসে বললেন, 'অত সুখ আমার সইবে না।'

গণেশের খাওয়া হয়ে গেল। রাতও অনেক হয়েছে। আর কথাবার্তা না বলে তিনজনেই শুতে গেল।

ভোর হবার পরই সেই প্রতিদিনের কার্বন কপি। পাঁউরুটি, বিস্কুট, টফি-লজেন্স, তেল-সাবান, সিগারেট-দেশলাই। সেই একই লোকজন, প্রায় একই কথাবার্তা। ঝগড়া-তর্কের বিষয়বস্তু এক।

মায়া দোকানের সামনে একটু থেমে জিজ্ঞাসা করল, 'গণেশদা, অস্কার ওয়াইল্ডের বইটা পড়া হয়েছে?'

'না রে, এখনও শেষ করতে পারিনি।'

'কি ব্যাপার বল তো গণেশদা? আগে তুমি এক এক দিনে এক একটা বই শেষ করতে আর এখন এক সপ্তাহেও একটা বই শেষ হয় না।'

গণেশ একটা ছোট্ট দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে বলল, 'এ জীবন আর ভাল লাগছে নারে।'

'তুমি যে কিভাবে ভোর সাড়ে চারটে-পাঁচটা থেকে রাত এগারটা-বারোটা পর্যন্ত দোকানদারী কর, আমি তো ভেবেই পাই না।'

'কি করব বল ? সংসার তো চালাতে হবে।'

মায়া একবার গণেশের দিকে তাকিয়েই দৃষ্টিটা নিজের মধ্যে গুটিয়ে নিল। মাথা নিচু করে একটু ভাবল। তারপর বলল, 'আচ্ছা চলি গণেশদা, বিকেলে দেখা হবে।'

'আচ্ছা।'

সঙ্গে সঙ্গে নন্দ মুচকি হেসে দোকানের সামনে এসেই বলল, 'চল, মায়াকে নিয়ে একদিন সিনেমায় যাই।'

'তুই যা। আমাকে আবার এর মধ্যে টানছিস কেন ?' বেশ গম্ভীর হয়েই গণেশ জবাব দিল।

'আমি বললে তো যাবে না। তাই তো তোর হেল্প চাইছি।'

'আমার মত একজন সামান্য সিগারেটওয়ালার হেল্প নেওয়া কি ঠিক হবে ?'

'অমন একটা পাকা কাশ্মিরী আপেল পাবার জন্য এনিবডিজ হেল্প ইজ ওয়েলকাম।'

'দেন ট্রাই এনিবডি, নট মী।' গণেশ আর কথা না বলে এক প্যাকেট পানামা এগিয়ে দিয়েই খাতা খুলল।

নন্দ সিগারেটের প্যাকেটটা পকেটে রাখতে রাখতে বলল, 'আজ খাতা দেখিস না। এখন মালকড়ি নেই।'

'কত হলো জানিস ?'

'হ্যাঁ।'

'বত্রিশ টাকা চল্লিশ পয়সা।'

'ঠিক আছে। ঠিক আছে। পেয়ে যাবি।'

'কিন্তু আমার অবস্থা যে সঙ্গীন। তাছাড়া হয়তো দোকান বেশি দিন চালাব না।'

'কেন রে ?'

'সেসব কথা তোর শুনে কাজ নেই। তুই আমার টাকাটা মিটিয়ে দে। ভীষণ দরকার।'

বেসুরো কথা শুনতে নন্দর ভাল লাগে না। গিরীশ এভিনিউয়ের দিকে পা বাড়িয়ে বলল, 'এরই মধ্যে পেয়ে যাবি।'

সকাল বেলায় গণেশের দোকানের সামনে দিয়ে সব রকম মানুষের শোভাযাত্রা যায়। স্কুল-কলেজ অফিস-আদালত যাবার ব্যস্ততা। দোকানেও খদ্দেরের ভীড়।

কেউ পাঁচ পয়সার খদ্দের, কেউ পাঁচ টাকার খদ্দের। প্রতিদিনের মত সেদিনের ভীড়ও আস্তে আস্তে পাতলা হয়ে এলো। গণেশ পাশের দোকানে এককাপ চায়ের অর্ডার দিয়ে খবরের কাগজখানা খুলে বসল।

'গণেশবাবু চিঠি', একটা ইনল্যান্ড লেটার দোকানের মধ্যে ফেলে দিয়েই বাগবাজার পোস্টাফিসের পিয়ন হরিদাস সরকার চলে গেলেন।

গণেশের দোকানে চিঠি আসে, তবে খুব কম। হিন্দুস্থান লিভার, ক্যালকাটা কেমিক্যাল, টাটা কেমিক্যাল বা সিগারেট কোম্পানীগুলো থেকে মাঝে মাঝে ছাপানো কার্ড বা চিঠি আসে। এ ছাড়া প্রত্যেক মাসেই ছোট মামা আর বীণার চিঠি আসে। কালে কস্মিনে বর্ধমান থেকেও দুটো-একটা পোস্টকার্ড।

ইনল্যাণ্ডটা অবশ্য সুনন্দার লেখা। ঠিকানা লেখা দেখেই গণেশ বুঝেছে। একবার এদিক-ওদিক তাকিয়ে চিঠিটা খুলল ঃ 'অনেক চেষ্টা করেও গত মাসে কিছুতেই কলকাতা যেতে পারলাম না। তবে শেষ পর্যন্ত চেষ্টা করে মুন্সেফডাঙ্গায় আমি আর আমার বন্ধু সুজাতার জন্য একটা ভাল থাকার জায়গা পেয়েছি। যাই হোক সামনের শুক্রবার রাত্রে রওনা হয়ে শনিবার সকালে পৌঁছব। শনিবারের জন্য নিশ্চয়ই 'পদাতিকে'র টিকিট কেটে রাখিস। এ ছাড়া তিন-চারটে স্যাণ্ডাল সোপ চাই।'

চিঠি লেখার অভ্যাস সুনন্দার নেই, গণেশেরও নেই। যারা ভাইবোন, বাবা-মা, আত্মীয়-বন্ধুদের কাছেই থাকে, তাদের চিঠি লেখার অভ্যাস হয় না। মাসে একটার বেশি চিঠি সুনন্দা লেখে না, কিন্তু তার জন্য গণেশের কিছু মনে হয় না। সুনন্দা কলেজের লেকচারার হয়েও ঠিক আগের মতই আছে। শুধু আগের চাইতে একটু বেশি গম্ভীর হয়েছে, আর একটু বেশি দামী তাঁতের শাড়ি পরছে। কিন্তু ওর ঐ গাম্ভীর্য দেখলেই গণেশের মন বিষণ্ণ হয়। ঐ গাম্ভীর্যই বোধহয় দূরত্বের প্রথম ইঙ্গিত। এক একবার ভেবেছে জিজ্ঞাসা করবে, কিন্তু করেনি। করতে পারেনি।

পারেনি আরো অনেক কিছু জিজ্ঞাসা করতে, 'এখন তো আর রাজবল্লভ পাড়ায় থাকিস না যে, চারদিকে জানাশুনা লোক, ওখানে তো তুই স্বাধীন। খুব মজা লাগে, তাই নারে? কলেজের মেয়ে আর অন্যান্য লেকচারার-প্রফেসর ছাড়া আর কাদের সঙ্গে আলাপ হলো? আশে-পাশের বাড়ির কেউ সতৃষ্ণ নয়নে তোর দিকে তাকায় না? কেউ ভালবাসার কথা জানিয়ে চিঠি লেখে না?'

এসব কিছুই গণেশ জিজ্ঞাসা করতে পারে না। এর আগের বার শুধু জিজ্ঞাসা করেছিল, 'ছুটির দিনে কাছাকাছি কোথাও বেড়াতে যাবার জায়গা নেই?'

'সুজাতাদের বাড়ি রাঁচীতে। ওর সঙ্গে দুবার রাঁচী গিয়েছি।'

'ওখান থেকে রাঁচী কি খুব কাছে?'

'বোধহয় শ' খানেক মাইল হবে। এক্সপ্রেস বাসে ঘণ্টা তিনেক লাগে।'

'মোটে তিন ঘণ্টা?'

'হ্যাঁ, ঐ রকমই। বহু লোক সকালে গিয়ে সারাদিন কাজকর্ম করে আবার রাত্রে ফিরে আসেন।'

'রাঁচী জায়গাটা বেশ ভাল, তাই না?'

'বেশ ছিমছাম শহর।'

'সুজাতারা কি রাঁচীরই লোক?'

'ওরা তিনপুরুষ ধরে রাঁচীতে আছে।'

সুনন্দার কথামত গণেশ 'পদাতিকে'র টিকিট কাটল, তবে দুটো নয় একটা। সুনন্দা দুদিনের জন্য কলকাতায় এলেই যদি ও দোকান বন্ধ করে কোথাও যায় তাহলে অনেকে অনেক কিছু ভাবতে পারে।

দোকানে তখন তিন-চারজন খদ্দের। হঠাৎ ট্যাক্সি থামতে গণেশ দেখল, সুনন্দা ভিতরে বসে বসে হাসছে। গণেশ জিজ্ঞাসা করল, 'এত বেলায় ট্রেন এলো?'

'ট্রেন মাত্র আধঘণ্টা লেট ছিল, কিন্তু ট্যাক্সির জন্য প্রায় একঘণ্টা দাঁড়াতে হয়েছে।'

'ভাল আছিস?'

'হ্যাঁ। তুই একটু পরে একবার আসিস।'

অফিসটাইমের ভীড় কেটে যাবার পরও গণেশ দোকান ছেড়ে যেতে পারল না। একটার পর একটা খদ্দের আসে, কিছু বিক্রি হয়ই। তাছাড়া পর পর দুটো কোম্পানী থেকে মাল দিতে এলো। ইচ্ছা থাকলেও যেতে পারল না।

দুপুরের দিকে একটু তাড়াতাড়িই দোকান বন্ধ করে বাড়ি গেল। রান্নাঘরের দরজায় হেলান দিয়ে দাঁড়িয়ে গণেশের মা-র সঙ্গে কথাবার্তা বলতে বলতেই সুনন্দা জিজ্ঞাসা করল, 'কিরে, 'পদাতিকে'র টিকিট কেটেছিস?'

গণেশ অবাক। সিনেমা দেখার ব্যাপারটা যে ও এমন সরকারীভাবে ঘোষণা করবে তা কল্পনা করেনি। অবাক বিস্ময়ে একবার সুনন্দার দিকে তাকিয়ে বলল, 'তোর একটা টিকিট পেয়ে যাবি।'

'আর তোর?'

গণেশ উঠোনের মাঝখানে দাঁড়িয়ে কপালে হাত দিয়ে ইশারা করল, 'কি হচ্ছে?'

সুনন্দা বিন্দুমাত্র দ্বিধা না করে বলল, 'তোর টিকিট কাটিস নি? তুই না গেলে আমিও যাব না!'

'আমি কি দোকান বন্ধ করে তোর সঙ্গে সিনেমা দেখতে যাব?'

'মাসে দু-এক বেলা দোকান বন্ধ থাকলে এমন কিছু ক্ষতি হবে না।' সুনন্দা প্রায় হুকুম দেবার মত বলল, 'তাড়াতাড়ি চান-খাওয়া করে নে। হলে গিয়েই আরেকটা টিকিট যোগাড় করে নেব।'

এতক্ষণে গণেশের মা বললেন, 'এত করে যখন বলছে তখন যা না, দেখে আয়। তুই তো কোথাও যাস না।'

গণেশ ঘরে ঢুকতে ঢুকতে বলল, 'তুমি কিছু বোঝ না মা। একজন প্রফেসারের সঙ্গে আমি কখনও সিনেমায় যেতে পারি?'

'জ্যেঠিমা, ও যদি ফের এইভাবে কথা বলে তাহলে কিন্তু আমি আর আসব না।'

গণেশের মা হাসেন। বলেন, 'তোদের কি এখনও ঝগড়া করার বয়স আছে ?'

গণেশ আর কথা বলে না। তাড়াতাড়ি মাথায় তেল মাখতে মাখতে বাথরুমে গেল। তারপর ও যখন খেতে বসল তখন সুনন্দাও একটা প্লেটে শুধু খানিকটা পোস্ত নিয়ে বসল। গণেশ বলল, 'এ বাড়িতে এলেই কি তোর ক্ষিদে পায় ?'

'ভগবান নিশ্চয়ই এ বাড়িতে আমার জন্য কিছু গচ্ছিত রেখেছেন, তাই খাচ্ছি !'

গণেশের মা হাসতে হাসতে বললেন, 'ছোটবেলায় তোরা দুজনে আমার দুপাশে শুয়ে কি ঝগড়াই না করতিস !'

সুনন্দা জিজ্ঞাসা করল, 'কেন ?'

'গণেশ অনেক বড় হবার পরও আমার বুকের দুধ খেত। ওর দেখাদেখি তুইও আমার দুধ খেতিস। ব্যস ! সঙ্গে সঙ্গে লেগে যেত তোদের লড়াই !'

গণের একবার সুনন্দার দিকে তাকাতে গিয়েই দেখল ও ওর দিকে তাকিয়ে মিটমিট করে হাসছে। সুনন্দা তাড়াতাড়ি মুখের হাসি লুকিয়ে কোনমতে একটু গম্ভীর হয়ে বলল, 'তাহলে ও ছোটবেলা থেকেই ভীষণ হিংসুটে ?'

গণেশ বলল, 'সবাই তো তোর মত উদার হয় না।'

অনেক দিন ধরে চলছিল বলে আগের টিকিটটা ফেরত দিয়ে দুটো টিকিট পাওয়া গেল। অনেক দিন পরে সুনন্দার পাশে বসে সিনেমা দেখতে দেখতে গণেশ ভুলেই গেল সে সামান্য একজন দোকানদার।

সিনেমা দেখে বেরুবার পর গণেশ বলল, 'এর আগেও তোর সঙ্গেই সিনেমা দেখেছিলাম। এই ক'মাস আর কোন সিনেমা দেখিনি।'

সুনন্দা একটু হাসল।

'হাসির কথা নয়, সত্যি বলছি আর কারুর সঙ্গে সিনেমা দেখতে ইচ্ছে করে না।'

'আমি যদি হঠাৎ মরে যাই, তাহলে কি করবি ?'

'আমাকে না মেরে কি তুই মরবি ?'

'এতদিনে বুঝি এই আমাকে চিনলি ?' সুনন্দা হঠাৎ একটু গম্ভীর হয়ে বলল, 'জীবনে অনেকের সঙ্গে মেলামেশা করলাম। তাদের কাউকে কাউকে ভালও লেগেছে, কিন্তু তোর মত আপন আর কাউকে মনে হয় না।'

গণেশ হাসে।

'তুই হাসছিস ? সত্যি বিশ্বাস কর, তোর সঙ্গে ঝগড়া করেও আনন্দ পাই। মনটা হাল্কা হয়।'

'কিন্তু এই মন কি চিরকাল থাকবে ?'

গণেশের প্রশ্ন শুনে সুনন্দা একটু ভাবে ! একবার ওর দিকে তাকাল। তারপর বলল, 'ভবিষ্যতের কথা কি কেউ বলতে পারে ? আমিও পারব না, তুইও পারবি না।'

সুনন্দা পুরুলিয়া ফিরে যাবার সপ্তাহ খানেক পরেই বার্ণপুর থেকে ছোড়দা এলো। ও বছরে দু'তিনবারের বেশি কলকাতা আসে না। আসার ছুটি পায় না। গণেশ দোকানে বসেই রেণুর কাছে খবর পেল, ছোড়দা এ্যাসিসট্যাণ্ট ফোরম্যান হয়েছে। সাত-আট শ' টাকা মাইনে ছাড়াও বড় কোয়ার্টার পাবে।

দুপুরবেলায় খেতে এসে মা-র কাছে শুনল, এর ওপর তিন-চার মাসের মাইনে বোনাস আছে।

একটু পরেই ছোড়দা আর বড়মা একবাটি মিষ্টি হাতে করে এলেন। ছোড়দা বরাবরই মুখচোরা। কারুর সঙ্গেই বেশি কথাবার্তা বলে না। গণেশের মাকে প্রণাম করে শুধু বলল, 'আমরা দু'ভাইবোনেই যখন বাইরে তখন বাবা-মার এখানে থাকার কোন মানে হয় না। তাই ভাবছি সামনের বার এসে বাবা-মাকে নিয়ে যাব।'

শুনেই গণেশ আর ওর মা-র মনটা বিষণ্ণ হয়ে গেল।

মেয়ে প্রফেসার, ছেলে এ্যাসিসট্যাণ্ট ফোরম্যান হওয়ায় বড়মার চোখেমুখে একটা বিচিত্র ঔজ্জ্বল্য। গর্ব, আনন্দ। মুখে বললেন, 'আমি বলছি আমরা বুড়ো-বুড়ী এখানেই থাকি। ওসব বাংলো-টাংলোতে কি আমরা থাকতে পারি?'

গণেশের মা বললেন, 'ওসব বাজে কথা ছাড় তো। এবার দু'ভাইবোনের বিয়ে দিয়ে জামাই পুত্রবধূ আন তো। আমরা একটু আনন্দ করি।'

ঝণ্টু বলল, 'অত বড় বোনের বিয়ে না হলে কি আমি বিয়ে করতে পারি জ্যেঠিমা?'

গণেশ জামা খুলতে খুলতে জিজ্ঞাসা করল, 'ক'দিন আছ ছোড়দা?'

'দিন দুই।'

'একটু বসো। আমি চান করে নিই।' ছোড়দার সম্মতির অপেক্ষা না করেই গণেশ চলে গেল।

খেতে বসেও ওদের বাড়ির কথাই হচ্ছিল। গণেশ বলল, 'ভগবান সত্যি ওদের উপর সদয় হয়েছেন।'

মা বললেন, 'মেয়েটার বিয়ে হয়ে গেলে আর তো ওদের কোন চিন্তা রইল না।'

'বিয়ের কথাবার্তা কিছু হচ্ছে নাকি?

'ঝণ্টু বুঝি একটা ছেলের কথা সুনন্দাকে লিখেছিল, কিন্তু ও রাজী হয়নি।'

'হাজার হোক প্রফেসারী করছে। ওর মতামতের তো অনেক দাম।'

'এত বড় মেয়েকে কি আর জোর করে বিয়ে দেওয়া যায়?'

দেখতে দেখতে আরো ক'টা মাস কেটে গেল। কাবুলিওয়ালার মত

নাছোড়বান্দা বর্ষাও চলে গেল, মা দুর্গা যুদ্ধ করতে করতে এলেন, গেলেন। এসে গেল কলকাতার ক্ষণস্থায়ী অতিথি—শীত।

সত্যদার চিঠিটা হাতে করে গণেশ দুপুরে পর বাড়িতে ঢুকতেই বড়মা হাসতে হাসতে সামনে এসে বললেন, 'তোমাদের সবাইকে বার্নপুর যেতে হবে।'

'কেন বড়মা ? ছোড়দার বিয়ে নাকি ?'

'তোর ছোড়দার না, সুনন্দার বিয়ে।'

শুনেই মাথাটা ঘুরে উঠল। বলল, 'দাঁড়ান বড়মা, একটু বসে নিই।' তারপর রান্নাঘরের দিকে তাকিয়ে বলল, 'এক গেলাস জল দাও তো।'

জল খেয়ে ঘরে চৌকির উপর বসে জিজ্ঞাসা করল, 'পাত্র কি বার্নপুরের ?'

'না রে।'

'তবে ?'

'ও নিজেই ছেলে পছন্দ করেছে···'

বুকের মধ্যে আগুন জ্বলে গেলেও গণেশ বলল, 'সে তো অতি উত্তম কথা !'

'তবে ছেলেটি খুব ভাল। পড়াশুনায়, দেখতে-শুনতে কোন তুলনা হয় না। শুধু···'

গণেশের মা বললেন, 'ছেলেটিও পাটনায় প্রফেসারী করে। বাড়ির একমাত্র ছেলে, বোনটিও প্রফেসার···'

বড়মা আনন্দে উত্তেজনায় চুপ করে থাকতে পারলেন না। বললেন, 'ওর বোন তো রাণীর সঙ্গেই প্রফেসারী করে।'

'কি নাম বলুন তো ?'

'সুজাতা।'

'হ্যাঁ হ্যাঁ, ওর কথা খুব শুনেছি।'

'সবই ভাল, কিন্তু ওরা যদি বামুন না হতো তাহলে আর কোন দুঃখ থাকত না।'

'এতে দুঃখের কি আছে বড়মা ? এ তো আনন্দের কথা !'

'যাই হোক বাবা, তোদের সবাইকে কিন্তু যেতে হবে। তোরা ছাড়া আমার আর কে আছে বল্ ?'

'বিয়ে কবে ?'

'এই সাতই মাঘ। বাইশে জানুয়ারি।'

মাথা নাড়তে নাড়তে গণেশ বলল, 'না বড়মা, আমি তো যেতে পারব না।' পকেট থেকে সত্যদার চিঠিটা বের করে বলল, 'আমি দোকান ছেড়ে দিয়ে পয়লা জানুয়ারি থেকে চাকরিতে লাগছি।'

'সে কি ?'

'হ্যাঁ বড়মা। সত্যদার জন্য একটা খুব ভাল চান্স পাচ্ছি। হয়ত পাঁচ-দশ বছর পরে আমিও এ্যাসিসট্যাণ্ট ফোরম্যান হতে পারব।'

'খুব ভাল কথা, কিন্তু তুই না গেলে কি করে হবে রে ?'

গণেশ হাসতে হাসতে বলল, 'রাঁচীর বরযাত্রীরা ভীষণ ভাল হয়। কোন

ঝামেলা হবে না। আমি না গেলেও মা আর দুই বোন তো যাবে।'

রাত্রে দোকান থেকে ফিরলে বেণু দরজা খুলেই বলল, 'দাদা, তোর সঙ্গে ক'টা কথা আছে।'

'কি কথা?'

'এখনই বলব?'

'বল্!'

'মা যতই কান্নাকাটি করুক তুই সত্যদার এই অফার কিছুতেই ছাড়বি না। তোকে ফোরম্যান হতেই হবে, আর আমিও এম. এ. পাশ করে প্রফেসার হবই।'

আবছা আলোয় গণেশ দেখল বেণুর চোখে প্রতিজ্ঞার আগুন জ্বলছে। বলল, 'আমি কিছু হই আর না হই, তোকে প্রফেসার হতেই হবে।'

'না না, দাদা, তুইও রাণীদির এই বিশ্বাসঘাতকতা বরদাস্ত করতে পারবি না।'

ভায়া ডালহৌসী

'বলাইদা, এটা ভায়া ডালহৌসী না?' লাফ দিয়ে বাসে উঠেই শশাঙ্ক জিজ্ঞাসা করল।

মুস্কিপাতি জর্দা দেওয়া পান চিবুতে চিবুতে বলাইদা বললেন, 'হ্যাঁ।'

শশাঙ্ক পাশে বসল। 'তাহলে আপনি এ বাসে?'

'তাতে কি হল?'

'ভায়া ডালহৌসী গিয়ে আপনার লাভ?'

জানালার বাইরে মুখ নিয়ে একবার পানের পিচ ফেললেন বলাইবাবু। তারপর আবার পান চিবুতে শুরু করলেন। একটু হাসলেন। ঔদাসীন্যের হাসি।

'একটু ঘুরতে হয়, তাইতো?'

'হ্যাঁ।'

বলাইবাবু আবার হাসলেন। 'জীবনটাই তো সোজা রাস্তায় নিয়ে যেতে পারলাম না ভাই; একটু ডালহৌসী ঘুরে গেলে কি আর এমন ক্ষতি হবে?'

শশাঙ্ক হাসে কিন্তু মনে মনে আঘাত পায়। দুঃখিত হয়। কষ্ট হয়। পুরানো দিনের কথা মনে পড়ল। তখন এই বলাই বিশ্বাসকে দেখার জন্য রাস্তায় ভীড় জমে যেত। ওকে তখন ট্রামে-বাসে চড়তে হত না। কোন না কোন গুণমুগ্ধ ভক্তের মোটরগাড়ি ওর বাড়ির সামনে সব সময় দাঁড়িয়ে থাকত। বলাইদাকে মোটরে চড়িয়ে ওরা কৃতার্থ হত। কদাচিৎ কখনও ট্রামে-বাসে উঠলেও ভাড়া লাগত না। কখনও কণ্ডাক্টর নিত না, কখনও বা অন্য কেউ দিয়ে দিত। সামনের ঘরের ঐ তক্তপোষে বসে গল্প করে ধন্য হত কত বিখ্যাত আর ধনী। আরো কত কি! খবরের কাগজের পাতায় মোটা মোটা অক্ষরে নাম ছাপা হয়, ছবি ছাপা হয়। পিয়ার্সন সুরিটা রানিং কমেণ্টারী দিতে দিতে মাঝে মাঝেই বলতেন, বুলেট বিশ্বাস আর বেরী সর্বাধিকারী বলতেন, লায়ন অফ্ দ্য গেম! আজ কোথায় সে সব দিন? তখন কি কেউ কল্পনা করতে পেরেছিলেন এই বলাই বিশ্বাসকে একদিন 'খৈতান স্টীল ফার্নিচার্স'-এ স্টোর ক্লার্ক হয়ে জীবন কাটাতে হবে?

কেউ ভাবেননি। বলাইদা নিজেও না। কিন্তু এমনই হয়। প্রায় সবার জীবনেই হয়। হঠাৎ মোড় ঘুরে যায়। আগে বা পরে। একটু ঘুরপাক না খেয়ে জীবনে চলা যায় না। শাল-তমাল-দেবদারুর মত সবাই কি আকাশের দিকে মাথা উঁচু করে দাঁড়াতে পারে?

না। সব বীজ যদি অঙ্কুরিত হত, তাহলে এই পৃথিবীতে জনপদ গড়ে উঠতে পারত না; অরণ্যে ভরে যেত সমস্ত অঞ্চল।

শ্যামবাজার থেকে বাস ছাড়তে না ছাড়তেই মিঃ চ্যাটার্জী উঠলেন। মিঃ অভিজিৎ চ্যাটার্জী। বাটা কোম্পানীর শো-কেসের নতুন জুতার মত চক-চক করছে চেহারা। পরনের স্যুট। টাই, লিবার্টির টেরিকট শার্ট।

'গুড মর্নিং চ্যাটার্জী!' অভ্যর্থনা করলেন মিঃ ঘোষ।

ঘোষকে দেখেই চ্যাটার্জী হাসলেন। 'আরে! কি খবর?'

'ভাল।'

'উই আর মিটিং আফটার এজেস্!'

ঘোষ হাসল। 'এজেস্ মানে, মাস খানেক হবে।'

'আই সাপোজ তারও বেশী।'

'না। তার বেশী হবে না।'

'মাস খানেকই বা কোথায় ছিলেন।'

'মাস খানেকের জন্য সাউথ ইণ্ডিয়ায় গিয়েছিলাম!'

'ছুটিতে? বেড়াতে?'

'আরে না মশাই। অফিসের কাজে।'

'সাউথে আপনাদের কোন পেপার মিল আছে নাকি?'

'নট এ্যাট প্রেজেণ্ট, তবে বোধহয় একটা ইউনিট চালু করা হবে।'

'আই সী!' মিঃ চ্যাটার্জী ব্রীফ্ কেসটা দু'পায়ের মাঝখানে রেখে বললেন, 'সেলস্ সার্ভে করতে গিয়েছিলেন বুঝি?'

'নট ইগজ্যাকট্‌লি সার্ভে, বাট জেনারেল মার্কেট পোটেনসিয়ালিটি স্টাডি করতে গিয়েছিলাম।'

অফিস যাত্রীর ভীড় এখনও শুরু না হলেও ডালহৌসীর বাস ভরে যাচ্ছে। শ্যামপুকুরের মোড় থেকে চন্দ্রকান্ত সান্যাল, গোবিন্দ ভট্টাচার্য, অমিয় দে, রেখা ঘোষ ও আরো চার-পাঁচজন উঠলেন।

রেখাকে দেখেই মিসেস মুখার্জী বললেন, 'এসো।'

রেখা বসল। 'কাল ফেরার সময় আপনাকে দেখলাম না তো?'

'না ভাই, কাল ছেলেটার জন্য অফিস যেতে পারিনি।'

'আমিও তাই ভাবছিলাম।'

'এই এক মাসের মধ্যেই তিন দিন কামাই করলাম।'

'দরকার হলে আপনি তো তবু ছুটি পান, কিন্তু আমার অফিসে ছুটি পাওয়া অসম্ভব।'

'ছোটখাট প্রাইভেট ফার্মে চাকরি করার ঐ তো অসুবিধে।'

রেখা হাসে। হাসতে হাসতেই বলল, 'তাছাড়া আরো কত ঝামেলা।' মিসেস মুখার্জীও একটু হাসলেন। 'তুমি যে অসুবিধের কথা বলছ, সে অসুবিধে সব অফিসেই আছে।'

আস্তে আস্তে সব সীটগুলো ভরে গেছে। বেশ কয়েকজন দাঁড়িয়েও আছেন। বোধহয় দোতলাও ভরে গেছে। কণ্ডাক্টর এল; ভাড়া নিয়ে টিকিট দিয়ে চলে গেল। বাস চলছে। কখনও আস্তে, কখনও জোরে, মাঝে মাঝে থামছে। কেউ

উঠছেন, কেউ নামছেন। ওরা দুজন লেডিস সীটের এক কোণায় বসে খুব চাপা গলায় কথা বলেন।

রেখা বলল, তবু তো আপনাদের মত বড় অফিসের পরিবেশ অনেক ভাল, কিন্তু…।'

মিসেস মুখার্জী সঙ্গে সঙ্গে প্রতিবাদ করলেন, 'কে বলল তোমাকে ? বাইরে থেকে দেখতেই বেশ চকচকে। ভিতরে নোংরামী কিছু কম নেই।'

'তাই নাকি ?'

'তবে কি ? বিয়ে করে তবু খানিকটা নিশ্চিন্ত!' মিসেস মুখার্জী একবার রেখার দেহের উপর দিয়ে দৃষ্টি বুলিয়ে নিয়ে বললেন, 'সব চাইতে মজার কথা কি জান ?'

'কি ?'

'তোমার মত মেয়েদের দেখে ছেলেছোকরারা বড়জোর হাসি-ঠাট্টা করবে, কিন্তু ভয় হয় ম্যারেড বুড়ো ধাড়িগুলোকে নিয়ে।'

রেখা হাসে।

মিসেস মুখার্জীও একটু হাসলেন। 'তুমি হাসছ ? আরো দু'এক বছর ডালহৌসী পাড়ায় চাকরি করলে বুঝবে।'

লেডিজ সীটের সামনেই বেশ কয়েকজন ভদ্রলোক দাঁড়িয়ে আছেন। দু'একজন একটু বেশি আগ্রহের সঙ্গে ওদের দেখছেন। ফিস ফিস করে কথা বললেও সামনে অমন অতি উৎসাহী যাত্রী থাকলে অস্বস্তি হয়। রেখা চুপ করে রইল কিন্তু মনে মনে বুঝল মিসেস মুখার্জী ঠিকই বলেছেন। মনে পড়ল কয়েক মাস আগেকার কথা। নতুন চাকরিতে ঢুকেছে। ছুটির পর লিফটে নামছে। লিফটে আরো দু'জন মেয়ে ছাড়াও দু'তিনজন ভদ্রলোক। একজন মাঝারি বয়সী ভদ্রলোক এমন বিচ্ছিরি ভাবে রেখার পাশে দাঁড়ালেন যে ও অস্বস্তিতে কুঁকড়ে গেল। একটি মেয়ে হঠাৎ রেখার একটা হাত ধরে কাছে টেনে বলল, 'এদিকে সরে আসুন। আমাদের ব্যানার্জীবাবু মেয়েদের একটু বেশী আপন ভাবেন।'

লিফটের আর সবাই একটু হাসলেও আত্মসম্মানে আঘাত লাগার জন্য ব্যানার্জীবাবু মুখ বুজে সহ্য করতে পারলেন না। 'আঃ! কি আজেবাজে কথা বলছেন।'

মীনা হাসল। হাসল পূরবীও। চুপ করে রইল। লিফট থেকে নেমে স্টিফেন হাউস থেকে বেরুবার সময় ওদের সঙ্গে রেখার আলাপ হল। টিফিনের সময় আর লেডিজ ট্রামে যেতে যেতে আলাপ বন্ধুত্বে পরিণত হল। মীনার কাছে রেখা অনেক গল্প শুনেছে।…'এক বার আমাদের অফিস থেকে একটা থিয়েটার করা হল। আমাদের ক্যাশ ডিপার্টমেন্টের যতীনবাবু বলে এক বেশ বয়স্ক ভদ্রলোক আমার বাবার পার্ট করেছিলেন। কিন্তু কি বলব ভাই… ।'

মীনা পুরো কথাটা শেষ না করেই হাসতে শুরু করল। পূরবী হাসতে হাসতেই একটু বকুনি দিল, 'কথাটা না বলেই হাসছিস কেন ?' রেখা ঠিক

বুঝতে পারে না। 'কি হয়েছিল কি?'

মীনা বলল, 'প্রত্যেক সিনেই বাবা আমাকে এমন আদর করতে শুরু করলেন যে হল-শুদ্ধ লোক হাসাহাসি শুরু করে দিল।'

পূরবী বলল, 'জান রেখা, পর দিন অফিসে এসে ও কি কাণ্ড করেছিল?'

'কি?'

'মীনাটা এমন ফাজিল যে সবার সামনে বলতে শুরু করল, যতীন বাবা আমার প্রেমে পড়েছেন। তারপর থেকে আমাদের অফিসে ওর নামই হয়ে গেল যতীন বাবা।'

রেখা হাসতে হাসতে জিজ্ঞাসা করল, 'সত্যি?'

মীনা হাসছিল। পূরবীই বলল, 'আমাদের অফিসের যে কোন লোককে জিজ্ঞাসা করে দেখ।'

একগোছা কাশফুলের মত মীনা সব সময় হাসছে, হেলছে দুলছে। হঠাৎ দেখলে মনেই হয় না মাটির মধ্যে এর শিকড় আছে। আর পূরবী? ও যেন গরম কালের সন্ধ্যাবেলার দক্ষিণী বাতাস। বড় মিষ্টি, বড় প্রিয়। ওর চোখে দেখার চাইতেও অনুভব করেই বেশী আনন্দ, বেশী তৃপ্তি। মাঝে মাঝেই লেডিজ ট্রামে ওদের দেখা পায় না রেখা। একটু শূন্যতা অনুভব করে। পরের দিন টিফিনের সময় জিজ্ঞাসা করে, 'কাল বিকেলে দেখা হল না তো?'

স্বচ্ছন্দে মীনা বলল, 'একটা ছেলের ঘাড় ভেঙে সিনেমায় গিয়েছিলাম যে।'

'ইভিনিং শো'তে?'

'না, না, ম্যাটিনীতেই।'

'অফিস থেকে ছুটি নিতে অসুবিধে হয় না?'

'ঐ বুড়ো ভেড়াগুলোর কাছে একটু হেসে কথা বললেই তো ছুটি পাওয়া যায়। অসুবিধে হবে কেন?'

মীনার কথা শুনে রেখা হাসে।

মীনা বলল, 'হাসছ কেন? ডালহৌসী পাড়ায় চাকরি পাওয়া কঠিন, কিন্তু একবার পেলে টিঁকিয়ে রাখা বড় সহজ।'

রেখা আবার হাসে। অবিশ্বাসের হাসি হাসে। আগে মীনাও বিশ্বাস করত না, কিন্তু আস্তে আস্তে ছোটখাট হোঁচট খেতে খেতে ডালহৌসী স্কোয়ারে টিকে থাকার কায়দা জেনে গেছে।

মীনা হাসতে হাসতে বলল, 'দেখছিস পূরবী, রেখা আমার কথা বিশ্বাস করছে না।'

পূরবী একটু হাসল। কোন কথা বলল না।

দু'তিন দিন পরে অফিস ছুটির পর ওরা তিনজনে বাড়ি না ফিরে রাজভবনের দক্ষিণ দিকের মাঠের স্ট্যাচুটার পাশে বসে বসে চিনেবাদাম চিবুতে চিবুতে গল্প করছিল। একথা-সেকথার পর মীনা নিজের কথা বলতে শুরু করল।

মীনার বাবা অক্ষয়বাবু বেলগাছিয়ার এক উকিলবাবুর ক্লার্ক। বহুকাল আগে কেষ্টনগর কোর্টে চাকরি করতেন। বড়জোর দু'তিন বছর ঐ চাকরি করার পর থেকেই কোন না কোন উকিলবাবুর ক্লার্ক। আগে যখন কয়েকজন নাম-করা উকিলের সঙ্গে কাজ করেছেন, তখন ভালই আয় ছিল। তবে খাটতে হত। সকাল সাতটার মধ্যে উকিলবাবুর বাড়িতে পৌঁছতেন। সাড়ে আটটা-ন'টার মধ্যে বাড়িতে ফিরে খেয়েই কোর্টে ছুটতেন। কোর্ট থেকে আবার উকিলবাবুর বাড়ি। নিজের বাড়ি ফিরতে ফিরতে রাত্রি ন'টা-সাড়ে ন'টা হয়ে যেত। এই ভাবেই অক্ষয়বাবুর জীবন কেটেছে।

মীনার বড়দা পাড়ার ক্লাবে ফুটবল খেলে সুনাম অর্জন করলেন। বাড়ির বাইরের ঘরে কয়েকটা কাপ ও মেডেল এনেই ভাবলেন মোহনবাগান ইস্টবেঙ্গলের আমন্ত্রণ আসার দেরী নেই। শেষ পর্যন্ত কিছুই হল না। না ফুটবল খেলা, না লেখাপড়া। পর পর তিনবার ম্যাট্রিক ফেল করে পাড়ার ক্লাবের রেফারি-গিরি করলেন কয়েক বছর। তারপর গোরাবাজারের এক ওষুধের দোকানের সেলস্‌ম্যান। পঁচাত্তর টাকায় ঢুকে এখন একশো পঁচাত্তর পান। এছাড়া আর আছে স্ত্রী ও তিনটে মেয়ে। মাসের প্রথম দিকে মা-র হাতে আশী-নব্বই বা একশো টাকা দিয়েই দায়িত্ব মুক্ত।

মীনার মেজদা জীবনে কোনদিন ফুটবল স্পর্শ করেন নি। ফুটবল খেলা ও খেলোয়াড়দের সমান ভাবে ঘেন্না করেন। চিরকাল। ওর ধারণা শিক্ষিত ভদ্র ছেলেরা ফুটবল খেলে না। ছোটবেলায় দু'ভাইতে তর্ক-ঝগড়া, এমন কি মারামারি পর্যন্ত হত। বড় হবার সঙ্গে সঙ্গে সম্পর্ক আরো খারাপ হল। মেজদা লেখাপড়ার সময় ছাড়া সব সময়ই পাড়ার লাইব্রেরি নিয়ে মেতে থাকতেন। বড়দার তুলনায় মেজদা অনেকটা এগিয়ে গেলেও বি. এ. পাস করতে পারলেন না। কিছুদিন টিউশানি, তারপর পশ্চিমবঙ্গ সরকারের ল্যাণ্ড রেভিনিউ ডিপার্টমেণ্টের চাকরি নিয়ে কলকাতা ত্যাগ।

পূরবী জিজ্ঞাসা করল, 'হ্যাঁরে, তোর মেজদা এখন কোথায় পোস্টেড ?'

'মালদায়।'

রেখা বলল, 'এসব নতুন কি শোনাচ্ছ ? অধিকাংশ মধ্যবিত্ত বাঙালী ফ্যামিলীরই তো এই কাহিনী।'

মীনা বলল, 'আঃ। এসব তো সাইড ক্যারেক্টার। ব্যস্ত হচ্ছ কেন ?'

'তোমার মেজদা বিয়ে করেছেন ?'

'স্ব-নির্বাচিত এবং ইণ্টার-কাস্ট। বড়দা আমাদের সঙ্গে থাকেন বলে বাড়ির সঙ্গে কোন সম্পর্ক নেই। তবে প্রত্যেক মাসে মা-র নামে পঁচিশ-তিরিশ টাকার একটা মনি-অর্ডার আসে।'

'তবুও ভাল বলতে হবে।'

'নিশ্চয়ই ভাল। মেজদা রিয়েলি খুব রেসপনসিবল লোক। এছাড়া প্রত্যেক বছর পুজোর সময় বাবা-মা আর আমাকে জামা-কাপড় পাঠায়...'

পূরবী মাঝপথে বলল, 'ঐ মেজদার জন্যই তো ও কলেজে পড়তে পারল।'

রেখা জিজ্ঞাসা করল, 'তোমরা মেজদার কাছে যাও ?'

'আমি তো প্রত্যেক বছর যাই। একবার তো পূরবীকেও নিয়ে গেছি।...'

'তাই নাকি ?'

পূরবী বলল, 'ওর মেজদা-মেজবৌদি দুজনেই খুব ভাল। তিন-চারদিনের জন্য গিয়ে পনেরো দিন কাটিয়ে এসেছি।'

শুনে রেখা হাসল। 'প্রত্যেক ফ্যামিলীতেই এই রকম একজন থাকেন, তাই না ?'

পূরবী বলল, 'ভেরী আনফরচুনেট ব্যাপার হচ্ছে এই যে ওর মেজদা-মেজবৌদির একটাও বাচ্চা হল না।'

মীনা বলল, 'ছোটদা যে-ভাবে প্রোডাকশন শুরু করেছে তাতে ও দু'চারটে বাচ্চা মেজদাকেও দিতে পারবে।'

রেখা জিজ্ঞাসা করল, 'ছোটদা কি করেন ?'

'বিজনেস করতে গিয়ে বাবার শেষ সঞ্চয়টুকু উড়িয়ে দিয়ে এখন পাড়ার একটা স্কুলে মাস্টারী করছে।'

'তোমরা তিন ভাই ?'

'হ্যাঁ।'

'আর বোন ?'

'আমি একাই তো একশো। আর বোনের দরকার কি ?'

মীনা সেকেণ্ড ডিভিশনে হায়ার সেকেণ্ডারী পাস করলেও অক্ষয়বাবুর পক্ষে ওকে কলেজে পড়ানো সম্ভব ছিল না। কলেজে না পড়িয়ে যে বিয়ে দেবেন, সে ক্ষমতাও ছিল না। মেজদা মেজবৌদি দুজনেই লিখল, নিশ্চয়ই কলেজে ভর্তি হবে এবং সেজন্য যা কিছু ব্যয় হবে তা আমরাই দেব। এইসব চিঠিপত্রের লেনদেন ও টাকা আসতে দেরী হওয়াতে দমদমের কলেজে ভর্তি হতে পারল না। ভর্তি হল মণীন্দ্র কলেজের মর্নিং সেকশনে।

মুখটা একটু বিকৃত করে মীনা বলল, 'মর্নিং কলেজে পড়া ভারী বিচ্ছিরি।...'

'কেন ?'

'দিনের বেলা পড়াশুনাতেও মন লাগে না, বাড়ির মধ্যে চুপচাপ বসে থাকতেও ইচ্ছা করে না...'

রেখা আর পূরবী প্রায় এক সঙ্গেই বলল, 'তা ঠিক।'

'ফার্স্ট ইয়ার—সেকেণ্ড ইয়ারটা তবু কোনমতে কাটিয়ে দিলাম। কিন্তু থার্ড ইয়ারে উঠে প্রেম না করে পারলাম না।...'

ওর কথা শুনে রেখা আর পূরবী দুজনেই হেসে উঠল।

'এতে হাসির কি আছে? আমার চেহারাটাই এখনও এমন যে কোন পুরুষের দৃষ্টি এড়িয়ে যায় না। তখনও কোন ছেলের দৃষ্টি এড়িয়ে যেত না। রাস্তাঘাটে অনেকেই রোমান্টিক দৃষ্টিতে তাকাত, একটু হাসত। দু'চারজন জোর করেই দুটো একটা কথা বলত। আস্তে আস্তে দেখলাম আমার মা পাড়ার

অনেক ছোকরারই মাসিমা হয়ে গেলেন।...'

রেখা হাসতে হাসতে পূরবীকে বলল, 'সত্যি এমন হয়, তাই না?'

পূরবী জিজ্ঞাসা করল, 'তোমার মা-ও বুঝি অনেকের মাসিমা হয়ে উঠেছেন?'

জবাব দিল মীনা, 'ফ্রক ছেড়ে শাড়ি ধরার সঙ্গে সঙ্গেই মৌমাছি উড়তে শুরু করে। সুতরাং অনেকের না হলেও কিছু ছেলের মাসিমা তো নিশ্চয়ই হয়েছেন।'

চিনেবাদাম শেষ। ঝালমুড়িওয়ালা আসতেই তাকে ফিরিয়ে দিল না। তিনজনে তিন ঠোঙা ঝাল মুড়ি নিল। রেখা বলল, 'তারপর তোমার কি হল বল?'

'অতগুলো মৌমাছি যখন ভন ভন করে তখন একজনের সঙ্গে প্রেম করা খুব রিস্কি। তিন-চার জনের সঙ্গে মেলামেশা শুরু করলাম।'

'তিন-চারজনের সঙ্গে?' রেখা অবাক হয়ে প্রশ্ন করে।

ঝাল মুড়ি খেতে খেতে নির্বিকার হয়ে মীনা বলল, 'হ্যাঁ। একজনের সঙ্গে একটু বেশী মেলামেশা করলেই তো একসঙ্গে শুতে চাইবে...'

রেখা আর পূরবী হাসতেও যেন লজ্জা পায়।

'তোমরা হাসলে কি হবে? যা বলছি ঠিকই বলছি। তখন যদি তিন-চার জনের সঙ্গে ভাব জমাতে না পারতাম তাহলে কি এই ডালহৌসী পাড়ায় টিকতে পারতাম?'

মীনা ঠিকই বলেছে। সরকারী অফিসে কোনমতে একবার ঢুকতে পারলে আর ভয় নেই, কিন্তু প্রাইভেট ফার্মে প্রতি পদক্ষেপে চাকরি যাবার ভয়। দু'চারটে খুব বড় বড় প্রাইভেট ফার্মের কথা আলাদা, কিন্তু তাছাড়া অন্য বহু অফিসেই একটা অনিশ্চয়তা সব সময়েই থেকে যায়।

মীনার এক বন্ধুর দিদি ওদের অফিসেই চাকরি করত। বিয়ে হবার তিন-চার বছর পরও চাকরি করছিলেন কিন্তু স্বামী প্রমোশন পেয়ে বদলী হওয়ায় চাকরিটা ছাড়তেই হল। ঐ দিদিই মীনাকে এই অফিসে আনেন। এক মাস পরে একটা ভাউচারে সই করে দুশো পঁচিশ টাকা মাইনে নেবার পর একবার বড়বাবুকে জিজ্ঞাসা করল, 'আমি তো কোন এ্যাপয়েণ্টমেণ্ট লেটার পেলাম না।'

বড়বাবু একবার ওর দিকে তাকিয়েই আবার নিজের কাজে মন দিলেন। 'মাইনে পেয়েছ?'

'হ্যাঁ।'

'তবে আবার কি?'

মীনা আর কোন কথা বলল না। আরো দু'মাস পার হল। একদিন টিফিনের সময় অফিস ফাঁকা। ও কোণায় বড়বাবু আর এ কোণায় মীনা। এমন সুযোগ বিশেষ আসে না। মীনা আস্তে আস্তে এগিয়ে গেল বড়বাবুর টেবিলের কাছে। বড়বাবুই আগে কথা বললেন, 'কিছু বলবে?'

'হ্যাঁ, মানে তিনমাস হতে চলল কিন্তু এখনও এ্যাপয়েন্টমেন্ট লেটার পেলাম না কিনা, তাই…'

'আমাদের তো এ্যাপয়েন্টমেন্ট লেটার দিতে কোন আপত্তি নেই, কিন্তু ঝামেলা করে ইউনিয়নের পান্ডারা। ওদের অমতে লোকজন নিলেই সব চাইতে আগে আমাকে চেপে ধরবে।'

মীনা চুপ করে দাঁড়িয়ে থাকে।

বড়বাবু পান চিবুতে চিবুতে বললেন, 'ওরা যদি আপত্তি না করে তাহলে কালই আমি তোমাকে এ্যাপয়েন্টমেন্ট লেটার দিয়ে দেব।'

বজবজের ফ্যাক্টরী আর কলকাতার হেড অফিসের একই ইউনিয়ন। ইউনিয়নের প্রেসিডেন্টকে মীনা দেখেনি, কিন্তু একজন ভাইস-প্রেসিডেন্ট আর জেনারেল সেক্রেটারী প্রায় রোজই এই অফিসে আসেন। প্রত্যক্ষ পরিচয় না থাকলেও মীনা ওঁদের অপরিচিত নয়। হাজার হোক সুন্দরী যুবতী। অফিসে ঢুকলেই একবার নজর পড়বেই। মাঝে মাঝে চোখে চোখ পড়লেই জেনারেল সেক্রেটারী একটু হাসেন। মীনা একবার ভেবেছিল একবার ইউনিয়নের জেনারেল সেক্রেটারীর সঙ্গে কথা বলবে, কিন্তু শেষ পর্যন্ত ভাবল একবার মিসেস ঘোষের সঙ্গে পরামর্শ করে নেওয়াই ভাল। উনি এ অফিসে বহুকাল ধরে কাজ করছেন। শুনেছে ওর স্বামীও আগে এদেরই বজবজ ফ্যাক্টরীতে এঞ্জিনীয়ার ছিলেন; এখন অন্য কোথায় চাকরি করেন।

মীনা বলল, 'দিদি, একদিন আপনার বাড়ি যাব। কয়েকটা বিষয়ে একটু পরামর্শ করতাম।'

মিসেস ঘোষ খুব খুশী হয়ে বললেন, 'সে তো ভাল কথা। রবিবার সকালে এসো। দুপুরে খাওয়া-দাওয়া করে বিকেলের দিকে চলে যেও।'

'অত বিরক্ত আপনাকে করব না।…'

'এতে আবার বিরক্তর কি আছে? এত দূর থেকে এসে না খেয়ে চলে যাবে, তাই কি হয়?'

রবিবার মিসেস ঘোষের সঙ্গে অনেক কথা হল।

'এসব প্রাইভেট ফার্মের কথা বোলো না! যেমন বড়বাবু, তেমনি ইউনিয়নের সেক্রেটারী। দুজনেই সমান বদ। বড়বাবু ইউনিয়নের পান্ডাদের লোককে চাকরি দেন আর ওরা বড়বাবুর আত্মীয়দের ফ্যাক্টরীতে ঢুকিয়ে দেন।…'

'তাই নাকি?'

'তবে কি? শুনি তো টাকা না নিয়ে বড়বাবু অন্য কাউকে চাকরি দেন না। উনি ইচ্ছা করেই তোমার কেসটা ঝুলিয়ে রেখেছেন।…'

'তাহলে?'

'তুমি এক কাজ কর··'

'বলুন।'

'শনিবার একটা-দেড়টার মধ্যেই তো অফিস খালি হয়ে যায়, কিন্তু

বড়বাবু তারপরেও অনেকক্ষণ থাকেন। সেই সময় তুমি ওকে ভাল করে বলবে যে কিছু মাইনে বাড়িয়ে না দিলে চলছে না।'

'আর ইউনিয়নের সেক্রেটারীকে কিছু বলতে হবে না ?'

'ওর বাড়িতে টেলিফোন আছে। কাল অফিসে গিয়ে মনে করো আমি ওর টেলিফোন নম্বর তোমাকে বলে দেব।'

'টেলিফোনে বললেই কি কাজ হবে ?'

'না, টেলিফোনে ওসব কথা কিছু বল না। শুধু বলবে একবার দেখা করতে চাও।...'

তিন বন্ধুর ঝাল মুড়ি খাওয়া শেষ, কিন্তু মীনার গল্প শেষ এখনও হয় নি।

রেখা বলল, 'আসল ব্যাপার বল।'

একটু নির্লিপ্ত হাসি হাসল মীনা। 'পর পর দু' শনিবার বড়বাবুর সঙ্গে আড্ডা দিতেই উনি মহাখুশী। তারপর ট্রামে ওর পাশে বসে আসায় একেবারে গলে গেলেন।—'

পূরবী বলল, 'আর ইউনিয়নের সেক্রেটারীকে কি করলি সেটা বলে দে।'

'বড়বাবুকে দিয়েই আমার চাকরিটা পাকা হয়ে গেল, আর সেক্রেটারীর সঙ্গে একটু আলাপ হবার পর বোধহয় দু'দিন একসঙ্গে সিনেমায় যাবার পরই বললাম, আমার এক বন্ধুকে আমাদের অফিসে ঢুকিয়ে দিতে হবে—'

পূরবী সঙ্গে সঙ্গে রেখাকে বলল, 'আর কি। আমিও ঢুকে পড়লাম।'

রেখা হাসতে হাসতে বলল, 'সত্যি ?'

মীনা সঙ্গে সঙ্গে বলল, 'তুমি যদি চাও তাহলে তোমাকেও আমাদের অফিসে ঢুকিয়ে দিতে পারি।'

'দাও না ভাই ! তাহলে তো বেঁচে যাই।'

'সিনেমা-থিয়েটার দেখার খরচ তুমি দেবে ?'

'নিশ্চয় দেব।'

'ঠিক আছে। তিন মাসের মধ্যেই তোমাকেও আমাদের অফিসে আনছি।'

ডালহৌসী স্কোয়ার ! কে বলে এটা অফিস পাড়া ? এখানে কি শুধু সরকারী আর সওদাগরী অফিস ? শুধু বড় বড় ব্যাঙ্ক এখানে আছে ?

রাইটার্স বিল্ডিং-এর ক্যান্টিনে বসে স্বপন রায় বলে, 'এটা হচ্ছে বিগেস্ট স্টেজ অফ ইণ্ডিয়া। এখানে ভিখারী রাজা হচ্ছে, রাজা ফকির হচ্ছে। এখানে লম্পট-বদমাইস-জোচ্চর যেমন আছে, তেমনি আছে সৎ, আদর্শবাদী, পরোপকারী মানুষ।'

চায়ের কাপে শেষ চুমুক দিয়ে স্বপন বলে, 'এটা বোধহয় পৃথিবীর বৃহত্তম প্রজাপতি অফিসও বটে। এখানে কলাগাছ না থাকলে কি হয়, ডালহৌসী স্কোয়ারে চাকরি করতে করতে কত ছেলে-মেয়ের হিল্লে হয়েছে ভাবলে মাথা ঘুরে যাবে।'

চঞ্চল পানামার প্যাকেটটা স্বপনের দিকে এগিয়ে দিয়ে বলল, 'তা ঠিক। সারা ডালহৌসী পাড়ার কথা না হয় ছেড়েই দিলাম, এই রাইটার্সে চাকরি করতে করতে কি কম ছেলে-মেয়ের বিয়ের ফুল ফুটল।'

তাই তো মীনা খোলাখুলিই বলে, 'দেখ ভাই, দশ-বিশ হাজার টাকা খরচা করে বিয়ে দেবার ক্ষমতা বাবার নেই। মা ভেবেছিলেন আমার চাকরির টাকা জমিয়ে বিয়ে দেবেন, কিন্তু পাঁচ বছরে কত জমিয়েছি জান?'

রেখা বলল, 'কত?'

'বোধহয় শ' তিনেক টাকা হবে। সুতরাং সে গুড়েও বালি। আর দু'তিন বছরের মধ্যে নিজেকেই একটা দেখে-শুনে নিতে হবে।'

ওর কথায় না হেসে কেউ থাকতে পারে না। রেখাও হাসে, পূরবীও হাসে।

'তোমরা হাসছ হাসো। শরীরে একবার ভাঁটা পড়তে শুরু করলে খদ্দের পাওয়া মুশকিল হবে। সুতরাং দু'তিন বছরের মধ্যেই একটা স্বামী যোগাড় করতেই হবে।'

সিন্ধুর মধ্যেই বিন্দু লুকিয়ে থাকে। অশেষের মধ্যেই এক বর্তমান। সরকারী প্রেসনোট আর খবরের কাগজের পাতায় ডালহৌসীর জনসমুদ্রকে ক্লাউড, জনতা বলে উপেক্ষা করা হলেও এখানকার প্রত্যেকটা মানুষের একটা নিজস্ব চরিত্র আছে। স্বকীয়তা আছে। এই তো এই বাসেই মন্মথবাবু চলেছেন। অভিজিৎ চ্যাটার্জী বা মিঃ ঘোষের মত চাকচিক্য নেই। পরনে সাধারণ মিলের ধুতি আর ঢিলে-হাতা পাঞ্জাবি। হাতে ক্যানভাসের থলি। সাড়ে আটটা বাজতে না বাজতেই বিডন স্ট্রীটের মোড় থেকে উঠে লালবাজারের সামনে মার্টিন বার্ণের পাশে নেমেই চার্চের পাশ দিয়ে হন হন করে হাঁটতে শুরু করেন। দেখে মনে হয় ক্যানিং স্ট্রীট বা চিনেবাজারের কোন দোকানের সাধারণ কর্মচারী। বাইরের চেহারা দেখে কি মানুষ চেনা যায়? কোন মানুষকেই চেনা যায় না।

মন্মথবাবু যখন গিলাণ্ডার্স হাউসের 'কণ্টিনেণ্টাল কেমিক্যালস'-এর অফিসে আঠাশ টাকা মাইনের ডেসপ্যাচ ক্লার্ক হয়ে ঢোকেন তখন ডালহৌসী পাড়ায় সাহেবদের রাজত্ব অম্লান গতিতে চলছে। সারা অফিসের মধ্যে একমাত্র বড়বাবু বরদাকান্ত পাইন ছাড়া আর কেউ এমন কি লুইস সাহেবের ঘরেও ঢুকতে পারতেন না। দরকার হলে সাহেবরা বাবুদের কাছে আসতেন। মন্মথবাবুর কাছে তো হরদমই সাহেবরা আসতেন, মোনমথ, সেণ্ড দিস লেটার ইমিডিয়েটলি। মহাযুদ্ধ শুরু হয়ে গিয়েছিল। পাঁচ আনা সেরের সরষের তেল সাত আনা হতেই হাহাকার পড়ে গেল। পাঁচ টাকার চাল চল্লিশ টাকা হল। মাইনেও বাড়াল। আস্তে আস্তে আরো কত কি হল। লুইস সাহেব বড়সাহেবের ঘরে গেলেন আর ছোটসাহেবের ঘরে এলেন বিলেত-ফেরত ব্যানার্জী সাহেব। অনেকেরই অনেক কিছু হল, কিন্তু মন্মথবাবু ঐ ডেসপ্যাচ ক্লার্কই থেকে গেলেন।

প্রত্যেক বছরই দু-পাঁচ টাকা মাইনে বাড়ে। সংসারের দাবী, প্রয়োজন বাড়ে আরো অনেক বেশী। পাইনবাবুর কাছে মাঝে মাঝেই দরবার করেন মন্মথবাবু, কিন্তু বিশেষ ফল হয় না। তবু দু-এক মাস পরে আবার বড়বাবুর শরণাপন্ন হতে হয়। না হয়ে পারেন না। মিষ্টভাষী বলে কোনদিনই পাইনবাবুর সুনাম ছিল না, কিন্তু সেদিন উনি রাস্তার খেঁকি কুকুরের মত দাঁত-মুখ খিঁচিয়ে গর্জে উঠলেন, 'ম্যাট্রিকটাও তো পাস করেন নি। বেয়ারা-চাপরাশী না হয়ে যে চেয়ার-টেবিল পেয়েছেন, এই তো আপনার চোদ্দপুরুষের ভাগ্য।'

ঘর-ভর্তি লোকের সামনে এভাবে কোনদিন অপমানিত হন নি মন্মথবাবু। ভাগ্যের দোষে লেখাপড়া শিখতে পারেন নি ঠিকই, কিন্তু ভদ্রঘরের ছেলে তো। সৎ এবং বুদ্ধিমান। তারপর হাতের লেখা তো মুক্তোর মত সুন্দর ঝকঝকে। নন্-ম্যাট্রিক ডেসপ্যাচ ক্লার্ক হলেও তো দরকার মত একাউণ্টস বা এজেন্সী ডিপার্টমেণ্টে ওকে কাজ করতে হয়। ওকে সাধারণ কেরানীর চাকরি দিলে কি কণ্টিনেণ্টাল কেমিক্যালস কোম্পানীর মহা সর্বনাশ হত ?

মন্মথবাবু একটি কথা না বলে নিজের টেবিলে ফিরে এলেন আর মনে মনে বললেন, বড়বাবু, আমি বিদ্যাসাগরের প্রথম ভাগ দিয়েই লেখাপড়া শুরু করেছিলাম। বেশী মহাপুরুষের কথা আমি জানি না, কিন্তু বিদ্যাসাগরের জীবনী আমার মুখস্ত। ইচ্ছা করলে মানুষ যে কত অসাধ্য সাধন করতে পারে, তা আমি জানি।

অফিসের সবার অলক্ষ্যে সাধনা শুরু করলেন মন্মথবাবু। পঁয়তাল্লিশে ম্যাট্রিক, সাতচল্লিশে আই. এ., ঊনপঞ্চাশের বৃদ্ধ পাস করলেন বি. এ.। এর দু'বছর আগেই বড় ছেলে বি-এস-সি পাস করে মীর্জাপুরের একটা স্কুলে অঙ্কের মাস্টার হয়েছে। রেজাল্ট বেরুবার পরেও পাইনবাবুকে কিছু বললেন না। লুইস সাহেব এখন বিলেতের অফিসে ডিরেক্টর। মন্মথবাবু ওকেই একটা চিঠি দিয়ে তিনটি পরীক্ষার ফলাফল জানালেন। নিজের নামের তলায় সুন্দর মোটা মোটা অক্ষরে লিখলেন, ডেসপাচ ক্লার্ক, কণ্টিনেণ্টাল কেমিক্যালস্, ক্যালকাটা।

ঠিক এক সপ্তাহ পরের কথা। অফিসে এসেই ম্যানেজিং ডিরেক্টর বার্লো সাহেব পাইনবাবুকে ডাকলেন, 'উই হ্যাভ ও ডেসপ্যাচ ক্লার্ক নেমড্ মোনমোথ সরকার ?'

'ইয়েস স্যার! এনি কমপ্লেন এগেনস্ট হিম স্যার ?'

মিঃ বার্লো ওর কথায় কান দিলেন না। জিজ্ঞাসা করলেন, 'হি হ্যাজ রিমেন্ড্ ডেসপ্যাচ ক্লার্ক ফর দ্য লাস্ট টোয়েণ্টি এইট ইয়ার্স ?'

'দ্যাটস রাইট স্যার, বিকজ...'

'হোয়ার ইজ হি ? ক্যান আই মীট হিম ?'

'অফ কোর্স স্যার! আই এ্যাম কলিং হিম।'

সঙ্গে সঙ্গে মিঃ বার্লো চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়িয়ে বললেন, 'ইয়েস!'

ঘর-ভর্তি যে বেয়ারা-চাপরাশী আর কেরানীবাবুদের পাইনবাবু ডেসপ্যাচ ক্লার্ক মন্মথবাবুকে নিদারুণ ভাবে অপমানিত, লাঞ্ছিত করেছিলেন, সেই তাদের সবার সামনে মিঃ বার্লো মন্মথবাবুর দুটি হাত জড়িয়ে ধরে বললেন, 'কনগ্রাচুলেশানস্ ফর ইওর গ্রেট এ্যাচিভ্মেণ্ট। মিঃ লুইস আজ আমাকে টেলিফোন করে আপনাকে কনগ্রাচুলেট করতে বললেন।'

মন্মথবাবুর দুটো চোখে জল এসে ভরে গিয়েছিল। কোন মতে ধন্যবাদ জানালেন।

বার্লো সাহেব ওর হাত ধরে ডাক দিলেন, 'কাম এ্যালঙ! উই উইল টক ওভার টি।'

সেদিনের সেই ডেসপ্যাচ ক্লার্ক এখন কণ্টিনেণ্টাল কেমিক্যালস-এর ম্যানেজিং ডিরেক্টরের পার্সোন্যাল এ্যাসিসট্যাণ্ট। পাইনবাবু তো দূরের কথা, দু পাঁচ হাজারের কয়েক ডজন অফিসার মন্মথবাবুকে খাতির না করে পারেন না। আঠাশ টাকায় কর্মজীবন শুরু করে আজ প্রায় ষোল শ' টাকা মাইনে পাচ্ছেন। উনি কিন্তু বাইরের হাল-চাল একটুও পাল্টান নি। সেই মিলের মোটা ধুতি, অতি সাধারণ লংক্লথের পাঞ্জাবি। হাতে ক্যানভাসের একটা থলি। থলির মধ্যে কিছু বই আর একটা টিফিন কৌটো।

পলাশীর আমবাগানে একদিন নবাব সিরাজদ্দৌল্লার ভাগ্য-বিপর্যয় ঘটেছিল, রাহুর দশা শুরু হয়েছিল বাঙালীর। লর্ড ক্লাইভের চরণামৃত পেয়ে অনেক বেইমান রাজ-ঐশ্বর্যের মালিক হয়েছিল। সিরাজদ্দৌল্লা ও ক্লাইভ কেউই আজ নেই, নেই পলাশীর আমবাগান, কিন্তু এখনও লালদীঘির চার পাশে বহু নারী-পুরুষের ভাগ্যের উত্থান-পতন হচ্ছে। আজও বহু বেইমান রাজ-ঐশ্বর্যের উত্তরাধিকারী হচ্ছে এবং এক কালে যারা জোড়া ঘোড়ার গাড়ি চড়ে ফোর্ট উইলিয়ামের পাশের ঘাসের জাজিমে বসে গঙ্গার হাওয়া খেতে খেতে কোম্পানীর কাছ থেকে নিলামে সম্পত্তি কিনেছেন, তাদেরই বংশধররা ক্লাইভ স্ট্রীটের নতুন রাজাদের কৃপা-প্রার্থী।

॥ দুই ॥

চিড়িয়াখানায় বাঘ-ভাল্লুক হাতি-ঘোড়া সাপ-কুমীর ও আরো কত কি থাকে। এদের কেউ হিংস্র, কেউ শান্ত; কেউ উপকারী, কেউ ক্ষতিকারক; কেউ সুন্দর, কেউ কুৎসিত। এরা পশু। লোকালয় থেকে দূরে, অরণ্যে পর্বতে এরা স্বাধীন। এরা সম্রাট। এরা আপন ভাগ্যবিধাতা। কিন্তু মানুষের বুদ্ধির কাছে, কৌশলের কাছে এরা শিশু। এরা অসহায়। তাই তো চিড়িয়াখানায় ওরা বন্দী আর আমরা, মানুষের দল চিনেবাদাম চিবুতে চিবুতে ওদের দেখছি। হাসছি। মজা করছি। উপহাস করছি। উপভোগ করছি।

মানুষের চিড়িয়াখানা নেই, কিন্তু ডালহৌসী পাড়ার ঐ বড় বড় বাড়ি-গুলোর প্রত্যেকটা খুপরিতেই এক একটি আজব জীব খুঁজে পাওয়া যাবে। প্রতিদিন সকালে ট্রামে-বাসে, ট্রেনে-মোটরে, সাইকেলে বা পায়ে হেঁটে লক্ষ লক্ষ মানুষ উন্মাদের মত ছুটে আসছে ডালহৌসীতে। কিন্তু কেন? শুধু অন্ন চিন্তা? শুধু কি পরিবার প্রতিপালনের তাগিদে? শুধু কি দায়িত্ব-কর্তব্যের অগ্নিপরীক্ষায় উত্তীর্ণ হতে?

রাইটার্স বিল্ডিংস-এর পিছন দিকেই মিঃ ঘোষের অফিস। বিরাট অফিস। আগে সাহেবরাই মালিক ছিল। গণতান্ত্রিক ভারতবর্ষে সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠার কাজ যখন বিদ্যুৎবেগে শুরু হল, তখন সোমানী এই কোম্পানী কিনে নিলেন। ইংরেজ আমলে গোটা চারেক পেপার মিল, দুটো বড় বড় মাইকা মাইন্‌স, ঝরিয়ার কিছু কোল ফিল্ড আর একটা ওয়াইন ইমপোর্টের ডিপার্ট-মেণ্ট ছিল। পুঁজিবাদীদের বিরুদ্ধে সরকারী মনোভাব যত বিরূপ আর কঠিন হয়েছে, সোমানীর সাম্রাজ্য তত বেশী বিস্তৃত হয়েছে। না হবার কোন কারণ নেই। জানুয়ারীতে জনাদশেক কর্মীর ছাঁটাই। সঙ্গে সঙ্গে বিক্ষোভ। ফেব্রুয়ারীতে ধর্মঘট। মার্চে লক আউট। কোরাস গাইতে শুরু করলেন নেতাজী সুভাষ রোড-রয়্যাল এক্সচেঞ্জ-ডালহৌসী-ব্রেবোর্ন রোডের আরো কিছু কিছু রাজার দল। গর্জে উঠল শ্রমিক আর মেহনতী মানুষ। হাজার-হাজার লক্ষ-লক্ষ মানুষের দুঃখে সরকার বিচলিত হলেন। শুরু হল মিটিং আর কনফারেন্স।

ইতিমধ্যে খবরের কাগজের পাতায় পাতায় বেকার সমস্যার ভয়াবহ পরিস্থিতি নিয়ে নিয়মিত রিপোর্ট ছাপা হতে শুরু করল। শ্রীরামপুরে বি. এস-সি পাস বেকার যুবকের আত্মহত্যার খবরটি বাংলা খবরের কাগজগুলোর প্রথম পাতায় কাব্যিক ভাষায় মোটা মোটা হরফে ছাপা হতেই বিধান সভায় মোশান এল। তুচ্ছ রাজনীতি ভুলে সব সদস্যরাই একবাক্যে দাবী করলেন, যেভাবেই হোক বেকারদের চাকরি দিতে হবে। চাই আরো শিল্প, আরো সরকারী উদ্যোগ। নয়তো এই অসন্তোষের বিস্ফোরণ হলে ভাসিয়ে নিয়ে

যাবে সরকার, তলিয়ে দেবে সব রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠান। স্বয়ং চীফ মিনিস্টার আশ্বাস দিলেন, পশ্চিম বাংলার কোণায় কোণায় শিল্প গড়ে তুলবই ; বেকার সমস্যার সমাধান করবই।

তৃতীয় অঙ্কে ডালহৌসী পাড়ার সমস্ত কুমীর-হাঙ্গরদের নেমন্তন্ন হল রাইটার্স বিল্ডিং-এ। চীফ মিনিস্টার কাউকে ভয় করেন না, পরোয়া করেন না কোটিপতি শিল্পপতিদের। মুখের উপর সাফ সাফ বলে দিলেন, ডোণ্ট ফরগেট ইণ্ডিয়া ইজ ফ্রি। দেশের মানুষ না খেয়ে মরবে আর গভর্নমেণ্ট চুপ করে বসে থাকবে, তা হতে পারে না। তাছাড়া ইউ ইণ্ডাস্ট্রিয়ালিস্ট। দেশের প্রতি, দেশবাসীর প্রতি আপনাদের অনেক অবলিগেশন আছে। সো ইউ অল সুড এ্যাণ্ড মাস্ট জয়েন হ্যাণ্ডস্ টু সলভ দিস হিমালয়ান প্রবলেম অফ আনএমপ্লয়মেণ্ট।

সঙ্গে সঙ্গে শিল্পপতিরাও বললেন, বেকার সমস্যার সমাধান না করলে শিল্পে শান্তি আসতে পারে না, তা তাঁরাও জানেন। তাছাড়া এমন বহু শিল্প আছে যা এদেশে গড়ে উঠলে ইমপোর্ট কমবে, এক্সপোর্ট বাড়বে। ফরেন এক্সচেঞ্জ আসবে, ইণ্ডিয়া উইল বী রিয়েলি প্রসপারাস।...

রোটাণ্ডার টেবিল চাপড়ে চীফ মিনিস্টার বললেন, কোথায় সে-সব প্রপোজাল ?

সব শিল্পপতিই পকেট থেকে নতুন শিল্প গড়ে তোলার প্রপোজালগুলো চীফ মিনিস্টারকে এগিয়ে দিলেন।

রাইটার্স বিল্ডিংস-এর ঘুম ভেঙেছে। চীফ মিনিস্টার নতুন শিল্প গড়তে ক্ষেপে উঠেছেন। একটি দিনও নষ্ট করা হবে না। 'আজই আমি ইণ্ডাস্ট্রি আর কমার্স মিনিস্টারের সঙ্গে কথা বলব। তারপর তিন-চার দিনের মধ্যেই প্রাইম মিনিস্টারের সঙ্গে কথা বলব। নেক্সট উইকেই আমরা মীট করব।'

সোমানী-ভিমানী-দামানী-আগরওয়ালা-ঝুনঝুনওয়ালা বা জৈনদের লিয়াজোঁ অফিসাররা লাখ লাখ টাকা ঘুষ খাইয়ে আর ভেট দিয়ে যে-সব লাইসেন্স-পারমিট বের করতে হিমসিম খেতেন, সেই কাজেই চীফ মিনিস্টার, কমার্স মিনিস্টার আর ডজন ডজন অফিসার ইণ্ডিয়ান এরার-লাইন্সের প্লেনে দিল্লী-কলকাতার মধ্যে ডেইলি প্যাসেঞ্জারী শুরু করে দিলেন। নেক্সট উইকে নয়, নেক্সট মাসেও নয়, দিল্লীর মসনদে মাস ছয়েক তৈলমর্দনের পর নতুন শিল্প গড়ার কয়েকটা লাইসেন্স জুটল। চীফ মিনিস্টারের সগর্ব ঘোষণা ছাপা হবার পরদিনই কলকাতার সব খবরের কাগজে ছাপা হল পশ্চিমবঙ্গের শিল্প-বাণিজ্যে নতুন সংকটের কথা। রেলওয়ে মিনিস্ট্রি যে-ভাবে কলকাতা থেকে পারচেজ কমিয়ে দিয়েছে তাতে তিন মাসের মধ্যে দশ হাজার শ্রমিক রুজি হারাতে বাধ্য। বড় বড় দুটো-তিনটে ফ্যাক্টরীতে ওভার-টাইম বন্ধ করায় শ্রমিক-বিক্ষোভ চলছে। দমদমের একটা ফ্যাক্টরীর শ্রমিকদের উপর লাঠি চালিয়েছে। কোন্নগরের ফ্যাক্টরীতে শুধু লাঠিতে কাজ হয় নি, টিয়ার গ্যাস ছুঁড়তে হয়েছে।

আবার চীফ মিনিস্টার দিল্লী ছুটলেন। পালাম এয়ারপোর্ট থেকে সোজা রেল ভবন। হাজার হোক চীফ মিনিস্টারের অনুরোধ। রেলওয়ে বোর্ডের চেয়ারম্যানের আপত্তি সত্ত্বেও রেল-মন্ত্রী চীফ মিনিস্টারের অনুরোধ মেনে নিলেন। পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রীর বিজয় অভিযানে রাইটার্স বিল্ডিংস-এ আনন্দের বন্যা বয়ে গেল। খবরের কাগজের সম্পাদকীয় স্তম্ভে কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করা হল।

মাসখানেক পরে রেলওয়ে বোর্ডের চেয়ারম্যান কলকাতা এলেন। একদিন সন্ধ্যায় এক পুরোনো বন্ধুর বাড়ি ডিনার খেতে গিয়ে কানপুরের গুপ্তাজী আর লক্ষ্ণৌ-এর দীক্ষিতজীর সঙ্গে দেখা। তিন মাস পরে রেলের বাজেটে লোক্যাল ট্রেনের ডেইলি প্যাসেঞ্জারের ভাড়া বাড়ল না, ধানবাদ-হাওড়ার মধ্যে নতুন ট্রেন চালু হল আর দুটো বনগাঁ লোক্যালের স্পীড বাড়ল। রাইটার্স বিল্ডিংস-এ পাওয়ারফুল চীফ মিনিস্টার থাকলে এসব না হয়ে পারে? রেলের বাজেটে নানা রকমের মালপত্র পাঠাবার রেট বাড়লেও কেউ গ্রাহ্য করলেন না। কেউ খেয়াল করলেন না রেলে সরষে পাঠাবার ভাড়া প্রচণ্ডভাবে বেড়ে গেল। ঐ ভাড়া দিয়ে ইউ. পি. থেকে সরষে এনে সরষের তেল তৈরী করতে হলে বী-এর চাইতে সরষের তেলের দাম বেশী হবে বলে একটি একটি করে কলকাতার সব অয়েল মিল বন্ধ হয়ে গেল। আলীগড় মুসলিম ইউনিভার্সিটির খ্যাতি কমে গেলেও আলীগড়ের সরষের তেলের খ্যাতি সারা দেশে ছড়িয়ে পড়ল। কেউ জানলেন না এই পরিকল্পনার প্রযোজক, পরিচালক, সুরকার ও কাহিনীকার ডালহৌসী পাড়ারই প্রধান প্রধান চরিত্রে যাঁরা অভিনয় করলেন তাঁরা উত্তরের বাসিন্দা হলেও ম্যাণ্ডেভিলা গার্ডেন ও আলিপুর রোডে ওঁদের শ্বশুরালয়।

কলকাতায় চার দিক থেকে বড় বড় রাজপথ এসে থমকে দাঁড়িয়েছে ডালহৌসীতে। এই সব পথ দিয়ে লক্ষ লক্ষ মানুষ আসছেন যাচ্ছেন। সবাই এদের দেখতে পাবেন। অনেকেই জানেন না এ পাড়ায় আসার কতকগুলো অদৃশ্য সুড়ঙ্গ-পথ আছে। এমনি এক সুড়ঙ্গপথ ধরেই ঘোষ সাহেব ডালহৌসী পাড়ায় আসেন।

অসীম ঘোষ বছর চারেক বিদ্যাসাগর কলেজে যাতায়াত করেও যখন ইণ্টারমিডিয়েটের একটা সার্টিফিকেট যোগাড় করতে পারলেন না, তখন আর সন্দেহ রইল না শিক্ষা-ব্যবস্থার আমূল সংস্কার প্রয়োজন। ঘোষসাহেবের বাবা অত্যন্ত সাধারণ মানুষ হয়েও একটা অসাধারণ কাজ করেছিলেন। কলকাতা পুলিসের এক দারোগার সঙ্গে একমাত্র কন্যার বিয়ে দিয়েছিলেন। কলেজ ছেড়ে দারোগা জামাইবাবুর সৌজন্যে ঘোষসাহেব রোজ গড়ের মাঠে ফুটবল খেলা দেখতে শুরু করলেন। দেখতে দেখতে এল ডিসেম্বর। এল টেস্ট খেলার মরশুম। একটা টিকিটের জন্য কলকাতার মানুষ পাগল হয়ে উঠল। হাজার হোক হেস্টিংস থানার দারোগাবাবুর শালা। ডুপ্লিকেট নাম্বারের বেশ কয়েকটা টিকিট অসীম ঘোষের পকেটে এল। অদৃষ্টের এমনই

যোগাযোগ যে ঠিক এই সময়ই বিদ্যাসাগর কলেজের পুরানো বন্ধু শ্যাম জালানের সঙ্গে এসপ্লানেডের মোড়ে দেখা। 'আরে শ্যাম! তুই?'

'কি খবর রে অসীম? তুই এখানেই আছিস?'

অসীম হাসে। 'আর কোথায় যাব?'

'কি করছিস?'

'সিনেমা দেখছি, খেলা দেখছি আর এই এসপ্লানেড-ধর্মতলায় ঘুরে বেড়াই।'

শ্যাম ঠিক বিশ্বাস করে না। 'বাজে কথা রাখ। বল কি করছিস?'

'সত্যি কিছু করছি না। তুই কি করছিস?'

'বাপের তো টাকা নেই যে বিজনেস করব, তাই চাকরি করছি।'

দুই বন্ধুতে কে. সি. দাশের দোকানে ঢুকল। শ্যামই চারটে করে রসগোল্লা দিতে বলল।

অসীম জিজ্ঞাসা করল, 'কোথায় চাকরি করছিস?'

'কোথায় আবার? এক মাড়োয়ারী ফার্মে।'

'তা অমন করে বলছিস কেন?'

'আরে দূর! এসব অফিসে চাকরি করার অনেক ঝামেলা। ওয়েস্ট বেঙ্গল গভর্নমেণ্টের কমার্শিয়াল ট্যাক্স অফিসে ঢোকার অনেক চেষ্টা করলাম, কিন্তু হল না।'

'কেন?'

শ্যাম হাসল। 'নামের শেষে যে জালান। তিন পুরুষ কুমরটুলিতে কাটিয়েও বাঙালী হতে পারলাম না।'

অসীম একটা রসগোল্লা মুখে দিতে গিয়েও থামল। একটু চুপ করে রইল। তারপর জিজ্ঞাসা করল, 'ওখানে চাকরি হল না কেন?'

'রিটন্ টেস্টে খুব ভাল পোজিশন ছিল আমার, কিন্তু ইণ্টারভিউতে সিলেকটেড হলাম না।'

'এখন যে চাকরি করছিস তাতে বুঝি খুব ঝামেলা?'

'আসল অফিসের কাজের চাইতে ফালতু ঝামেলাই বেশী।' শ্যাম একটু জল খায়। 'খোদ বড়কর্তার ছোটছেলের সঙ্গে আমি এ্যাটাচেড্। এক নম্বরের ফাজিল বখাটে ছেলে। ওর খামখেয়ালীপনার তাল সামলাতে সামলাতে আমার প্রাণ বেরিয়ে যায়।'

অসীম হাসে। 'বড়লোকের ননীগোপাল একটু আদুরে, একটু খামখেয়ালী না হলে মানায় নাকি?'

রাগে, দুঃখেও শ্যাম হাসে। 'জানিস এখন কি ঝামেলায় পড়েছি?'

'কি হয়েছে?'

'ছোটসাহেবকে টেস্ট ম্যাচের তিনটে সীজন টিকিট যোগাড় করে দিতে হবে।'

'তাই নাকি?'

'আমি কোথায় টেস্ট ম্যাচের টিকিট পাব বল তো ? কিন্তু না যোগাড় করে দিলে তো চাকরি করতে পারব না।'

অসীম হাসতে হাসতে বলল, 'তোর ছোটসাহেবকে বল আমাকে গ্রান্ড-গ্রেট ইস্টার্নে ডিনার খাইয়ে ক্যাবারে দেখাতে; তিনটে কেন, পাঁচটা টিকিট দিয়ে দেব।'

শ্যাম লাফ দিয়ে উঠল, 'সত্যি দিতে পারবি ?'

'ডিনার খাইয়ে ক্যাবারে দেখালেই দিতে পারব।'

তবু শ্যাম বিশ্বাস করতে পারে না। 'সিরিয়াসলি বলছিস তো ? নাকি ফাজলামী করছিস ?'

অসীম সঙ্গে সঙ্গে প্যান্টের হিপ পকেট থেকে টিকিট বের করে বলল, 'দুটো তো পকেটেই আছে।'

'মাই গড !'

'ডিনার আর ক্যাবারের ডেট এ্যান্ড টাইম ঠিক করে খবর দিতে ভুলিস না।'

শ্যাম স্বস্তির নিশ্বাস ছেড়ে ফিস ফিস করে জিজ্ঞাসা করল, 'ছোট সাহেবের সঙ্গে সত্যি একটা ইভনিং এনজয় করতে চাস ?'

'একশোবার চাই। তুই কি ভাবছিস আমি ইয়ার্কি করছি ?'

রুমাল দিয়ে মুখ মুছতে মুছতে শ্যাম বলল, 'ঠিক আছে। আমি কালই ছোটসাহেবকে বলে তোকে খবর দেব। তুই কিন্তু টিকিটগুলো হাতছাড়া করিস না।'

কে. সি. দাশের দোকান থেকে বেরুবার আগেই অসীমের ঠিকানা লিখে নিল।

তারপর দোকান থেকে বেরুবার সময় শ্যাম বলে দিল, 'তুই যে আমার বন্ধু একথা যেন ছোটসাহেব না জানে। বলবি শুধু পরিচয় আছে।'

*　　*　　*

সেদিন বুধবার।

অনেক দিন আগেকার কথা। প্রায় দশ বছর হতে চলল, কিন্তু এখনও ঘোষসাহেবের সব স্পষ্ট মনে আছে। এখনও মাঝে মাঝে বুধবার এলেই মনটা উড়ে যায়।

তখন অসীম ঘোষ শুধু অসীম ছিল। মিঃ ঘোষ বা ঘোষসাহেব হয় নি। কোন স্যুট ছিল না। একটা ভাল প্যান্ট আর বুশ-শার্ট পরেই বেরুল। দিদিকে বলে গেল এক বন্ধুর বাড়ি যাচ্ছে। বেশী দেরী হলে রাত্রে আর ফিরবে না। পৌনে সাতটার মধ্যেই কে. সি. দাশের দোকানের সামনে এসে দাঁড়াল। একটা সিগারেট ধরাল। সিগারেট শেষ হতে হতেই শ্যাম এসে হাজির। 'এসেছিস তাহলে।'

চমকে ওঠে অসীম, 'কেন রে ! প্রোগ্রাম ক্যানসেল হল নাকি ?'

অসীমের একটা হাত ধরে টানতে টানতে শ্যাম বলল, 'চল, চল। ছোট-

সাহেব তোর জন্য ভিক্টোরিয়ার ওখানে অপেক্ষা করছে।'

রেলওয়ে বুকিং অফিসের সামনে গাড়ি পার্ক করা ছিল। গাড়ির দিকে হাঁটতে হাঁটতে শ্যাম বলল, 'যদি ভাল করে ছোট সাহেবকে ভজাতে পারিস, তাহলে তোর ভাগ্য খুলে যাবে।'

'ভাগ্য খুলে যাবে মানে ?'

'মানে আর কি ! একটা ভাল চাকরি পেতে পারিস।'

'উনি দিতে পারেন, তাই না ?'

'দিতে পারেন মানে ?' শ্যাম হাসে। 'আমার এই ছোটসাহেবই চারটে পেপার মিলের সর্বময় কর্তা। যে কোন মুহূর্তে তোকে হাজার টাকার চাকরি দিতে পারেন।'

শ্যাম অবাক হয়। ডালহৌসী পাড়ার বড় বিজনেসম্যান বা ইণ্ডাস্ট্রিয়া-লিস্টের সম্পর্কে তো কোন ধারণা নেই। 'বলিস কি রে !'

'তবে তুই কি ভেবেছিস ? ধর্মতলার একটা দোকানদার ?'

'তা ভাবব কেন ? কিন্তু তুই যে বললি তোর ছোটসাহেব বখাটে ছোকরা !'

'বখাটে ছোকরা হলে কি হয়, বিজনেস ওদের রক্তে।'

'তোর ছোটসাহেবের নাম কি ?'

'শম্ভুনাথ সোমানী।'

'বয়স কত ?'

'পঁচিশ-ছাব্বিশ হবে।'

'বাংলা জানেন তো ?'

'আমাদের মতনই বাংলা জানেন।'

'তাহলে এখানেই পড়াশুনা করেছেন ?'

'হ্যাঁ, স্কটিশের ছাত্র।'

'বি. এ. পাস করেছেন, নাকি আমারই মত ব্রিলিয়াণ্ট ?'

শ্যাম হাসে। 'ইকনমিক্সে অনার্স নিয়ে পাস করেছেন।'

'ড্রিঙ্ক করেন নাকি ?'

শ্যাম আবার হাসে। 'শুধু ড্রিঙ্ক ?'

'আমাকে নিয়ে আবার সোনাগাছি যাবে না তো ?'

শ্যাম অসীমের পিঠে একটা চড় মেরে বলল, 'তুই একটা ইডিয়ট। ওরে এরা সোনাগাছি যাবার মাল না। এরা কারুর কাছে যায় না, এদের কাছেই মেয়েরা আসে।'

'খোকা বিয়ে করে নি ?'

'বিয়ে হয়েছে তো আঠারো বছর বয়সে। একটা চার বছরের ছেলেও আছে।'

'তাতেও পেট ভরে-না ?'

'সন্ধেবেলায় এরা বৌয়ের কাছে যেতে পারে না।'

রেড রোড দিয়ে ভিক্টোরিয়ায় পৌঁছতে বোধহয় দু'মিনিটের বেশী সময় লাগল না। শ্যাম আলাপ করিয়ে দিল, 'স্যার, ইনিই মিঃ অসীম ঘোষ।'

সঙ্গে সঙ্গে ছোটসাহেব বললেন, 'আমি শম্ভু সোমানী। আমার সঙ্গে শ্যামের পরিচয় না থাকলে আমি কি বিপদেই পড়তাম।'

'না না বিপদে পড়বেন কেন?'

ছোটসাহেব হাসলেন, 'এমনি তো কত লোককে চিনি, কিন্তু টেস্ট ম্যাচের টিকিটের বেলায় কেউ আর চিনতে পারে না।'

শ্যাম আর অসীম হাসে।

ছোটসাহেব আবার বললেন, 'আমার বড়দা সি-এ-বি'র মেম্বার, কিন্তু ইনকাম ট্যাক্স অফিসারদের খুশী করার পর আর ওর কাছে টিকিট থাকে না।'

ছোটসাহেব পকেট থেকে স্টেট এক্সপ্রেসের প্যাকেট বের করে এগিয়ে ধরলেন, 'নিন।'

অসীম একটা সিগারেট তুলে নিল। ছোটসাহেবও একটা সিগারেট নিয়ে লাইটার জ্বাললেন। 'বলুন মিঃ ঘোষ, কোথায় যাবেন?'

'যেখানে খুশী চলুন!'

'আপনি যদি চান গ্রাণ্ড-গ্রেট ইস্টার্নে যেতে পারি; নয়তো আমার নিজেরই একটা ছোট্ট জায়গা আছে।' ছোটসাহেব সিগারেটে একটা টান দিয়ে বললেন, 'জানেন তো আমাদের সমাজ ভীষণ কনজারভেটিভ। অথচ এ যুগে বিজনেস-টিজনেস করতে হলে অত কনজারভেটিভ হলে চলে না।...'

'তা তো বটেই।'

ছোটসাহেব অসীমের কানের কাছে মুখ নিয়ে বললেন, 'আমার ঐ ছোট্ট এ্যাপার্টমেন্টেই চলুন। ইফ ইউ উইস আই উইল এ্যারেঞ্জ এভরিথিং।'

'চলুন।'

শ্যাম চলে গেল। ছোটসাহেব আর অসীম গাড়িতে থিয়েটার রোডের দিকে রওনা হয়।

থিয়েটার রোড ধরে বেশ খানিকটা যাবার পর গাড়িটা ঘুরল। একে আবছা আলো, তারপর এত স্পীডে টার্ন নিল যে অসীম ঠিক রাস্তাটা চিনতে পারল না। একটা তিনতলা বাড়ির সামনে গাড়ি থামল। ড্রাইভার ঝড়ের বেগে নেমে এসে দরজা খুলে দিতেই ছোটসাহেব নামলেন। 'আসুন।'

অসীম নেমে ছোটসাহেবকে অনুসরণ করে সিঁড়ি দিয়ে উপরে উঠল। তিন তলায়। ছোটসাহেব বেল বাজাতেই দরজার ম্যাজিক আই দিয়ে কে যেন দেখলেন। সঙ্গে সঙ্গেই দরজা খুলে গেল। মেয়েটিকে দেখে অসীম চমকে উঠল। ল্যাণ্ডিংয়ের আলোকে ম্লান করে যেন পূর্ণিমার চাঁদের আলোয় ভরে গেল।

ছোটসাহেব একটু পিছনে ফিরে বললেন, 'আসুন মিঃ ঘোষ।'

বাইরে থেকে বোঝা যায় না ফ্ল্যাটের ভিতরটা এত সুন্দর। পর পর দুটো লিভিংরুম। একটা ছোট, একটা বড়। বড় লিভিংরুমের চার ধারে

টিক উডের প্যানেল। বড় বড় দুটো সোফা সেট। ওয়াল টু ওয়াল কার্পেট। লম্বা বড় দেওয়ালে দুটো জয়পুরী পেণ্টিং। এক কোণায় একটা রেডিওগ্রাম। দুটো লিভিংরুমের পরে দুটো বেডরুম। মাঝারি সাইজের হলেও দুটো বেডরুমেই ডবল বেডের খাট। ফোমড্ রাবারের গদী। একটা করে ওয়াড্রব আর ড্রেসিং টেবিল। এছাড়া কিচেন, স্টোর, ডাইনিং স্পেস। স্টোরের পাশে একটা দরজা। ওদিকে সারভেণ্টস কোয়ার্টার।

'মিঃ ঘোষ, দিস ইজ মাই স্মল পার্সোন্যাল কিংডম।'

'কিন্তু ভারী সুন্দর।'

'আপনার ভাল লেগেছে ?'

'ভাল লাগবে না ?'

ফ্ল্যাটটা ঘুরে বড় লিভিংরুমে ঢুকতেই ছোটসাহেব আলাপ করিয়ে দিলেন অভিসারিকার সঙ্গে, 'আর এ হচ্ছে ময়না।'

ময়না হাতজোড় করে বলল, 'নমস্কার।'

অসীম হাতজোড় করে নমস্কার করল না। শুধু বলল, 'বাঃ! ভারী সুন্দর আপনার নাম তো।'

ময়না হাসল।

ছোটসাহেব বললেন, 'শুধু নামটাই সুন্দর ?'

সেদিন না জানলেও ছোটসাহেবের কৃপায় ওদের পেপার মিলস ডিভিশনে সেলসম্যানের চাকরি পাবার পর ঘোষসাহেব জানলেন, ময়না ওদেরই অফিসের পার্সোনেল সেক্সনে কাজ করে। এই ময়নাই এখন মিসেস ঘোষ। বিয়ের আগে অসীম ঘোষ ছোটসাহেবের কাছে গিয়েছিল, 'স্যার একটা ব্যক্তিগত কথা ছিল।'

'বসুন বসুন। আগে বলুন কেমন আছেন ?'

'ভালই আছি।'

'কফি খাবেন ?'

'তা খেতে পারি।'

ছোটসাহেব বেল বাজাতেই বেয়ারা এল।

'দুটো কফি দাও।' ছোটসাহেব সিগারেট কেস এগিয়ে ধরে বললেন, 'নিন।'

'থাক স্যার।'

'নিন, নিন। ইউ আর নট ওনলি এ্যান এমপ্লয়ী বাট অলসো এ ফ্রেণ্ড।'

দুজনেই সিগারেট ধরালেন। ছোটসাহেব একটা লম্বা টান দিয়ে বললেন, 'বলুন কি বলবেন।'

মুখ নীচু করে অসীম ঘোষ বলল, 'কিছু মনে করবেন না তো স্যার ?'

ছোটসাহেব হাসলেন। 'কিচ্ছু মনে করব না। বলুন।'

'স্যার, ভাবছি ময়নাকে বিয়ে করব!'

ছোটসাহেব চমকে উঠলেন, 'ময়নাকে বিয়ে করবেন ?'

'মানে স্যার আপনি অনুমতি দিলে '

ভ্রু কুঁচকে ছোটসাহেব প্রশ্ন করলেন, 'আর ইউ রিয়েলি সিরিয়াস ?'

'হ্যাঁ স্যার।'

'আই সাপোজ ময়না অলসো ?'

'হ্যাঁ স্যার।'

'সত্যি সত্যি বিয়ে করবেন নাকি কিছুদিন স্ফূর্তি করে ছেড়ে দেবেন ?'

'না স্যার, সত্যি বিয়ে করব।'

'ময়নাকে স্ত্রীর মর্যাদা দিতে পারবেন ?'

'পারব স্যার।'

কফি এল। দুজনে কফি খেলেন, কিন্তু কেউ একটি কথা বললেন না। কফির পেয়ালায় শেষ চুমুক দিয়ে ছোটসাহেব বললেন, 'আপনি আর ময়না আজ সন্ধ্যার পর আমার ঐ ফ্ল্যাটে আসবেন। কথা বলব।'

সে এক অবিস্মরণীয় সন্ধ্যা। এই ফ্ল্যাটে অসীম ঘোষ আগেও এসেছে। একবার নয়, একাধিকবার। দিনের আলোয় নয়, সন্ধ্যার অন্ধকারে। ছোটসাহেবের আনন্দ-যজ্ঞের আমন্ত্রণে। সে-সব স্মৃতি আস্তে আস্তে ম্লান হয়ে গেছে, ঝাপসা হয়ে গেছে মিঃ ঘোষের, কিন্তু কোনদিনের জন্য হারিয়ে যাবে না ঐ একটি সন্ধ্যার স্মৃতি। ইতিহাস। কাহিনী।

সিগরেটটা নিয়ে নাড়াচাড়া করতে করতে ছোটসাহেব আপন মনে প্রশ্ন করলেন, 'আপনি জানেন মিঃ ঘোষ, কেন আমি ময়নাকে এখানে নিয়ে আসতাম ?'

'না স্যার।'

'ময়না কিছু বলে নি ?'

'আপনাদের সমস্ত ফ্যামিলীর ও খুব প্রশংসা করেছে আর বলেছে আপনি ওকে ভীষণ স্নেহ করেন।'

ছোটসাহেব একটু হাসলেন। ময়না একটু দূরেই বসে আছে কিন্তু ওর দিকে না তাকিয়েই ছোটসাহেব বললেন, 'স্নেহ করি না, ভালবাসি।'

কথাটা শুনেই মিঃ ঘোষের মুখখানা একেবারে ফ্যাকাশে বিবর্ণ হয়ে গেল।

'ভয় পাবেন না মিঃ ঘোষ। তবে আপনি যখন ময়নাকে বিয়ে করতে চান তখন আমার আর ময়নার ইতিহাসটা আপনার জানা উচিত।' ছোট-সাহেব হঠাৎ মুখ তুলে ময়নার দিকে তাকিয়ে বললেন, 'তাই না ময়না ?'

ময়না চুপ করে রইল।

'অনেক কাল আগেকার কথা। তখন আমরা মহাজাতি সদনের পাশে থাকি। ময়নার বাবা ছিলেন আমাদের প্রাইভেট টিউটর। আমরা তিন ভাই-ই ওর কাছে পড়েছি। ...'

'তাই নাকি ?'

'হ্যাঁ। মাস্টারমশাইকে আমার বাবা-মা বরাবরই ভীষণ ভক্তি করেন। ওদের ধারণা মাস্টারমশাই আমাদের বাড়িতে আসা শুরু করার পর থেকেই

আমাদের ফ্যামিলীর উন্নতি। তাছাড়া সৎ ব্রাহ্মণ বলে প্রত্যেক তিথি-পার্বণের দিন মাস্টারমশাইকে কিছু ফল-মিষ্টি দিয়ে প্রণাম করতেন। তারপর খুব ভালভাবে এন্ এস-সি পাশ করার পর হৃষীদা বিলেত গেলেন।'

অসীম ঘোষ জিজ্ঞাসা করেন, 'কে হৃষীদা ?'

ময়না বলল, 'আমার দাদা। ওদের টাকাতেই দাদা বিলেত যান।'

ছোটসাহেব তাড়াতাড়ি বললেন, 'টাকা মানে শুধু জাহাজ ভাড়াটা বাবা দিয়েছিলেন।'

ময়না আবার কথা বলে, 'আরো অনেক কিছু দিয়েছিলেন। জামা, কাপড়, স্যুট, জুতো '

ছোটসাহেব মাঝপথে বাধা দিলেন, 'হৃষীদা রওনা হবার আগে মা একদিন নেমন্তন্ন করে খাইয়ে সামান্য কিছু প্রেজেনটেশন দিয়েছিলেন আর কি !'

ময়না হাসল। অসীম ঘোষের বুঝতে কষ্ট হল না আরো অনেক কিছু করা হয়েছিল।

ছোটসাহেব আবার শুরু করলেন, 'মাস্টারমশায়ের জীবনে পর পর কতকগুলো বিপর্যয় ঘটে গেল। হৃষীদা বিলেতে গিয়ে লেখাপড়া না করে ইস্ট আফ্রিকার ক্রিশ্চিয়ান মেয়েকে বিয়ে করে চাকরি নিলেন, ছোটছেলে কলেজে পড়তে পড়তে অত্যন্ত বদ সংসর্গে পড়ে বাড়ি ছেড়ে চলে গেল আর সবশেষে ময়নার মা মারা গেলেন।'

ছোটসাহেব একটু থামলেন। আবার একটা সিগরেট ধরালেন। পর পর কয়েকটা টান দিয়ে পুরানো দিনের স্মৃতির আবৃত্তি করতে শুরু করলেন, 'ইতিমধ্যে আমার বড়দা বাবার সঙ্গে অফিসে যেতে শুরু করেছে, ছোড়দা ইউনিভার্সিটিতে পড়ে তখন আমি একলাই মাস্টারমশায়ের কাছে পড়ি। বাড়িতে একা থাকতে পারবে না বলে ময়নাকে নিয়েই মাস্টারমশাই রোজ আমাকে পড়াতে আসতেন। আমার সঙ্গে ওর দারুণ বন্ধুত্ব হয়ে গেল।'

অসীম ঘোষ ভাবতে পারেন নি এমন একটা বিচিত্র কাহিনী শুনবেন।

'তারপর ?'

তারপর সোমানী পরিবার আলিপুর রোডের নতুন বাড়িতে চলে গেলেন। ছোটসাহেব স্কটিশচার্চ কলেজে ভর্তি হলেন। মাস্টারমশাই আর ময়নার নিত্য আসা-যাওয়া বন্ধ হল কিন্তু শম্ভুনাথ সোমানীর সঙ্গে ময়নার মেলামেশা বন্ধ হল না। দু'বছর পর ময়না বেথুনে ভর্তি হলে ঘনিষ্ঠতা, ভালবাসা আরো নিবিড়, আরো গভীর হল।

ছোটসাহেবের মুখখানা কেমন বিষণ্ণ হয়ে উঠল। 'জানেন মিঃ ঘোষ, আমরা মডার্ন ইণ্ডাস্ট্রি গড়তে পারি কিন্তু সমাজ-সামাজিকতার ক্ষেত্রে আধুনিকতা সহ্য করতে পারি না। আমি ইচ্ছা করলে, জোর করলে, ময়নাকে বিয়ে করতে পারতাম কিন্তু আমাদের ফ্যামিলী মাড়োয়ারী সমাজে অস্পৃশ্য হয়ে যেতাম। তাছাড়া কত রকমের কেচ্ছা যে ছড়াত তার ঠিক-ঠিকানা নেই।'

ছোটসাহেব খুব জোরে একটা দীর্ঘনিশ্বাস ছাড়লেন। বিষণ্ণ করুণ মুখে

একটু আলতো করে হাসির রেখা ফুটিয়ে একবার ময়নার দিকে তাকিয়ে বললেন, 'অত্যন্ত সাধারণ মধ্যবিত্ত ঘরের মেয়ে হয়ে ও যা স্বার্থত্যাগ করেছে, তা কল্পনাতীত। এই মেয়েটা ইচ্ছা করলে কি না করতে পারত? আমার, আমাদের ফ্যামিলী আর ওর বাবার সম্মান রক্ষার জন্য নিজেকে সম্পূর্ণভাবে বঞ্চিত করে রাখল।'

ছোটসাহেব একটু থামলেন।

অসীম ঘোষও কিছুক্ষণ চুপ করে রইলেন। তারপর ময়নার দিকে তাকিয়ে জিজ্ঞাসা করলেন, 'আমাকে এসব বলনি কেন?'

'ভয় নেই। না জানিয়ে আমি বিয়ে করতাম না।'

'না, না, তা বলছি না।…'

ছোটসাহেব বললেন, 'ও অন্য ধাতু দিয়ে তৈরী। হাজার হোক মাস্টার-মশায়ের মেয়ে তো!'

অসীম ঘোষ বললেন, 'সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই। প্রথমে ওকে যত খারাপ ভেবেছিলাম, পরে দেখলাম ও ততটাই ভাল।'

ছোটসাহেব হাসলেন। 'মাস্টারমশাইকে আমরা পেন্সন গোছের কিছু একটা রেগুলার দিতে চেয়েছিলাম কিন্তু উনি কাজ না করে টাকা নিতে রাজী হলেন না। তখন ময়নাকে চাকরি দেওয়া হল। আর ঐ সামান্য মাইনের টাকার উপরে একটি টাকাও নেবে না।'

ময়নাকে একটু কাছে পাবার জন্য ছোটসাহেব এই ফ্ল্যাট নিলেন। বুড়ো বাবার জন্য ময়না রোজ আসতে পারে না। মাঝে মাঝে আসে। ছোটসাহেবের সঙ্গে গল্পগুজব করে। কোন কোনদিন একসঙ্গে খাওয়া-দাওয়া করে কিন্তু তার বেশি কিছু নয়। ময়না না এলেও ছোটসাহেব রোজ এখানে আসেন। দু এক পেগ হুইস্কী খান। হয়তো বিছানায় একটু গড়াগড়ি করেন। তারপর বাড়ি। ময়নাকে কাছে পেলে ছোটসাহেব কোনদিন ড্রিঙ্ক করেন না। করতে পারেন না। সাহসে কুলায় না।

ছোটসাহেব কি দিতে চান নি ময়নাকে?

'ময়না, আমার একটা কথা শুনবে?'

'সম্ভব হলে নিশ্চয়ই শুনব।'

'অসম্ভব কিছু বলব না।'

ময়না হাসে। 'তোমার মত কোটিপতির কাছে যা অত্যন্ত সাধারণ ব্যাপার, আমার মত গরীব মাস্টারের মেয়ের কাছে তা অসাধারণ বা অস্বাভাবিক হতে পারে বৈ কি।'

'ওসব কথা ছাড় তো।'

'আচ্ছা বল কি বলবে।'

'বলছিলাম তুমি মাস্টারমশাইকে নিয়ে এই ফ্ল্যাটে থাকো।'

হো হো করে হেসে ওঠে ময়না। 'তোমার মাথাটা একেবারে খারাপ হয়ে গেছে।'

পুরানো দিনের কথা বলতে বলতে কোথায় যেন তলিয়ে যান ছোটসাহেব। 'আমি মাঝে মাঝেই কাণ্ডজ্ঞানশূন্য হয়ে ওর কাছে যা তা আবদার করি, দাবী করি। কত কি দিতে চাই নিতে চাই, কিন্তু ময়না কোনদিনের জন্য নিজেকে হারিয়ে ফেলে নি।'

ছোটসাহেব হাসেন। 'জানেন মিঃ ঘোষ, আটটার পর ময়না এখানে আমাকে থাকতে দেয় না। জোর করে বাড়ি পাঠিয়ে দেয়।'

অসীম ঘোষ জিজ্ঞাসা করলেন, 'কেন ?'

অনেকক্ষণ চুপ করে থাকার পর ময়না হঠাৎ বলে উঠল, 'কেন মানে ? উনি বিয়ে করেন নি ? ওর স্ত্রী-পুত্র নেই যে আমি ওকে সারারাত আটকে রাখব ?'

অনেক, অনেক কথার পর ছোটসাহেব বললেন, 'আমি জানি মাস্টারমশাই ওর বিয়ের জন্য খুব ব্যস্ত হয়ে পড়েছেন। উনি আমাকেও কয়েকবার বলেছেন, কিন্তু হাতের কাছে ঠিক ভাল ছেলে পাইনি। ময়না কিছুকাল আগেই আপনার কথা আমাকে বলেছিল··'

'কবে ?'

'কয়েক মাস আগে। ও বলার পরেই আপনার কাজকর্ম সম্পর্কে একটু খোঁজখবর নিয়ে গত মাসে স্পেশ্যাল ইনক্রিমেণ্টটা দিলাম···'

ময়না হাসল। অসীম ঘোষ বিস্মিত হয়ে জিজ্ঞাসা করলেন, 'কিন্তু কেন দিলেন ?'

ছোটসাহেবও হাসলেন। 'যা মাইনে পাচ্ছিলেন তাতে তো বিয়ে করা যায় না। এখনও যা পাচ্ছেন তাও সাফিসিয়েণ্ট নয় কিন্তু ময়নাকে বিয়ের পর হঠাৎ প্রমোশন দিয়ে মাইনে বাড়িয়ে দিলে অফিসের অনেকেই সন্দেহ করতে পারতেন বলেই ··'

অসীম ঘোষ স্তম্ভিত হয়ে ছোটসাহেবের দুটো হাত জড়িয়ে ধরে বললেন, 'হোয়াট এ ম্যান ইউ আর স্যার !'

'এতে অবাক হবার কি আছে মিঃ ঘোষ। আমি যদি ময়নাকে সুখে রাখার জন্য কিছু না করি তাহলে আর কে করবে ?'

'কিন্তু —'

'এর মধ্যে কোন কিন্তু নেই মিঃ ঘোষ। ব্যবসা-ব্যাণিজ্যে জোচ্চুরি করাটা আমাদের ধর্ম। ওটা আমাদের রক্তের দোষ, কিন্তু ভুলে যাবেন না আমি সেণ্ট্রাল ক্যালকাটায় জন্মেছি, হেয়ার স্কুলে পড়েছি, স্কটিশে পড়েছি। আমিও আপনাদের মত মনে মনে শ্রীকান্ত হয়েছি, রাজলক্ষ্মীকে ভালবেসেছি।'

॥ তিন ॥

শুধু বলাই বিশ্বাস নয়, ডালহৌসী পাড়ার আরো বহু মানুষের জীবনই ঠিক সোজা রাস্তায় এগুতে পারল না। জোয়ারের জলে এগিয়ে গিয়েও ভাঁটার টানে পিছিয়ে পড়ছে কত মানুষ। বিরাট প্রশস্ত রাজপথ দিয়ে মাথা উঁচু করে এসে ডালহৌসী পাড়ার অজস্র অন্ধকার গহ্বরে হারিয়ে যাচ্ছে কত মানুষ। দিনের বেলায় অফিস হলেও এ পাড়ার অনেকেই সূর্যের আলোর আভাষটুকু পর্যন্ত দেখতে পান না। দিনের বেলাতেও অন্ধকার এদের ঘিরে রাখে।

'নমস্কার স্যার!'

নারীকণ্ঠ। তবু মুখ তুললেন না গণেশবাবু। সাদা প্যাডের ওপর ডট পেন দিয়ে টাকা-কড়ির যোগ-বিয়োগ করতে করতেই বললেন, 'বলুন।'

নারীকণ্ঠে কিছু শোনা গেল না। গণেশবাবুও আপন মনে যোগ-বিয়োগ করতে লাগলেন। কিছুক্ষণ পরে অঙ্ক করা হয়ে গেলে গণেশবাবু মুখ তুলে সামনের দিকে চাইলেন। মাঝারি বয়সী একজন মহিলা। দু'হাতে দু'গাছা শাঁখা। সিঁথিতে সিঁদুর স্বামীর গৌরব বহন করলেও স্ত্রীর সর্বাঙ্গে স্বামীর অকর্মণ্যতার ছাপ। হাতে একটা রেশন ব্যাগ। গণেশবাবু এক ঝলক দেখেই ভ্রূ কুঁচকে জিজ্ঞাসা করলেন, 'কি বিক্রী করতে এসেছেন?'

'স্যার কালি। লাল, কালো দুই রকমই আছে স্যার। আপনাদের তো অনেক কালি লাগে। একবার দয়া করে···'

'না, না, আমরা আজে-বাজে কালি ব্যবহার করি না।'

'আজেবাজে কালি না স্যার। একবার দয়া করে···'

এ ধরনের আবেদন নিবেদন শুনতে গণেশবাবু অভ্যস্ত। সারা দিন দু'চার জন মহিলার কাছ থেকে এসব অনুরোধ-উপরোধ শুনতেই হয়। দশটা-সাড়ে দশটার মধ্যে ডালহৌসী পাড়ার বাবুরা অফিসে পৌঁছে যান। এগারোটা-বারোটার পর থেকে এই সব মহিলারা অফিস পাড়ায় আসতে শুরু করেন। বোধহয় শত শত কয়েক হাজার। নানা রকমের, নানা বয়সের। কারুর হাতে রেশন ব্যাগ, কারুর হাতে প্ল্যাস্টিকের বড় ভ্যানিটি ব্যাগ। কেউ প্রৌঢ়া, কেউ যুবতী। কেউ সুন্দরী, কেউ কুৎসিত। কেউ বিবাহিতা, কেউ অরক্ষণীয়া। অথবা বিধবা। কেউ দীন দুঃখিনীর বেশ, কেউ মনোরমা। কিন্তু এদের সবার মধ্যেই একটা মিল আছে। সবার মুখেই একটা ব্যর্থতার গ্লানি, বুভুক্ষার ছাপ সুস্পষ্ট। গণেশবাবু বিন্দুমাত্র বিচলিত না হয়েই বললেন, 'মাপ করুন। কাজের সময় বিরক্ত করবেন না।'

গণেশবাবু আবার কাজ শুরু করলেন। ভদ্রমহিলা দু'এক মিনিট চুপ করে দাঁড়িয়ে থাকার পর আরেকবার অনুরোধ করলেন, 'স্যার, আপনারা দয়া

না করলে আমরা বাঁচি কেমন করে ?'

গণেশবাবু নিরুত্তর থাকায় ভদ্রমহিলা আস্তে আস্তে চলে গেলেন।

ব্রেবোর্ন রোডের মুখেই গণেশবাবুদের অফিস। মালিক অবাঙালী হলেও টাটা-বিড়লা-গোয়েঙ্কার মত নয়। এণ্টালী, লিলুয়া আর হাওড়ার তিনটি ছোট বড় কারখানার মালিক। ব্রেবোর্ন রোডে হেড অফিস। মালিকরা চার ভাই। তিন ভাই তিনটি কারখানায় বসেন। এক ভাই হেড অফিসে। কিন্তু একে প্রায়ই বাইরে যেতে হয়। কখনো দিল্লী বম্বে, কখনও আবার রাঁচীতে হিন্দুস্তান স্টিলের হেড অফিসে। দরকার হলে দুর্গাপুর ভিলাই রুরকেলাতেও দৌড়তে হয়। দরকার হলে অন্য কোন ভাই হেড অফিসে এলেও গণেশবাবুকেই প্রধানতঃ হেড অফিস সামলাতে হয়। উনি যে ম্যানেজার। অনেক বছর হল এখানে কাজ করছেন। আগে নিতান্তই একজন সাধারণ ক্লার্ক ছিলেন। আস্তে আস্তে মালিকদের বিশ্বাস অর্জন করে ম্যানেজার হয়েছেন। জয়েণ্ট চীফ কণ্ট্রোলার অফ্ ইমপোর্টস এ্যাণ্ড এক্সপোর্টস থেকে শুরু করে সেলস্ ট্যাক্স-ইনকাম ট্যাক্সের দৈনন্দিন কাজকর্ম দেখার জন্য লোক থাকলেও অফিসারদের প্রণামী দেবার দরকার হলেই ম্যানেজারবাবুকেই ছুটতে হয়। অফিসের কেউ কেউ বলাবলি করে যে অফিসারদের প্রণামী দিতে গিয়ে ম্যানেজারবাবুর অদৃষ্টেও কিছু জুটে যায়। হতে পারে, অস্বাভাবিক কিছু নয়। মালিকরা কিছু মনে করেন না। ঝামেলা মিটলেই ওরা খুশি। ম্যানেজারবাবুকে মালিকরা অত্যন্ত বিশ্বাস করেন। দু' নম্বর একাউণ্টের হিসাব-নিকাশ পর্যন্ত গণেশবাবু রাখেন। এসব দায়িত্ব পালন করার জন্য মাইনের উপরেও উনি একটা মোটা টাকা মালিকদের কাছ থেকে পান। অফিসের কেউ তা জানে না।

তিনখানা বড় বড় ঘর নিয়ে অফিস। দুটি ঘরে তিরিশ-চল্লিশজন লোক কাজ করেন। রাস্তার ধারের ঘরে চার মালিকের চারটি চেম্বার। চেম্বারের বাইরে ম্যানেজারবাবুর আসন আর দর্শনার্থীদের জন্য একটা সোফা সেট। ঐ দুটি ঘরের কর্মচারীরা সাধারণতঃ এ ঘরে আসেন না; দরকার হলে বা তলব করলে সবাই আসেন। তিন মালিকের চেম্বার সব সময়েই ফাঁকা পড়ে থাকে। কদাচিৎ কখনও ওরা কেউ আসেন। সেজন্য কোন গোপন বা জরুরী কাজ করতে হলে ম্যানেজারবাবু কোন একটা চেম্বারের মধ্যে বসে কাজ করেন। অফিসে সবার আগে এসে সবার পরে যান ম্যানেজারবাবু। রোজ।

গণেশবাবুর অনেক গুণ। বিশ্বাসী, পরিশ্রমী ও সর্বোপরি মিষ্টভাষী। কাউকে কখনো বকাবকি করেন না। খুব বেশি বিরক্ত হলে বলবেন, 'একটু চিন্তা-ভাবনা করে তো কাজ করবেন? এটা তো সরকারী অফিস নয় ঘোষবাবু!' ব্যস! ওতেই কাজ হয়। আর কিছু বলতে হয় না। গণেশবাবু বিশেষ সিগরেট খান না। কিন্তু খেতে হলেই ঐ দুটো ঘরে চলে যান। হাজার হোক মাড়োয়ারী মালিক তো! সিগরেট খাওয়া একেবারেই সহ্য করতে পারেন না। গণেশবাবু সিগরেট ধরিয়ে ওদিকের ঘরে পায়চারী করতে করতে এর-ওর

সঙ্গে গল্প করেন, 'কি হল শচীনদা, তোমার মুখে পান নেই যে ?'

শচীনবাবু কলম নামিয়ে বলেন, 'আর বোল না ভাই, দাঁতের ব্যথায় বড়ই কষ্ট পাচ্ছি।'

'দাঁতের আর কি দোষ ? অত পান খেলে কি দাঁত থাকে ?'

শচীনবাবু হাসেন।

'বৌদিকে খুশি করতে গিয়ে এমন পান খাওয়াই ধরলে যে…'

'কেন, তোমার বৌদি আসার আগে আমি পান খেতাম না ?'

'খেতে ঠিকই তবে একটা-দুটো।'

গণেশবাবুর সমর্থনে সঙ্গে সঙ্গে এগিয়ে আসেন মানিকবাবু, 'যাই বল শচীনদা ম্যানেজারবাবু ঠিকই বলছেন।'

সিজার্সে একটা লম্বা টান দিয়ে এগুতে এগুতে ম্যানেজারবাবু বললেন, 'যাই বল শচীনদা, তুমি বড্ড স্ত্রৈণ হয়ে গেছ।'

শচীনদাও ছেড়ে দেবার পাত্র না। 'আমি স্ত্রৈণ হচ্ছি বলেই তো তুমি রোজ বৌদির জন্য কিছু না কিনে বাড়ি যাও না।'

গুরুদাসবাবুর টেবিলের অ্যাশট্রেতে সিগরেটটা ফেলে দিতে দিতে গণেশবাবু বললেন, 'রোজ যদি দশ-বারো ঘণ্টা অফিসে কাটাতে হত তাহলে ঠেলাটা বুঝতে।'

এ অফিসের শুধু পুরানো কর্মচারীদের সঙ্গে নয়, অন্যান্যদের সঙ্গেও গণেশবাবুর যথেষ্ট হৃদ্যতা। 'আচ্ছা শৈবাল, তোমার বোনের বিয়ের তারিখ ঠিক হল ?'

'ঐ শ্রাবণেই দিতে হবে।'

'তার আগে বুঝি ছেলে ছুটি পাচ্ছে না ?'

'না।'

'বৃষ্টি-বাদলের মধ্যে ঐ সময় বিয়ে-থা দেওয়া বড়ই ঝামেলা।'

'গত বছর মাঘ-ফাল্গুন থেকে ব্যাপারটা ঝুলে আছে বলে বাবা আর দেরি করতে চান না।'

'সে তো বটেই।'

এসব ফার্মের নিয়ম-কানুনই আলাদা। এখানে কর্তার ইচ্ছায় কর্ম! কর্তার অনুপস্থিতিতে ম্যানেজারবাবুই সব। ছোটখাট ব্যাপারে অবশ্য কর্তারা মাথা ঘামান না। গণেশবাবুই সে-সব সামলে নেন।

অফিস পাড়ায় অফিসগুলোতে সারাদিন ধরে কত রকমের লোক আনাগোনা করেন। চাকরি আর ছোটখাট ব্যবসার আশাতেই বেশী লোক আসেন। এ ধরনের লোকজন চিরকালই অফিস পাড়ায় আসেন। দেশকালের অবস্থা যত খারাপ হচ্ছে, ডালহৌসীতে লোক আসা তত বাড়ছে। আগে এ পাড়ায় হেয়ার স্ট্রীটের টেলিফোন এক্সচেঞ্জে ছাড়া বাঙালী মেয়ে দেখা যেত না। এখন তো হাজারে হাজারে মেয়ে এখানে চাকরি করেন। রাইটার্স বিল্ডিংস-এর স্বপন রায় তো বলে, 'আরো দশ-বিশ বছর পরে এ পাড়ায় এত মেয়ে কাজ

করবে যে তখন পুরুষদের জন্য স্পেশ্যাল ট্রাম-বাস দিতে হবে। তা নয়তো মেয়েদের ভীড়ে আমরা ট্রামে-বাসে চড়তে পারব না।'

চঞ্চল হাসতে হাসতে জিজ্ঞাসা করে, 'শেষ পর্যন্ত আমরা বামীজদের মত হয়ে যাব না তো ?'

স্বপন সিগারেট টানতে টানতে বলে, 'কিছু আশ্চর্যের না। মেয়েরা অফিসপাড়ায় এসেছে, লুঙ্গিও ধরেছে। সুতরাং এককালে হয়তো আমরা চুরুট খেতে খেতে সংসার সামলাব।'

বড় বড় ফার্মের ব্যাপার আলাদা। ছোটখাট প্রাইভেট ফার্মে এখনও মেয়েরা বিশেষ সুবিধে করে উঠতে পারে নি। গণেশবাবুদের অফিসেও কোন মেয়ে নেই কিন্তু তাই বলে পুরোপুরি স্ত্রী-ভূমিকা বর্জিত নাটক অভিনয় করার দিন ডালহৌসীতে ফুরিয়েছে।

'স্যার !'

গণেশবাবু মুখ তুললেন। সুন্দরী না হলেও বেশ একটা আলগা শ্রী আছে। দেহের আঁটসাঁট বাঁধুনী দেখে মনে হয় বয়স এখনও তিরিশ হয় নি। বা বড় জোর দু'এক বছর বেশী হবে। সাদা খোলের সাধারণ তাঁতের শাড়ি। সাদা ব্লাউজ। চোখে কালো ফ্রেমের চশমা। 'বলুন।'

'আপনার সঙ্গে একটু কথা ছিল। কবে, কখন আসব বলুন ?'

'কি ব্যাপারে ?'

'আজ থাক। এখন আপনি কাজে ব্যস্ত। আপনি যখন ফ্রি থাকবেন তখন আসব।'

গণেশবাবু হাসলেন, 'ফ্রি ? ফ্রি হই তো রাত আটটা-সাড়ে আটটায়।'

মেয়েটি একটু হাসলেন। 'একটু আগে হয় না ?'

'পাঁচটা-সাড়ে পাঁচটার পরে যে-কোনদিন আসবেন।'

'কাল আসব ?'

'আসুন।'

দশটা থেকে পাঁচটা যে কিভাবে কেটে যায়, তা গণেশবাবু বুঝতেই পারেন না। এই সব কোম্পানীর ম্যানেজারকে কি না করতে হয় ? সাড়ে ন'টার সময়ই বড় মালিকের স্ত্রীর টেলিফোন, 'জনক রোডে একজন খুব ভাল জ্যোতিষী আছেন না ?'

'হ্যাঁ, হ্যাঁ আছেন।'

'নাম-ঠিকানাটা জানেন ?'

'একটু ধরুন। আমি দেখছি।' তাড়াতাড়ি আলমারী খুলে দু'তিনটে এ্যাড্রেস বুক ঘেঁটে বললেন, 'হ্যাঁ পেয়েছি।'

'ধরুন। আমি লিখে নিচ্ছি।'

গণেশবাবু টেলিফোন ধরে রইলেন।

একটু পরে বড় বহুজী রিসিভার তুললেন, 'বলুন।'

'অজিত রায়, ৩৯বি, জনক রোড।'

'থার্টিনাইন বী তো ?'

'হ্যাঁ।'

টেলিফোন নামিয়ে রাখতে না রাখতেই লিলুয়া ফ্যাক্টরী থেকে মেজ মালিকের টেলিফোন এল, 'গণেশবাবু, আজ কালকা মেলে দুটো এ-সি ব্যর্থ চাই।'

'খুব চেষ্টা করব স্যার। কিন্তু আজকের কালকা মেলে কি পাব ?'

'আরে দশ বিশ টাকা দিলেই হয়ে যাবে।'

'কার নামে বুক করব স্যার ?'

'আমাদের ফ্যাক্টরী ইন্সপেক্টরের শালা তার বৌকে নিয়ে দিল্লী যাবে। ওদের নাম তো জেনে নিই নি। তাছাড়া…'

'তাছাড়া ওদের নামে না বুক করাই ভাল স্যার। আমার নামে বুক করব স্যার ?'

'হ্যাঁ, হ্যাঁ সেই ভাল।'

এ ধরনের কাজ তো লেগেই আছে। তার উপর অফিসের কাজ।

প্রভিডেণ্ট ফাণ্ডের টাকা জমা দেওয়া হয় নি বলে প্রভিডেণ্ট ফাণ্ড কমিশনারের অফিস থেকে নোটিস এসেছে। আজই এই কাজটা করতে হবে। খুব গোপনে। ইউনিয়নের প্রেসিডেণ্ট অপোজিশন পার্টির এম. এল. এ.। একবার ওর কানে গেলে এমন বিচ্ছিরি হৈ-চৈ লাগিয়ে দেবেন যে বলার নয়। হয়তো বিধানসভা লোকসভা পর্যন্ত পেঁৗছে যাবে। প্রভিডেণ্ট ফাণ্ডের কাজ মিটতে মিটতে প্রায় তিনটে বেজে গেল। চা-টা খেতে খেতে হঠাৎ গণেশবাবুর খেয়াল হল, আজ তো ঐ ভদ্রমহিলা আসছেন। কেমন একটা প্রত্যাশায় মনটা ভরে উঠল। কিন্তু কিসের প্রত্যাশা ? ম্যানেজারবাবু তা জানেন না। শুধু এইটুকু জানেন নিরস লোহালক্কড়, কলকারখানা, লাইসেন্স পারমিট, হুকুম তাঁবেদারী থেকে অন্তত কয়েক মিনিটের জন্য মুক্তি। চুপ করে বসে থাকার উপায় নেই এ অফিসে। আবার কাজে মন দিলেন ম্যানেজারবাবু। তবু কাজের ফাঁকে ফাঁকে ঐ সুন্দর হাসি খুশী ভরা মুখখানা চোখের সামনে ভেসে উঠল মাঝে মাঝে।

'নমস্কার।'

মুখ তুলে তাকিয়েই গণেশবাবু হাসিমুখে অভ্যর্থনা করলেন, 'বসুন।'

ভদ্রমহিলা বসতে বসতে বললেন, 'ঘুরে ফিরে আসতে আসতে একটু দেরী হয়ে গেল।'

গণেশবাবু একবার হাতের ঘড়িটা দেখে বললেন, 'না না, দেরী কোথায় ? মাত্র তো পোনে ছ'টা বাজে।'

'আপনি বুঝি অনেকক্ষণ অফিসে থাকেন ?'

'মোটামুটি সাড়ে সাতটা আটটা পর্যন্ত থাকতেই হয়।'

'সেকি ?'

গণেশবাবু খুব দায়িত্বশীল গণ্যমান্য ব্যক্তির মত একটু হাসলেন। 'ভীষণ

কাজের চাপ। তাছাড়া এমন সব কনফিডেনসিয়্যাল কাজ-কর্ম থাকে যে অফিস ছুটি না হলে সে সব কাজে হাতই দিতে পারি না।'

'আমি আসার জন্য নিশ্চয়ই আপনার কাজের ক্ষতি . '

গণেশবাবু ওকে কথাটা শেষ করতে না দিয়েই বললেন, 'আজকে তেমন জরুরী কোন কাজ নেই। কফি খাবেন?'

'তা খেতে পারি।'

ম্যানেজারবাবু বেল বাজাতেই বেয়ারা এল। দুটো কফি আনতে বললেন।

হাতের ভ্যানিটি ব্যাগ কোলের উপর রাখতে রাখতে ভদ্রমহিলা বললেন, 'আমি কিন্তু একটু কাজে এসেছি আপনার কাছে।'

'অকাজে আর কে আসে বলুন?'

'কাজে মানে নিজের স্বার্থে।'

'এ দুনিয়ায় সবাই নিজের স্বার্থের পিছনে ছুটছে।'

ভদ্রমহিলা একটু হাসলেন।

কনুই দুটো টেবিলের উপর রেখে গণেশবাবু একটু ঝুঁকে বসলেন। 'আপনার নামটা তো জানলাম না।'

'আমার নাম মল্লিকা ঘোষ। বাকি ইতিহাস আস্তে আস্তে বলব।'

কফি এল। দুজনে কফি খেতে শুরু করলেন।

গণেশবাবু বললেন, 'কোন বিশেষ কারণ না থাকলে আপনাদের মত সুন্দরী, শিক্ষিতা, ইয়াং মেয়েরা যে ডালহৌসী পাড়ায় ঘুরে বেড়াবেন না, তা আমি বুঝি বৈকি।'

'তা তো বটেই।'

'দশ-বারো ঘণ্টা এই অফিসেই বসে থাকি। এক মিনিটের জন্য বাইরে বেরুবার অবসর পাই না, কিন্তু তবু কি কম দেখি না শুনি?'

মল্লিকা ঘোষ একটু হাসলেন। 'সত্যি এ পাড়ায় অনেক কিছু দেখার আছে, জানার আছে। আগে আমার কোন ধারণাই ছিল না যে এখানে এত কাণ্ড হয়।'

গণেশবাবুও হাসলেন।

মল্লিকা ঘোষ জিজ্ঞাসা করলে, 'হাসছেন যে?'

'কত দিন ধরে এ পাড়ায় আসা-যাওয়া করছেন?'

'এখনও এক বছর হয় নি।'

'আরো কিছুকাল কাটান তাহলে এ পাড়ার চেহারা জানতে পারবেন।'

কফি শেষ হল। গণেশবাবু একটা সিগরেট ধরালেন। 'এবার বলুন কি বলবেন।'

'ভূমিকা না করে আসল কথাটা আগে বলি। কি বলুন?'

'বলুন।'

'আপনাদের তো বিরাট কনসার্ন; আমি কিছু মালপত্তর সাপ্লাই দিয়ে মাসে মাসে দু'তিনশ' টাকা আয় করতে চাই।' মল্লিকা ঘোষ একটু থামলেন।

একবার, এক মুহূর্তের জন্য ম্যানেজারবাবুর দিকে তাকালেন। তারপর বললেন, 'খুব জরুরী দরকার।'

গণেশবাবু সিগরেট টানতে টানতেই ভাবলেন, 'জরুরী দরকার না হলে কি আপনি এভাবে অফিসে অফিসে ঘুরে বেড়ান?'

'আগে আগে অনেক অফিসে ঘুরতাম। আয়ও মন্দ হত না, কিন্তু এখন আর খুব বেশী অফিসে ঘুরতে চাই না।'

'কেন?'

মল্লিকা ঘোষ এক মুহূর্তের জন্য ভাবলেন। 'মানে মেয়ে বলে অনেকেই অনেক রকম এ্যাডভানটেজ নিতে চেষ্টা করেন।'

আক্ষেপ করেন গণেশবাবু, 'কি আশ্চর্য!'

'আপনি যদি একটু সাহায্য করেন তাহলে...'

'আমাদের এসব অফিস থেকে দুচার শ'টাকা আয় করা কিছুই না, তবে আপনি কি ধরনের জিনিসপত্র সাপ্লাই দিতে পারবেন তার উপর সব কিছু নির্ভর করছে।'

'সাধারণতঃ স্টেশনারী জিনিসপত্রই সাপ্লাই দিই।'

'কিন্তু সব রকম স্টেশনারী কি সাপ্লাই দিতে পারবেন?'

'হ্যাঁ তা পারব।'

ম্যানেজারবাবু হেসে ফেলেন। 'স্টেশনারী মানে দু'চারটে খাতা পেন্সিল আর কিছু কাগজ-কাল নয়।...'

'তবে?'

ম্যানেজারবাবু বেল বাজিয়ে বেয়ারাকে ডাকলেন। স্টোরবাবুর আলমারী খুলে নানা রকমের ছোট-বড় কিছু খাতা-পত্তর আর কয়েক রকমের খাম-কার্ড-প্যাড আনতে বললেন। একটু পরে বেয়ারা ওসব নিয়ে আসতেই গণেশবাবু একটা লম্বা ধরনের খাম তুলে বললেন, 'বেশী কিছু না, শুধু এই খাম সাপ্লাই দিলেই আপনি মাসে তিন-চারশ' টাকা আয় করতে পারবেন।'

মল্লিকা ঘোষ উল্লসিত হয়ে বললেন,'এসব আমি খুব সাপ্লাই দিতে পারব।'

গণেশবাবু হেসে বললেন, 'এ ধরনের খাম কিন্তু ক্যানিং স্ট্রীট-চীনেবাজারে কিনতে পারবেন না।'

'তাহলে?'

'দপ্তরীখানায় অর্ডার দিয়ে বানাতে হবে।'

'কোন দোকানেই পাব না?'

'না!'

'ঠিক আছে। দপ্তরীখানা থেকেই তৈরী করিয়ে দেব।'

'কিন্তু পারবেন কি?'

'না পারার কি আছে?'

'না পারার কিছু নেই, তবে ঠিক মত কাগজ কিনে ভাল জায়গায় তৈরী করতে দিতে হবে। কিছু ইনভেস্টমেন্টও লাগবে।'

মল্লিকা ঘোষের উৎসাহে ভাঁটা পড়ে। 'ইনভেষ্টমেণ্ট মানে কাগজ কেনার টাকা ?'

'কাগজ কেনা, দপ্তরীখানার চার্জ, আমাদের ফ্যাক্টরীতে ডেলিভারী দেওয়ার খরচ। '

'আপনারা কিছু এ্যাডভান্স দেবেন না ?'

'ভাল কথা, খামগুলো আবার ছাপিয়ে দিতে হবে।'

'এসব কিছুর জন্য এ্যাডভান্স দেবেন না ?'

'খুব জানাশুনা পুরানো সাপ্লায়ারদের কখনও কখনও এ্যাডভান্স দেওয়া হয় ঠিকই কিন্তু জেনারেলি মাল সাপ্লাই দেবার এক মাসের মধ্যে পেমেণ্ট দেওয়া হয়।'

মল্লিকা ঘোষ হাসতে হাসতে বললেন, 'তাহলে তো আমি মরে যাব।'

গণেশবাবুও হাসেন। 'মরে যাবেন কেন ? একটু আসা-যাওয়া রাখবেন। আস্তে আস্তে নিশ্চয়ই কিছু হবে।'

'কথা দিচ্ছেন তো ?' মল্লিকা ঘোষের গলায় একটু যেন আবদারের সুর।

গণেশবাবু আবার হাসেন। 'দেখুন না কি হয়। ব্যস্ত হচ্ছেন কেন ?'

সেই থেকে মল্লিকা ঘোষ মাঝে মাঝেই আসেন। অথবা টেলিফোন করেন. 'নমস্কার ! আমি মল্লিকা।'

'বলুন কেমন আছেন ?'

'কেমন আর থাকব ? এই মোটামুটি আছি আর কি ?'

'মোটামুটি কেন ? কাজকর্ম ভাল হচ্ছে না নাকি ?'

'কাজকর্মের কথা আর জানতে চাইবেন না !'

'কেন ? কি হল ?'

'এমন বিচ্ছিরি লোকদের কাছ থেকে কাজ নিতে হয় যে কি বলব !'

'কি ব্যাপার ?'

'আজকে একটা অফিস থেকে একশ' দশ টাকার একটা পেমেণ্ট পেলাম কিন্তু তার জন্য তিনটে সিনেমার টিকিট কেটে দিতে হল।'

'তাই নাকি ?'

'হ্যাঁ।'

'তাহলে এখানকার কাজ শুরু করলে আমাকেও সিনেমা দেখাবেন তো ?'

মল্লিকা ঘোষ একটু ঠাট্টা করেন, 'আপনাদের ওখানে পেমেণ্ট পেলে দেখাব না, বরং এখন দেখাতে পারি।'

'শেষকালে সিনেমা দেখে যদি কোন অর্ডার না দিই ?'

'অর্ডার পাবার জন্য তো সিনেমা দেখাব না।'

'সে-তো আরো ভাল কথা।'

দু'চারদিন পরে গণেশবাবু সত্যি মল্লিকা ঘোষের সঙ্গে সিনেমা দেখতে গেলেন। গ্লোবে ইভনিং শো। মল্লিকা ঘোষ কথামত নিউ মার্কেটের সামনে দাঁড়িয়ে ছিলেন। গণেশবাবু পৌঁছতেই দুজনে একসঙ্গে চলে গেলেন। কি-

একটা বাজে ছবি চলছিল। হল প্রায় ফাঁকাই ছিল। তাছাড়া ওদের পাশে, তিন টাকার সীটে, আশে-পাশে কেউ ছিল না বললেই চলে। মল্লিকা ঘোষের পাশে বসে সিনেমা দেখতে বেশ লাগছিল গণেশবাবুর। ফিস ফিস করে বললেন, 'আগে আমি ভীষণ সিনেমা দেখতাম।'

'তাই নাকি ?'

'হ্যাঁ।'

'আজকাল দেখেন না ?'

'বিশেষ সময় পাই না। তাছাড়া অফিসের কারুর সঙ্গে তো সিনেমা-থিয়েটারে যাওয়া ঠিক না।'

'বন্ধু-বান্ধব তো আছে ?'

'এক কালে ছিল। এখন আর কোথায় বন্ধু-বান্ধব !'

'তাহলেও তো মাঝে মাঝে দেখেন ?'

'একলা একলা কি সিনেমা-থিয়েটার দেখতে ইচ্ছে করে ?'

'ঠিক আছে। আমিই আপনাকে মাঝে মাঝে সিনেমা দেখাব।'

'আপনি আমাকে সিনেমা দেখাবেন আর আমি আপনাকে কি দেখাব ?'

'কি আবার দেখাবেন ?'

'তাই কি হয় ?'

'না হবার কি আছে ?'

'আপনি এত কষ্ট করে রোজগার করবেন আর আমি সেই পয়সায় সিনেমা দেখব ?'

সওয়া আটটা নাগাদ সিনেমা শেষ হয়ে গেল। হল থেকে বেরুতে বেরুতে গণেশবাবু জিজ্ঞাসা করলেন, 'একটু চা-টা খাবার টাইম আছে তো ?'

'আপনি খেলে খেতে পারি, নয়তো আমার জন্য দরকার নেই।'

'খাব তো দুজনেই। চলুন, চলুন।'

অতি সাধারণ, মামুলীভাবেই মল্লিকা ঘোষের সঙ্গে গণেশবাবুর পরিচয় আস্তে আস্তে গভীর হতে শুরু করল। সপ্তাহে এক দিনের বেশী দেখা না হলেও পাঁচটা-সাড়ে পাঁচটার পর ম্যানেজারবাবুর কাছে মল্লিকা ঘোষের টেলিফোন আসে মাঝে মাঝেই।

'একটা ছোট্ট কাজ আছে, করতে পারবেন ?'

মল্লিকা ঘোষ পালটা প্রশ্ন করেন, 'আমার মত কোটিপতির পক্ষে সে কাজ করা সম্ভব হবে তো ?'

ম্যানেজারবাবু হাসেন। 'আপনার দ্বারা বিজনেস-টিজনেস হবে না।'

'কেন ?'

'কাজের সময় আপনার পাত্তাই পাওয়া যায় না··'

'এখুনি আসব ?'

'আসতে পারবেন ?'

'আধ ঘণ্টার মধ্যে আসতে পারি।'

'আসুন। আমি আছি।'

আধ ঘণ্টা নয়, প্রায় ঘণ্টা খানেক পরে মল্লিকা ঘোষ এলেন। গণেশবাবু ওকে দেখেই বললেন, 'খুব টায়ার্ড মনে হচ্ছে?'

'হ্যাঁ। আজ সত্যি খুব টায়ার্ড।'

'তাহলে আজ না এলেই পারতেন।'

'না, তার জন্য কিছু হবে না।'

'এখন কি অনেক দূর থেকে আসছেন?'

'হাওড়া থেকে। সারাটা দিন ঘুরিয়ে তাও ভদ্রলোক কথা রাখলেন না।'

'অর্ডার পাবার কথা ছিল বুঝি?'

'পাঁচ হাজার খাম কিনে, ছাপিয়ে সাপ্লাই দিয়েছি এক মাসের উপর, কিন্তু এখনও টাকা দিচ্ছেন না।'

'সেকি?'

'আর বলবেন না। এর মধ্যে পাঁচ-ছ'দিন গিয়েছি। আজ সকালে টেলিফোন করে বললাম যে আমার ভীষণ টাকার দরকার··'

'তারপর?'

'আজ দু'বার হাওড়া গেলাম কিন্তু তবু কাজ হল না।'

'টাকা পেলেন না?'

'না।'

'কেন, কি বললেন?'

'বললেন, মালিক জরুরী কাজে আটকে পড়ায় ব্যাংক থেকে টাকা তুলতে পারেন নি।'

'ব্যাঙ্কে টাকা থাকলে তো তুলবে।'

মল্লিকা ঘোষ চুপ করে রইল!

গণেশবাবু বেয়ারাকে ডেকে দুটো কফি আর চারটে বড় বড় সন্দেশ আনতে দিলেন। বেয়ারা চলে যেতেই মল্লিকা ঘোষ বললেন, 'আপনার কাছে এলেই শুধু খাওয়া।'

'ওসব কথা ছাড়ুন। ওদের কাছে কত টাকা পাবেন?'

'তিনশ পঁচিশ টাকা।'

গণেশবাবু ড্রয়ার থেকে একশ টাকার দুটো নোট বের করে ওর দিকে এগিয়ে দিয়ে বললেন, 'রেখে দিন।'

টেবিলের উপর থেকে হাত তুলে নিয়ে মল্লিকা ঘোষ বললেন, 'না, না, আমার লাগবে না।'

'আজকে নিন। ওদের পেমেণ্ট পেলে দিয়ে দেবেন।'

'দরকার নেই। আপনি রেখে দিন।'

'এতে এত লজ্জার কি আছে? ব্যবসা-বাণিজ্যে টাকা আটকে পড়লে সবাইকেই নিতে হয়।

'তা হোক। আপনি রেখে দিন।'

গণেশবাবু একটু ভাবলেন। তারপর নীচের দিকের একটা ড্রয়ার থেকে ভাউচার লিখলেন। 'নিন, এবার সই করুন।'

মল্লিকা ঘোষ অবাক হন, 'তার মানে ?'

'আপনাকে যে কাজ দিচ্ছি, তার জন্য এ্যাডভান্স।'

মল্লিকা ঘোষ একবার বিস্ময়ের দৃষ্টিতে গণেশবাবুর দিকে তাকিয়ে জিজ্ঞাসা করলেন, 'সত্যি কাজ দেবেন তো ?'

'সই করুন।'

মল্লিকা ঘোষ ভাউচারে সই করে একশ টাকার দুটো নোট ব্যাগে রাখলেন। 'খুব উপকার হল।'

'ধন্যবাদ দেবেন নাকি।'

'সাহস নেই।'

'থ্যাংক ইউ !'

কফি এল, সন্দেশ এল। একটা সন্দেশ খেয়েই মল্লিকা মুখ নীচু করে কি যেন ভাবলেন। বোধহয় মিনিট খানেক। 'একটা অনুরোধ করব ?'

'করুন।'

'রাখবেন ?'

'রাখবার মত হলে নিশ্চয় রাখব।'

'আমাকে আপনি মল্লিকা বলেই ডাকবেন।'

গণেশবাবু একটু হেসে জিজ্ঞাসা করলেন, 'কেন ?'

'আজকের এই ঘটনার পর আপনার সঙ্গে বেশী দূরত্ব রাখা কি উচিত ? তাছাড়া আমি আপনার চাইতে অনেক ছোট।'

'এ পাড়ায় সবাই বড়, সবাই সমান।'

'আর সবাই সমান হোক কিন্তু আমি আপনার চাইতে ছোট। আপনি আমাকে তুমি বলবেন আর নাম ধরে ডাকবেন।'

গণেশবাবু হাসেন।

মল্লিকার গলায় একটু শাসনের সুর, 'হাসলে চলবে না। যা বলছি তা শুনতে হবে।'

গণেশবাবু মল্লিকার সই করা ভাউচারটা টুকরো টুকরো করে ছিঁড়ে ফেলে বললেন, 'ঠিক আছে, তোমার কথাই শুনব।'

এই পৃথিবীর সব মানুষের জীবনেই কিছু দৈন্য, কিছু দুঃখ, কিছু ব্যর্থতা, গ্লানি লুকিয়ে থাকে। সহজে কেউ এসব প্রকাশ করেন না। করতে পারেন না। কিন্তু যখন দৈন্য-দুঃখ গ্লানি-ব্যর্থতাকে দূরে সরিয়ে সামান্যতম পূর্ণতার স্বাদ পাওয়া যায়, তখন মানুষ আনন্দে অসংযত হয়ে পড়ে। মল্লিকা আর গণেশবাবুও আর লুকিয়ে রাখতে পারলেন না নিজেদের দুঃখের ইতিহাস, অপূর্ণতার কাহিনী।

শৈশবেই পিতৃমাতৃহীন হবার পর মামার কাছেই মল্লিকা থাকত ! মামা খুব ভালবাসতেন, কিন্তু মামী সুযোগ পেলেই বড় বেশী মারধোর করতেন।

তবু দিন কাটছিল। ক্লাস এইট থেকে নাইনে ওঠার পর পড়াশুনা বন্ধ হয়ে গেল। খুব শখ ছিল কলেজে পড়ার, কিন্তু হল না। আঠার থেকে উনিশে পড়তে না পড়তেই বিয়ে হয়ে গেল।

দেখে বোঝা যায় না মল্লিকা বিবাহিতা। হিন্দু বিবাহিতা মেয়ের পরিচয়-পত্র সিঁথিতে সিঁদুর, কোন দিন নজরে পড়েনি গণেশবাবুর। 'তোমার বিয়ে হয়েছে ?'

মল্লিকা একটু শুকনো হাসি হাসে। 'হয়েছিল।'

'তার মানে ?'

'বিয়ে হলেই কি সব মেয়ের অদৃষ্টে স্বামীর ঘর করার সৌভাগ্য হয় ? মল্লিকা উত্তর পাবার আশায় একবার গণেশবাবুর দিকে তাকায় কিন্তু উত্তর আসে না। তারপর নিজেই উত্তর দেয়, 'আমাদের দেশে ঝি-চাকরের মর্যাদা আছে কিন্তু গরীবের ঘরের মেয়ে শ্বশুরবাড়ি গেলে তাকে চোরের অধম হয়ে থাকতে হয়।'

'কার সঙ্গে তোমার বিয়ে হয়েছিল ?'

'তিনি সেণ্ট্রাল এক্সাইজের এক কনস্টেবলবাবু।' মল্লিকা হাসে। কনস্টেবলবাবু ঘুষের পয়সায় স্ফূর্তির ফোয়ারা করতেন আর আমি শাশুড়ীর কাছে নিত্য ঝাঁটা লাথি খেতাম।'

গণেশবাবু আর প্রশ্ন করেন না।

মল্লিকাই বলে যায় নিজের দুঃখের ইতিহাস। 'অশিক্ষিতের ঘরে পয়সা এলে যে কি অবস্থা হয় তা আপনি ভাবতে পারেন না। একদিন এক ননদের ঘড়ি হাতে দিয়ে সিনেমায় গিয়েছিলাম বলে শাশুড়ী যে কি মার মারলেন…'

মল্লিকা হঠাৎ থমকে দাঁড়াল। আর বলতে পারল না।

'তুমি স্বামীর কাছে থাকতে না ?'

'রাখলে তো থাকব ? মাঝে মাঝে ঘুষের জিনিসপত্র বাড়িতে রাখতে এলেই স্বামীকে দেখতাম।'

'একটা কনস্টেবলের সঙ্গে তোমার বিয়ে হল ?'

'বিয়ের আগে তো জানতাম সাব ইন্সপেক্টর।…'

'তাই নাকি ?'

'তবে কি ? বিয়ের আগে কটা ছেলের বাবা মা সত্যি কথা বলেন। তখন তো সবাই ন্যাকা ন্যাকা সাধু সাজেন।'

কিছুক্ষণ দুজনেই চুপচাপ বসে থাকেন। তারপর গণেশবাবু বললেন, 'এই ডালহৌসী পাড়ায় আসার পর যে কত মেয়ের দুঃখের ইতিহাস শুনলাম, তা কি বলব।' গণেশবাবুও একটু থামলেন। একবার মল্লিকার মুখের দিকে চাইলেন, 'তোমার শাশুড়ী স্বামীকে কিছু বলতেন না ?'

'সে তো দুদিনের জন্য এসে স্ফূর্তি করেই পালিয়ে যেত। তার সেই স্ফূর্তির ঠেলায় আজ আমাকে লোকের দরজায় দরজায় ঘুরতে হচ্ছে।'

'তোমার বাচ্চা আছে নাকি ?'

'আছে নাকি মানে? একটি নয়, তিনটি।'

'তাই নাকি?'

'বাচ্চাগুলো না থাকলে এইভাবে আপনাকে বিরক্ত করি?'

'যে মামা মল্লিকাকে সন্তান জ্ঞানে মানুষ করেছেন সে মামা মারা গেলেন। যে মামী ওকে অত্যাচার করতেন, সেই মামীই অত্যাচারিতা মল্লিকাকে আশ্রয় দিলেন। না দিয়ে উপায় ছিল না। মামার বড় ছেলে সেদিন অফিস থেকে ফেরার পথে মধ্যমগ্রামে দিদির বাড়ি গিয়েছিল—

'সেদিন মার খেতে খেতে আমি প্রায় অজ্ঞান হয়ে গিয়েছিলাম। ভাইমণি সে দৃশ্য দেখতে না পেরে সঙ্গে সঙ্গে বাড়ি গিয়েই মামীকে নিয়ে ছুটে এসে-ছিল। মামীর সঙ্গেই আমি তিনটে বাচ্চাকে নিয়ে চলে এলাম।'

'তোমার স্বামী তোমাকে নিতে আসেন নি?'

মল্লিকা হাসল। 'কনস্টেবলবাবু আবার বিয়ে করেছেন।'

'সেকি?'

'হ্যাঁ।'

'গভর্নমেণ্টে চাকরি করে দু'বার বিয়ে করেছেন?'

'ভাইমণি কেস করতে চেয়েছিল। আমিই বারণ করি। তাছাড়া মামীও বললেন, ও ছোটলোকদের সঙ্গে আর কোন যোগাযোগ রাখার দরকার নেই।'

ক'দিন পরে গণেশবাবু শচীনদাকে সব কথা বলে জিজ্ঞাসা করলেন, 'বল তো কি করা যায়?'

শচীন বললেন, 'ঐসব বয়সের মেয়েদের পক্ষে অফিসে অফিসে ঘুরে অর্ডার সাপ্লায়ের কাজ করা বিশেষ নিরাপদ নয়।'

'তা তো বটেই।'

'সব চাইতে ভাল হয় তুমি যদি ওকে একটা চাকরি দিতে পার।'

'কিন্তু কোথায় চাকরি দেব বল তো?'

'আমাদের এই অফিসেই একটা রিসেপসনিস্টের চাকরির ব্যবস্থা করতে পার না?'

'এ অফিসে কি কোন মেয়েকে নেবে?'

'এতকাল নেয় নি বলে যে কোন কালেই নেবে না, তার কি মানে আছে? তুমি একটু মালিকদের বল। আমার মনে হয় হতে পারে।'

'তাহলে বলছ একবার বলব?'

'বলতে দোষ কি?'

'কত মাইনের কথা বলব?'

'শ' আড়াইয়ের কম বল না।'

'ঠিক আছে আমি বলব, কিন্তু তুমিও একবার বল। আমরা দুজনে বললে বোধহয় মেজ মালিক না বলতে পারবেন না।'

'হ্যাঁ, হ্যাঁ, নিশ্চয়ই বলব।'

'তাছাড়া সত্যি একজন রিসেপসনিস্টের দরকার। এত লোকজন আসে

যে কোন কাজকর্ম করাই মুশকিল হয়।'

গণেশবাবু আর শচীনদার কথা মেজ মালিক অগ্রাহ্য করতে পারলেন না। শুধু বললেন, 'তবে বেশী অল্পবয়সী আনম্যারেড মেয়ে না রাখাই ভাল।'

শচীনদা সঙ্গে সঙ্গে বললেন, 'যে মেয়েটির জন্য আমরা বলছি তিনি ম্যারেড ও ছেলেমেয়ে আছে।'

মেজ মালিক জিজ্ঞাসা করলেন. 'লোকজনের সঙ্গে কথাবার্তা বলতে পারবেন তো ?'

ম্যানেজারবাবু বললেন. 'তা খুব পারবেন।'

'ঠিক আছে। তবে আড়াই শ'-তিনশ'র বেশী মাইনে দেবেন না।'

পরের সোমবার থেকে মল্লিকা ঘোষের নতুন জীবন শুরু হল। গণেশবাবু সবার সঙ্গে আলাপ করিয়ে দিলেন, 'এই হচ্ছেন শচীনদা। একে প্রণাম কর। এর জন্যই তোমার চাকরি হল।'

মল্লিকা প্রণাম করতেই শচীনদা চমকে উঠলেন। 'তুমি ম্যানেজার আর চাকরি দেবার মালিক আমি।'

'জান মল্লিকা, আমি ম্যানেজার হলেও শচীনদার আণ্ডারে।'

মল্লিকা হাসল।

গণেশবাবু এগিয়ে গেলেন। 'শৈবাল. তোমার মল্লিকাদিকে দেখো।'

শৈবাল হাসতে হাসতে বলল, 'আপনার আর শচীনদার জয়েণ্ট ক্যাণ্ডি-ডেটকে না দেখলে এ অফিসে চাকরি করতে পারব ?'

অফিস ছুটির পর মল্লিকা গণেশবাবুকে বলল, 'চলুন, আপনার বাড়ি যাব।'

'কেন ?'

'আপনাকে প্রণাম করে ধন্যবাদ জানাবার সাহস নেই, কিন্তু বৌদিকে তো একটা প্রণাম করে আসি।'

গণেশবাবু হাসলেন—'আমি তো মেসে থাকি।'

'সেকি ?'

'হ্যাঁ।'

'আর বৌদি ?'

'বৌ থাকলে কেউ মেসে থাকে ?'

'বৌদি নেই ?'

'না।'

'কতদিন হল বৌদি নেই ?'

গণেশবাবু আবার হাসলেন। মাথা নাড়তে নাড়তে বললেন, 'আমি বিয়ে করি নি।'

'আপনি বিয়ে করেন নি ?' বিস্ময়মুগ্ধ মল্লিকা প্রশ্ন করল।

'না।'

॥ চার ॥

ঘড়ির কাঁটার সঙ্গে সুর মিলিয়ে ডালহৌসীতে মানুষের আসা-যাওয়া হয় ঠিকই, কিন্তু এ পাড়ার বহু মানুষের জীবনেই সুর হারিয়ে গেছে। ছন্দপতন হয়েছে। স্বপ্ন ভেঙ্গে গেছে। মল্লিকা ঘোষের মত বহু দুঃখিনীকেই অন্ধকার অমাবস্যার রাত্রিতে ডালহৌসীতে আসতে হয়েছে একটু আলোর ইশারার প্রত্যাশায়। একটু মানুষের মত বাঁচার লোভে। দৈনন্দিন সমস্যার গ্লানি থেকে মুক্তি পাবার প্রচেষ্টায়। কিন্তু না। হয় না। অধিকাংশের ভাগ্যেই গণেশবাবু জোটে না। শচীনদা পাওয়া যায় না।

রোজ বিকেলবেলায় বেলগাছিয়ার লেডিস ট্রামের সামনের দিকের জানলার ধারের সীটে বসে বাসন্তীদি আপন মনে কত কি ভাবেন। ঠুং ঠুং ঘণ্টা বাজাতে বাজাতে ট্রামটা লালদীঘির চার পাশে চক্কর কাটে। বাসন্তীদির মনে পড়ে, এখন যেখানে ট্রামলাইন, তখন এখানেই সেই বেঞ্চিগুলো ছিল। কত মানুষ সেখানে বসে বিশ্রাম করত, গল্প করত। গল্প করত ওরাও। বাসন্তীদি আর অমিয়বাবু। কোনদিন ভোরবেলায়, কোনদিন সন্ধ্যার পাতলা অন্ধকারে। দূর থেকে ট্রাম-বাসের যাত্রীরা দেখত। ভাবত। কত কি ভাবত।

'আচ্ছা, যদি কেউ চেনাশুনা মানুষ দেখে; তাহলে কি ভাববে বল তো?'

অমিয়বাবু বাসন্তীদির একটা হাত নিজের হাতের মধ্যে নিয়ে বলতেন, 'যা ইচ্ছে তাই ভাবুক। আমরা তো আর কলেজ পালিয়ে প্রেম করতে আসি নি।'

'তবুও…'

অমিয়বাবু হাসেন। 'ক'দিন পরে যখন তোমার সিঁথিতে সিন্দুর পরিয়ে দেব তখনও বোধহয় তুমি ট্রাম-বাসের লোকজনের ভয়ে ঠিক হতে পারবে না।'

চব্বিশ-পঁচিশ বছর আগেকার ঘটনা। তবুও সব মনে আছে বাসন্তীদির। তখনও টেলিফোন ভবন তৈরী হয় নি। হেয়ার স্ট্রীটেই ট্রাঙ্ক এক্সচেঞ্জ ছিল। এখন তো সব এক্সচেঞ্জই এয়ার-কণ্ডিশনড্। আর তখন দর দর করে ঘামতে হত। অমিয়বাবু এক ফাঁকে রাউণ্ড দিতে এসে চট করে প্যাণ্টের পকেট থেকে রুমাল বের করে বাসন্তীদির মুখের গলার ঘাম মুছিয়ে দিতেন।

'তুমি যখন তখন আমার বোর্ডে আসবে না তো!'

'কেন?'

'আজ আর একটু হলেই জুলি দেখে ফেলত।'

'সো হোয়াট?'

'তুমি আমার মুখের ঘাম মুছিয়ে দেবে, আবার বলছ সো হোয়াট?'

কেমন যেন শিশুসুলভ একটু চাঞ্চল্য, উচ্ছলতা ছিল অমিয়বাবুর। বাসন্তীদি বকাবকি করলেও মনে মনে খুশি হত। ভাল লাগত। সবুজ,

সতেজ প্রাণের ছোঁয়া লাগত বাসন্তীদির মনে।

ট্রামটা চক্কর কেটে লালদীঘির উত্তরে, রাইটার্স বিল্ডিংসের সামনের স্টপেজে দাঁড়াল। বেশ কয়েক মিনিট। যখন টেলিফোন ভবন তৈরী হয় নি, ট্রাম লাইনও ডালহৌসীর সবুজের মেলা গ্রাস করে নি, তখন অফিস ছুটির পরে সন্ধ্যার দিকে এ দিকটা ভীষণ নির্জন থাকত। অমিয়বাবুর সঙ্গে বাসন্তীদির এদিকেরই একটা বেঞ্চিতে বসে প্রথম ভাল করে আলাপ হয়। ট্রামের মধ্যে বসে বসেই সেদিন সন্ধ্যার ছবিটা বাসন্তীদির চোখের সামনে ভেসে ওঠে।

'আসুন একটু বসা যাক।' হেয়ার স্ট্রীটের টেলিফোন অফিস থেকে বেরিয়ে ডালহৌসী স্কোয়ারটা অর্ধেক ঘোরার পর অমিয়বাবু অনুরোধ করলেন।

'বসলেই দেরি হয়ে যাবে।' অমিয়বাবুর অনুরোধে স্বীকৃতি জানাতে বোধহয় বাসন্তীদির লজ্জা করল।

'বসুন, বসুন। কিছু দেরি হবে না।' রুমাল দিয়ে বেঞ্চির ধুলো ঝাড়তে ঝাড়তে অমিয়বাবু বললেন। বসলেন।

একটু দূরে বসলেন বাসন্তীদিও। 'বলুন, কি বলবেন।'

'শুধু আমি কি বলব, তাই শুনতে এসেছেন?'

'আপনার কথাই তো শুনতে এলাম।'

'আপনার কিছু বলতে ইচ্ছে করছে না?'

বাসন্তীদি একটু হাসলেন। 'আমি আর কি বলব।'

'কিছু তো বলবেন।'

'আপনি বলুন, আমি শুনি।'

কখনও কখনও মুখোমুখি কথা হয়, চোখে চোখ পড়ে। সঙ্গে সঙ্গে বাসন্তীদি দৃষ্টিটা নামিয়ে নেন।

অমিয়বাবু হঠাৎ জিজ্ঞাসা করলেন, 'আপনার নাম বাসন্তী কে রেখেছিলেন?'

'আমার দাদু।'

'আপনার জন্ম কি বসন্তকালে?'

হাসি পায় বাসন্তীদির, 'কেন বলুন তো?'

'বলুন না বসন্তকালে আপনার জন্ম কিনা।'

'হ্যাঁ, ফাল্গুনেই আমার জন্ম।'

'আপনি বসন্তকালে না জন্মালেও দাদু আপনার নাম বাসন্তী রাখতেন।'

কথাটা শুনে মজা লাগে বাসন্তীদির। 'আপনি কি করে জানলেন?'

'হাজার হোক দাদু তো! অনেক অভিজ্ঞতা ছিল তাঁর।'

ভ্রূ কুঁচকে অমিয়বাবুর দিকে তাকিয়ে বাসন্তীদি জিজ্ঞাসা করলেন, 'তাতে কি হল?'

'আপনার দাদু জানতেন ।' অমিয়বাবু কথাটা শেষ করলেন না।

'কি হল। বলুন ?'

'আজ থাক। পরে বলব।'

'কেন আজ বললে কি হয়েছে ?'

'কিছুই হয় নি। · '

'তবে ?'

'আজ বোধহয় বলাটা উচিত হবে না।'

'কেন ?'

অমিয়বাবু একবার বাসন্তীদিকে ভাল করে দেখে একটু হাসেন। 'আজ বোধহয় সাহস পাচ্ছি না।'

বাসন্তীদি একটু জোরেই হাসেন। 'ভয় পান বলেই কি আমাকে ডেকে আনলেন ?'

'না ঠিক ভয় নয়, বোধহয় সঙ্কোচ হচ্ছে।'

ট্রাম ছেড়ে দিয়েছে। প্রথম দিনের সে ছবিটাও দূরে চলে গেল।

পরে, বেশ কিছুদিন পরে, যখন দুজনের সম্পর্ক বেশ ঘনিষ্ঠ হয়ে উঠেছে, তখন বাসন্তীদিই একদিন বললেন, 'রোজ তোমাকে একটা কথা জিজ্ঞাসা করব বলে ভাবি কিন্তু তোমার কাছে এসেই ভুলে যাই।'

'কোন্ কথা ?' ঝালমুড়ির ছোট্ট ঠোঙা থেকে বাসন্তীদির হাতে খানিকটা ঢেলে দিতে দিতে অমিয়বাবু জানতে চাইলেন।

'সেই যেদিন আমরা ডালহৌসি স্কোয়ারের মধ্যে প্রথম বেঞ্চিতে বসে গল্প করেছিলাম···'

'ঐ তো রাইটার্স বিল্ডিংয়ের সামনের দিকটায় তো ?'

'হ্যাঁ, হ্যাঁ। সেই সেদিন তুমি আমার বাসন্তী নাম রাখা সম্পর্কে কি যেন বলতে গিয়েও বল নি · '

ঠোঙাটা উল্টো করে শেষ কয়েকটা মুড়ি মুখের মধ্যে ঢেলে দিয়ে অমিয়বাবু গম্ভীর হয়ে বললেন, 'মনে পড়েছে।'

রুমাল দিয়ে মুখ মুছতে মুছতে বাসন্তীদি বললেন, 'হ্যাঁ বল তো ?'

অমিয়বাবু হাসতে হাসতে এক হাত দিয়ে বাসন্তীদির মুখখানা নিজের দিকে ঘুরিয়ে বললেন, 'বলতে চেয়েছিলাম যে দাদু জানতেন তুমি যার জীবনে আসবে, তার বসন্ত কোনদিন ফুরোবে না।'

'বাজে অসভ্যতা করো না।'

'এটা অসভ্যতা হল ?'

'তবে কি ? আমি কি অনন্ত যৌবনা উর্বশী যে আমার যৌবনে ভাঁটা পড়বে না ?'

নির্বিকার, উদার দার্শনিকের মত অমিয়বাবু বললেন, 'তোমার যৌবন চট করে ফুরোবে না। আর···'

'তার চাইতে বল আমি দিনে দিনে আরো কচি, আরো সুন্দরী হব।'

'আমারও তাই মনে হয় বাসন্তী।'

'তোমার আর কি কি মনে হয় বল তো ?'

'পরে বলব।'

'পরে আবার কবে ?'

'যেদিন আর মাঠে-ঘাটে বসে মনের কথা বলতে হবে না, সেদিন সব কথা বলব।'

সংসার ধর্ম কাজকর্মের চাপে সব সময় সে-সব দিনের কথা মনে পড়ে না, কিন্তু ট্রামে বসে ডালহৌসী স্কোয়ারে ঘুরতে আরম্ভ করলেই বর্তমান হারিয়ে যায়। বহু দূরের অতীত বাসন্তীদির মুখোমুখি এসে দাঁড়ায়।

ইণ্টারমিডিয়েট পাস করে দুটো বছর আড্ডা দিয়েই কেটে গেল বাসন্তীদির। হঠাৎ একদিন মায়াদি বললেন, 'আমাদের ট্রাঙ্ক এক্সচেঞ্জের পিকনিক হচ্ছে, তুই যাবি ?'

বাসন্তীদি বললেন, 'তোমাদের অফিসের পিকনিকে আমি যাব কেন ?'

'তাতে কিছু হবে না। অনেকেই বন্ধু-বান্ধব সঙ্গে নিয়ে যায়।'

'তুমি মাকে বলে দেখ।'

'আমি বললেই কাকীমা রাজী হবেন।'

বাসন্তীদির মা সত্যি আপত্তি করলেন না। 'হ্যাঁরে মায়া, কোন ভয়ের কিছু নেই তো ?'

মায়াদি হাসতে হাসতে বললেন, 'আমি তো আছি।'

'তাহলে যাক। কোথাও তো যায় না।'

'আসতে একটু দেরী হলে চিন্তা করবেন না।'

'কত দেরী হবে রে ?'

'এই সাতটা সাড়ে-সাতটা আর কি।'

'তার বেশী করিস না কিন্তু।'

এখন সব কিছু পালটে গেছে। এখন মেয়েরা যেখানে কাজ করে সেখানে পুরুষ ছেলে-ছোকরার আগমন হয় না বললেই চলে। এখন সুপারভাইজারও মেয়েরাই হয়! আগে হেয়ার স্ট্রীটের এক্সচেঞ্জে দু'চার জন এ্যাংলো-ইণ্ডিয়ান বুড়ী ছাড়া আর সব সুপারভাইজার ছেলেরাই ছিল। তাছাড়া এখন তো সব অটোমেটিক। ডায়াল ঘোরালেই কলকাতা-দিল্লী-বম্বে-মাদ্রাজ একাকার। আর তখন ? কর্ড টেনে টেনে একটা একটা গর্তে দিয়ে রিং দিতে দিতে মেয়ে অপারেটররা পাগল হয়ে যেত। কোন সময় সব বোর্ড ঠিক কাজ করত না। এঞ্জিনিয়ারিং সুপারভাইজাররা সব সময়েই অপারেটারদের পাশে পাশে কাজ করত। আর এ্যাসিসট্যাণ্ট এঞ্জিনিয়াররা তো প্রায় সৌদি আরবের রাজার মত মেয়েদের উপর প্রভুত্ব করতেন!

প্রত্যেক মাসেই পিকনিক হত। টেলিফোনের লরীতে চেপে একদল ছেলেমেয়ে চলে যেতেন কলকাতার আশে-পাশে কোন না কোন বড়লোকের বাগানবাড়িতে। সকাল থেকে সন্ধ্যা পর্যন্ত চলত খাওয়া-দাওয়া-হৈ-হুল্লোড়। হাসি-ঠাট্টা গান-বাজনা। অনেকে ঠাট্টা করে বলতেন, পিকনিক নয় তো

স্বয়ংবর সভা। ওরা ঠিকই বলতেন। এঞ্জিনিয়ারিং সুপারভাইজার আর এঞ্জিনিয়ারিং বাবুদের সতৃষ্ণ দৃষ্টির শিকার হতেন অপারেটাররা। না হয়ে উপায় ছিল না। পিকনিকে না গেলে মুখ কেউ কিছু বলতেন না। পিকনিকে না গেলে আট ঘণ্টা ডিউটি দেবার পরও অন্য অপারেটারের পাত্তা পাওয়া যেত না। একটানা ষোল ঘণ্টা কাজ করতে করতে কত দিন কত মেয়ে যে এক্সচেঞ্জের মধ্যেই অজ্ঞান হয়ে গেছেন, তার ঠিক ঠিকানা নেই। আরো কত রকমের দুর্ভোগ সহ্য করতে হত।

মায়াদি সব পিকনিকে যেতেন। সবার সঙ্গে মেলামেশা করতেন আর গান গাইতেন। সবাই ওর গান পছন্দ করতেন বলে ছোট-বড় সব অফিসারদের সঙ্গেই ওর খাতির ছিল। মিঃ মৈত্র ওকে যেদিনই সিনেমা দেখার অনুরোধ করতেন তখনই মায়াদি বলতেন, 'শনিবার তো আমার সময় হবে না।'

'কেন?'

'মিঃ সরকারের বাড়িতে একটু গান বাজনা হবে।'

'তুমি সরকার সাহেবের বাড়িতে গান গাইবে?'

'যেতে যখন বলেছেন তখন নিশ্চয়ই গাইতে হবে।'

দশবার অনুরোধ করলে মায়াদি একবার যেতেন। হাজার হোক এ্যাসিস-ট্যাণ্ট এঞ্জিনিয়ার। কতবার তার অনুরোধ উপেক্ষা করা যায়?

পিকনিক পার্টির সবাই বাসন্তী দেবীকে দেখে খুশী হলেন। মায়াদি সবার সঙ্গে আলাপ করিয়ে দিলেন, আমার কাকার মেয়ে বাসন্তী।

মিঃ মৈত্র জিজ্ঞাসা করলেন, 'ইনিও তোমার মত গাইতে পারেন নাকি?'

'না। ও গান গায় না।'

বাসন্তীদির দিকে তাকিয়ে মিঃ মৈত্র জিজ্ঞাসা করলেন, 'এখন ও কি পড়াশুনা করছেন?'

'না। ইণ্টারমিডিয়েট পাস করে বসে আছি।'

'সত্যি বসে আছেন?'

'হ্যাঁ।'

মিঃ মৈত্র সঙ্গে সঙ্গে মায়াদিকে বললেন, 'বোনকে আমাদের অফিসে লাগিয়ে দিচ্ছ না কেন?'

মায়াদি হাসতে হাসতে বললেন, 'এমনভাবে বলছেন যেন আমিই লাগিয়ে দেবার মালিক।'

'লিভ ভ্যাকান্সীতে কাজ করা তো শুরু করুক, তারপর ঠিক হয়ে যাবে।'

মায়াদিকে খুশী করার জন্য মিঃ মৈত্রই মিঃ মজুমদারের সঙ্গে কথা বললেন। মিঃ মজুমদার বললেন, 'দু'চার মাস লিভ ভ্যাকান্সীতে কাজ করলে একটা কিছু ব্যবস্থা নিশ্চয় হয়ে যাবে।'

আগের কথা মত মায়াদি দেড়টা-দুটো নাগাদ বাসন্তীদিকে নিয়ে বেহালার বাগানবাড়ি থেকে রওয়ানা হলেন। ট্রাম-ডিপোতে যাবার পথে বাসন্তীদি জিজ্ঞাসা করলেন, 'এখনই বাড়ি ফিরবে?'

'নারে ! সিনেমার টিকিট কাটা আছে।'

'তাই তুমি মাকে বললে ফিরতে দেরী হবে ?'

মায়াদি হাসলেন। 'সারাদিন ধরে ঐ একদল হ্যাংলা পুরুষের সঙ্গে আড্ডা দিতে আমার বিচ্ছিরি লাগে।'

'কয়েক জন ভদ্রলোক সত্যি ভীষণ অসভ্য।'

'সে বিষয়ে কোন সন্দেহ আছে নাকি ? স্ফূর্তি করার জন্যই তো এইসব পিকনিক হয়।'

'হ্যাঁ তাই দেখলাম। তাছাড়া এত বড় বাগানবাড়িতে কে যে কোথায় গেলেন, তার পাত্তাই পেলাম না।'

'কিছু মেয়ের জন্য ওরা এত বাঁদরামী করার সাহস পায়।'

বাসন্তীদি বললেন, 'তোমাকে কিন্তু সবাই খুব খাতির করেন।'

মায়াদি খোলাখুলিই বললেন, 'ঐ মৈত্র ছাড়া আমাকে আর কেউ জ্বালাতন করে না।'

বাসন্তীদি হাসলেন। 'হ্যাঁ ঐ ভদ্রলোককে দেখলাম তোমার সম্পর্কে প্রচণ্ড আগ্রহ…।'

'আগ্রহ না দুর্বলতা !' মায়াদি একটু থেমে বললেন, 'লোকটা আমাকে এত জ্বালাতন করে যে কি বলব !'

'জ্বালাতন মানে ?'

মায়াদি হাসতে হাসতে বললেন, 'আসল কথা উনি আমার সঙ্গে প্রেম করতে চান।'

'তাই নাকি ?'

'আর বলিস না। হ্যাংলা লোকগুলোকে দেখলে আমার গা জ্বলে যায়।'

সে যা হোক একদিন বাসন্তীদিও হেয়ার স্ট্রীটের টেলিফোন এক্সচেঞ্জে ঢুকলেন। তারপর একদিন অমিয়বাবুর সঙ্গে আলাপ হল। ভালবাসা।

'আচ্ছা বাসন্তী, একটা সত্যি কথা বলবে ?' চিনেবাদাম চিবুতে চিবুতে অমিয়বাবু জিজ্ঞাসা করলেন।

'বলব না কেন ?'

'সত্যি করে বলো তো আমার আগে তুমি কাকে ভালবাসতে ?'

'কাউকে না।'

'আঃ ! ভয় পাচ্ছ কেন ?'

বাসন্তীদি অমিয়বাবুর পিঠে একটা ঘুঁষি মেরে বললেন, 'বলছি তো কাউকে ভালবাসি নি।'

'বাগানে গোলাপ ফুটে থাকবে অথচ কেউ আদর করবে না, তাই কি হয় ?'

'আমি গোলাপ না।'

'গোলাপ না হলেও চাঁপা বা চন্দ্রমল্লিকা।'

'আমি বাসন্তী।'

অমিয়বাবু একটু মোড় ঘুরিয়ে নেন। 'আচ্ছা ঠিক আছে। তুমি ভাল

না বাসলেও তোমাকে কারা ভালবেসেছে ?

'জানি না।'

'না জানলেও বুঝতে তো পেরেছ ?'

'না, তাও পারি নি।'

'আচ্ছা কাকে কাকে সন্দেহ করতে ?'

'কাউকে না।'

'আচ্ছা বল কে কে তোমাকে প্রেমপত্র লিখত।'

'কেউ আমাকে প্রেমপত্র লেখে নি।'

'চিঠি না হোক কাগজের টুকরো ছুঁড়েও কেউ মারে নি ?'

'না।'

'কলেজ যাতায়াতের পথে দাদারা দাঁড়িয়ে থাকত না ?'

'থাকলেও খেয়াল করি নি।'

'তুমি সব চেপে যাচ্ছ।'

'আমি চেপে গেলেও তোমার সব কিছু ফাঁস হয়ে গেল।'

'তার মানে ?'

'তোমার অতীত কীর্তি কাহিনীর কিছু আভাষ পেলাম।'

'তার মানে ?'

'নিজে যা যা করতে তাই তো জানতে চাইলে।'

অমিয়বাবু চটপট করে জামার দু'তিনটে বোতাম খুলে বললেন, 'দেখ দেখ, আসল খাঁটি গব্য ঘৃত। তুমি এমন করে দেখাতে পারবে।'

বাসন্তীদি হাসতে হাসতে অমিয়বাবুর পিঠে একটা চড় মেরে বললেন, 'তুমি আজকাল অসভ্য হচ্ছ কেন বল তো ?'

'এটা অসভ্যতা হল ?'

'না না, দারুণ সভ্যতা হল।'

যৌবন বড় মিষ্টি, বড় মধুর। নতুন করে প্লাবিত হয় কত নতুন অনুভূতি। সত্তা। চোখের দৃষ্টি, জীবনের মূল্যবোধ পাল্টে যায়। শ্রাবণের কালো মেঘ দেখেও ভয় করে না।

মিসেস এ্যান্টনি অনেককাল আগেই সুপারভাইজার হয়েছেন। আর দু'এক বছরের মধ্যেই রিটায়ার করবেন। হেয়ার স্ট্রীটের টেলিফোন এক্সচেঞ্জে পঁচিশ বছরেরও বেশী কাটিয়েছেন। অনেক মেয়ে, অনেক ছেলে দেখেছেন। ওর চোখের সামনে কত কি ঘটে গেছে।

'ডু ইউ নো বাসন্তী ;' বুড়ী একটা সিগারেট ধরিয়ে বলতে শুরু করেন, 'আগে এ্যাসিসট্যাণ্ট এঞ্জিনিয়ারদের রেস্ট রুমে সব সময় একজন অপারেটারকে ডিউটি দিতে হত।'

চোখ দুটো বড় বড় করে বাসন্তীদি জিজ্ঞাসা করলেন, 'কেন ?'

'এ্যাসিসট্যাণ্ট এঞ্জিনিয়ারের রেস্ট রুমেও একটা টেলিফোন থাকত।'

'রেস্টরুমে আবার টেলিফোন কেন ?'

'জরুরী দরকার হতে পারে তো।' পর পর দু'বার সিগারেট টেনে একটু মুচকি হাসলেন। 'অফিসিয়াল ঐ টেলিফোন এ্যাটেন্ড করার জন্যই একজন অপারেটর থাকত বটে…'

'বটে কি ?'

'ইউ ডোণ্ট আণ্ডারস্ট্যাণ্ড ?'

বাসন্তীদি চমকে উঠে দাঁত দিয়ে জিভ কেটে বললেন, 'সত্যি ?'

'তোমাকে আমি মিথ্যে বলব কেন ? ইউ আর ইয়ংগার দ্যান মাই ডটার।'

'এঞ্জিনিয়াররা ধরা পড়তেন না ?'

'কে ধরবে ? বিকেল পাঁচটার পর থেকেই তো মাত্র একজন এ্যাসিসট্যাণ্ট এঞ্জিনিয়ারই হেয়ার স্ট্রীটের এই বাড়িটার মালিক হতেন।'

একটু আত্মপ্রসাদের সুরে বাসন্তীদি বললেন, 'এখন আমরা অনেক ভাল আছি।'

'বাট উই হ্যাভ পিকনিকস্ এ্যাণ্ড পিকনিকস্ ইন লার্জ গার্ডেন-হাউসেস।'

বাসন্তীদি জবাব দিতে পারেন না। চুপচাপ করে থাকেন।

মিসেস এ্যাণ্টনি বলেন, 'প্যাটার্ন চেঞ্জ করলেও আসল পারপাসটা ঠিকই সার্ভ হচ্ছে।'

বাসন্তীদি তবুও কথা বলেন না।

সিগারেটে শেষ টান দিয়ে মিসেস এ্যাণ্টনি বললেন, 'মাই ডিয়ার চাইল্ড, একটু সাবধানে মেলামেশা কর। দেখে অমিয়কে ভালই লাগে বাট অল দ্যাট গ্লিটার্স আর নট গোল্ড !'

ডালহৌসী পাড়ায় কোন বয়স্কা এ্যাংলো ইণ্ডিয়ান মহিলাকে দেখলেই বাসন্তীদির মনে পড়ে মিসেস এ্যাণ্টনির কথা। অল দ্যাট গ্লিটার্স আর নট গোল্ড। যা কিছু চকচক করে তাই সোনা নয় ! তখন সোনাই মনে হত। হয়েছিল। অমিয়বাবু সন্দেহাতীত ছিলেন ওর কাছে। ওর মনে ভালবাসায় কোথাও কখনও ত্রুটি পেতেন না বাসন্তীদি।

'এবার পূজায় দেশে যাচ্ছ তো।' বাসন্তীদি অমিয়বাবুকে জিজ্ঞাসা করলেন।

'কেন বল তো ?'

'কেন আবার ? গত বছরও তো যাওনি।'

'তাতে কি হল ?'

'পর পর দু'বছর না গেলে তোমার বাড়ির সবাই কি ভাববেন বল তো ?'

'আমি নিজে না গেলেও কর্তব্যে ত্রুটি করি না।'

'কর্তব্য মানে তো একটা মনি-অর্ডার ?'

'হ্যাঁ রেগুলার প্রত্যেক মাসে।'

'টাকা পাঠালেই বাবা মার প্রতি কর্তব্য শেষ হয় না।'

'না হলেও পূজায় তোমাকে ছেড়ে যাচ্ছি না। তাছাড়া …'

কথাটা শেষ না করেই উনি বাসন্তীদির দিকে তাকিয়ে একটু হাসলেন।

'তাছাড়া কি ?'

'বোধহয় কার্নানী ম্যানশানে একটা ঘর পাচ্ছি।'

'মেস ছেড়ে দেবে ?'

'হ্যাঁ।'

'এই মাঠে ঘাটে তোমার সঙ্গে গল্প করে আর মন ভরছে না।'

'আর মন ভরাতে হবে না।'

'তাই কি হয় বাসন্তী ? এত স্পীডে ট্রেন চলতে শুরু করেছে যে এখন ব্রেক করলেই এ্যাক্সিডেণ্ট হবে।'

'স্পীড কমিয়ে দাও।'

এখনও ডালহৌসীতে বা অন্য কোথাও দুটি ছেলেমেয়েকে একসঙ্গে একটু নিবিড় কথাবার্তা বলতে দেখলেই চোখে একটু স্বপ্নের ইঙ্গিত পেলেই বাসন্তীদির সন্দেহ হয় এরা বোধহয় বড় বেশী স্পীডে এগিয়ে চলছে। ব্রেক করতে পারবে না। ঠিক এ্যাকসিডেণ্ট হবে। দুর্ঘটনা ঘটবে। চোখের জলের বন্যা বইবে।

লেডিস ট্রামের মেয়েরা কত কি কথা বলেন, কত গল্প করেন। কত হাসি, কত ঠাট্টা হয়। কখনও কখনও সামান্য তর্ক-বিতর্ক বা আলাপ আলোচনা। অফিস বাড়ি স্বামী বা পুত্র কন্যা সিনেমা-থিয়েটর গল্প উপন্যাস বা আরো কত কি নিয়ে। বাসন্তীদির কানে কিছু পৌঁছায় না। হাতের উপর মুখখানা রেখে অর্থহীন শূন্যদৃষ্টিতে বাইরের দিকে তাকিয়ে থাকেন। রোজই এক কথা এক কাহিনী মনে পড়ে। মনে পড়বেই। একলা থাকলেই মনে পড়ে। রাত্রে মানিক ঘুমিয়ে পড়লে মনে পড়ে, কখনও কখনও ঘুমের মধ্যেও মনে পড়ে। স্বপ্ন দেখেন।

'বাসন্তী তুমি কেঁদো না। ভয় পেয়ো না। আমি বাড়ি থেকে ঘুরে এসেই ..'

'যদি তোমার বাবা-মা অমত করেন। তাহলে আমার কি হবে বলতে পার ? বলতে পার আমি কোথায় কার কাছে দাঁড়াব ?'

'আমি জানি ওরা অমত করবেন না। আর অমত করলেও আমি তোমাকে বিয়ে করব।'

বাসন্তীদি অমিয়বাবুকে জড়িয়ে ধরে হাউ হাউ করে কাঁদতে কাঁদতে বললেন, 'লক্ষ্মীটি, তুমি আমার মাথায় একট সিঁদুরের টান দিয়ে দাও। তা নয়তো আমি বাঁচব না, মরে যাব।'

অমিয়বাবু বুকের মধ্যে বাসন্তীদিকে টেনে নিয়ে সান্ত্বনা দেন !

বাসন্তীদি হঠাৎ দপ করে জ্বলে ওঠেন। মনে পড়ে যায় মিসেস এ্যাণ্টনির কথা। অল দ্যাট গ্লিটার্স আর নট গোল্ড ! 'না না তোমার কোন কথা শুনব না। আমার সিঁথিতে সিঁদুর না দিয়ে তুমি কোথাও যেতে পারবে না।'

অলীক অবাস্তব স্বপ্ন নয়। জীবনের চরমতম বাস্তব কাহিনীর সব কথা স্মৃতি ঘুমের মধ্যেও মনে পড়ে বাসন্তীদির।

বাসন্তীদির গলায় বজ্রের ইঙ্গিত পেয়ে চমকে ওঠেন, ভয় পান অমিয়বাবু। সান্ত্বনা জানাবার ভাষা খুঁজে পান না। অনেক কষ্টে অনেকক্ষণ পরে বলেন, 'তুমি অযথা ঘাবড়ে যাচ্ছ বাসন্তী! চোরের মত লুকিয়ে লুকিয়ে কেন তোমাকে সিঁদুর পরিয়ে দেব।'

বেশী কথা বলতে বাসন্তীদির বিরক্ত লাগে। চুপ করে থাকেন।

'আত্মীয়-স্বজন বন্ধু-বান্ধব সবার সামনে তোমাকে আমি সিঁদুর পরিয়ে দেব।'

'না, আমি আর এক মুহূর্তও অপেক্ষা করতে পারব না।'

কার্নানী ম্যানশানের ঐ রুদ্ধদ্বার কক্ষেই অমিয়বাবু বাসন্তীদির সিঁথিতে নতুন পরিচয় চিহ্ন এঁকে দিলেন।

ডাফরিন হাসপাতালে ভর্তি হবার সময় নিজের নাম জানালেন, মিসেস বাসন্তী চৌধুরী।

'স্বামীর নাম?'

'মিঃ অমিয় চৌধুরী।'

ট্রাম ফাঁকা হয়ে গেছে। সব মেয়েরা নেমে গেছেন। ট্রাম বেলগাছিয়া ডিপোয় ঢুকে পড়েছে। বাসন্তীদির খেয়াল নেই। হঠাৎ খুব জোরে ব্রেক কষে ট্রাম থেমে যেতেই সংবিৎ ফিরে এল। মনে পড়ল ডাফরিন হাসপাতাল থেকে মায়াদি মৈত্র মশায়ের সঙ্গে মানিককে কোলে নিয়ে কাঁদতে কাঁদতে ট্যাক্সিতে উঠেছিলেন।

সে কান্না আজও থামল না।

যৌবন নিকুঞ্জে

সূর্যদেব সৌরমণ্ডলের মাঝখানে তাকিয়া হেলান দিয়ে বসে আছেন। পৃথিবীর মত একদল গ্রহ মোসাহেবী করে তার চারপাশে ঘুরে বেড়াচ্ছে। আবার এই গ্রহগুলির তাঁবেদারী করে উপগ্রহের দল তাদের চারপাশে ঘুরপাক খাচ্ছে!

চব্বিশ ঘণ্টায় পৃথিবী একটি করে পাক ঘুরে যাচ্ছে। দিন হচ্ছে, রাত্রি আসছে। পালা করে ঋতু পরিবর্তন হচ্ছে। সৃষ্টির আদিমতম মুহূর্ত থেকে এই নিয়মের কোন ব্যতিক্রম হয় নি। একটি দিন, একটি মুহূর্তের জন্য সূর্যদেব নড়ে বসেন নি, পৃথিবীর চলা থেমে যায় নি, দিনরাত্রির লুকোচুরি বন্ধ হয় নি একটিবারও।

পৃথিবীটা গোল কিন্তু উপর নীচে খানিকটা চ্যাপ্টা। তাছাড়া সূর্যের চারপাশে যে পৃথিবী ঘুরছে, সে পৃথিবী ঠিক সোজা হয়ে ঘুরছে না। একটু হেলে, একটু বেঁকে, একটু কাত হয়ে সে ঘুরছে। তাছাড়া যে-পথে পৃথিবী ঘুরছে, সে ঠিক সোজা নয়, গোলও নয়। তাই বুঝি এই পৃথিবীতে যেসব মানুষের বাস, তাঁদের সবার জীবনও ঠিক সোজা হয়ে চলছে না। অনেকেই একটু হেলে, একটু বেঁকে, একটু কাত হয়ে জীবনের আঁকাবাঁকা পথে কখনও এগিয়ে চলছে, কখনও থমকে দাঁড়াচ্ছে।

আমরা সবাই জানি সংসারে সবার জীবন ঠিক একই নিয়মে এগিয়ে চলে না। আশ-পাশে তাকালে ব্যতিক্রমের অভাব নেই, কিন্তু তবুও আমরা সে ব্যতিক্রমকে স্বীকৃতি দিতে ভয় পাই, কুণ্ঠাবোধ করি। পৃথিবী সুন্দর, কিন্তু পৃথিবীর সব জায়গা সুন্দর নয়। মানুষ সুন্দর, কিন্তু মানুষের সব কিছু সুন্দর নয়। সমাজ ভাল, কিন্তু তারও সব কিছু ভাল নয়। সমাজের সব অংশে সবার মধ্যে আলো আর আনন্দ সমানভাবে ছড়িয়ে পড়ে না। অনেক অংশে জমাটবাঁধা অন্ধকার যুগ যুগ ধরে সঞ্চিত হয়ে আছে।

আমরা সবাই এসব জানি। জানি, আমাদের এই সমাজে বেশ্যা আছে, মাতাল আছে, দুশ্চরিত্র আছে, লম্পট বদমায়েস আছে, আছে চোর-জোচ্চর ও কালোবাজারী। সাধু-সন্ন্যাসী ও সাধারণ মানুষের মধ্যে মিশে আছে খুনী। জেলখানায় লক্ষ লক্ষ কয়েদী থাকে কিন্তু তবুও আমরা স্বীকার করি না যে তারাও আমাদেরই সমাজের মানুষ। একদিন এরাও মাতৃগর্ভ ধন্য করে জন্ম নিয়েছিল, সমস্ত শিশুর মত এরাও নিষ্পাপ ছিল, কিন্তু উত্তরকালে কোথাও পিছলে গিয়ে অন্ধকারের মধ্যে পথ হারিয়েছে। এমন অন্ধকারের মধ্যে পথ হারাবার সম্ভাবনা সবার জীবনেই ছিল ও আছে।

যারা পথ হারিয়ে ফেলে, পিছলে পড়ে, তারাও মানুষ। তাদের জীবনেও হাসিকান্নার দোলা দেয়, প্রেম ভালবাসার জোয়ার আসে, স্নেহ-মমতা জড়িয়ে থাকে।

খামখেয়ালী বিধাতার খেয়ালে আমার জীবনটাও ঠিক সোজা পথে চলে নি। এঁকেবেঁকে, হেলে-দুলে, চড়াই-উতরাই পেরিয়ে কখনও অন্ধকার গলির মধ্যে গিয়ে পড়েছি, কখনও প্রকাশ্য দিবালোকে প্রশস্ত রাজপথে হাজির হয়েছি। কখনও জোয়ার এসে ছুঁড়ে ফেলেছে এক অজানা অচেনা মহলে, আবার কখনও ভাঁটায় টানে নিয়ে গেছে পুরনো পরিচিতের ভিড়ে। সাংবাদিকের এইতো জীবন!

প্রথম প্রথম জীবনের হাটে এই বিচিত্র মেলা দেখে চমকে যেতাম, বিস্মিত হতাম। মানুষের পরিচিত রূপের বাইরে কোন কিছু দেখলে মনের সূক্ষ্ম পর্দায় একটা বেশ তীব্র আঘাত লাগত। কিন্তু পরে আর এসব অনুভূতি আমাকে বিব্রত করত না। মানুষকে মানুষ বলেই মেনে নিতাম। তার জীবনের বিচিত্রতার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করতাম না, অপাংক্তের করে দূরেও সরিয়ে রাখি নি। এদের হিতোপদেশও দিই নি, ঘৃণাও করি নি। কখনও দূর থেকে এদের শোভাযাত্রা দেখেছি। তৃপ্তি পেয়েছি কি অতৃপ্তি পেয়েছি তা জানি না, ঘৃণা হয়েছে না ভাল লেগেছে, তাও বুঝতে পারি নি। শুধু জানি স্মৃতি আর অভিজ্ঞতার ঝুলি পূর্ণ করে মনে মনে অনেকটা পূর্ণতার স্বাদ অনুভব করেছি।

সাংবাদিক জীবনের প্রথম অধ্যায়ের স্মৃতি রোমন্হন করতে গিয়ে আজ হাসি পেলেও সেদিন কিন্তু মুখ পাংশু হয়ে গিয়েছিল।

বেলা তখন গোটা বারো হবে। নিউজ ডিপার্টমেন্টের টেলিপ্রিন্টার আলাপ শুরু করলেও রাগ-রাগিনীর খেলা দেখাতে আরম্ভ করে নি। পাঁচ-সাতজন সাব-এডিটর আর আমরা জন তিন-চার রিপোর্টার বেশ আমেজ করে আড্ডা জমিয়েছিলাম। হঠাৎ টেলিপ্রিন্টারটা মুখর হয়ে উঠল। নিউজ এডিটর যতীনদা বললেন, দেখ্‌তো গণেশ, কোন্‌ বুড়ো মরল, না কোন্‌ ছুঁড়ির একসঙ্গে সাতটা বাচ্চা হলো।

গণেশ উঠে গিয়ে টেলিপ্রিন্টারের সামনে দাঁড়াল কিন্তু যতীনদাকে কোন জবাব না দিয়ে কী যেন গিলে গিলে পড়তে লাগল।

যতীনদা একটু গলা চড়িয়ে বললেন, বাবা গণেশ! কী পড়ছ বাবা?

গণেশ মুখটা না ঘুরিয়েই উত্তর দিল, কেউ মরে নি, যতীনদা।

তবে কি কেউ জন্মেছেন, বাবা?

না কেউ জন্মান নি।

আঠাশ বছর খবরের কাগজের নিউজ ডিপার্টমেন্টে কাজ করছেন যতীনদা। খবর সম্পর্কে তাঁর মনে জিজ্ঞাসা অত সহজে মেটার নয়। তাই পাল্টা প্রশ্ন করেন, তবে তুমি কী গিলে গিলে পড়ছ চাঁদ?

গণেশ এবার একগাল হাসি হেসে মুখ ঘুরিয়ে বলে, ক্যালিফোর্নিয়ার একটা সেক্স স্ক্যাণ্ডালের স্টোরি আসছে।

গণেশ তবুও টেলিপ্রিণ্টার ছেড়ে আসে না। যতীনদা দাবড় দিয়ে গণেশকে টেনে আনেন টেলিপ্রিণ্টারের কাছ থেকে ! তারপর বেশ মিহি সুরে বলেন, বাবা গণেশ, সেক্স কি কখনও স্ক্যাণ্ডাল হয় ?

আমরা সবাই একটু মুচকি হাসলাম। গণেশও হাসল। যতীনদা আমাদের হাসি দেখলেন না, কিন্তু গণেশের হাসি লক্ষ্য করলেন। এবার যেন একটু সিরিয়াস হয়েই বললেন, দেখ বাপু, সেক্স কখনও স্ক্যাণ্ডাল হয় না। সেক্স যদি স্ক্যাণ্ডাল হতো তবে সব কিছুই স্ক্যাণ্ডাল।

যতীনদা দৃষ্টিটা একবার আমাদের সবার উপর দিয়ে ঘুরিয়ে নিলেন। জিজ্ঞাসা করলেন, হিন্দুদের সব চাইতে প্রাচীন ও পবিত্র ধর্মগ্রন্থ কী ?

কে একজন বললো, বেদ।

দ্যাট্স রাইট্। আর সেই বেদের 'হিরো' কে ?

আর একজন বললো, ইন্দ্র।

যতীনদা বললেন, ফাইন ! গান্ধীজির মত ইন্দ্র অটোবায়োগ্রাফী লিখে যান নি কিন্তু তবুও তাঁর বায়োগ্রাফীর অভাব নেই। হিন্দুদের অসংখ্য ধর্মগ্রন্থে ইন্দ্রের জীবনী পাওয়া যায়। ইন্দ্রের স্ত্রী ইন্দ্রাণী ভীষণ সেক্সি, অর্থাৎ খুব সুন্দরী ছিলেন এবং ইন্দ্র তাঁর সতীত্ব নাশ করেন। শুধু তাই নয়। ইন্দ্রাণীর সতীত্ব নাশ করার পর তাঁর পিতা পুলোমনকেও হত্যা করেন দেবাদিদেব ইন্দ্র !

একটু নড়েচড়ে বসে বেশ একটু গাম্ভীর্যের হাসি হাসতে হাসতে যতীনদা বলেন, বাবা গণেশচন্দ্র ! তোমার মতে এটা সেক্স স্ক্যাণ্ডাল ?

গণেশ কোন উত্তর না দিয়ে শুধু মুচকি হাসে।

নিউজ এডিটর আবার শুরু করেন, দেখ বাপু, হিন্দুধর্মের অর্ডিনারী সেপাই হচ্ছে হনুমান এবং ভারতবর্ষের লক্ষ লক্ষ মন্দিরে এই সেপাই হনুমানের পূজা হচ্ছে। আর হিন্দুধর্মের কম্যাণ্ডার ইন চীফ হচ্ছেন ইন্দ্রদেব। এই ইন্দ্রদেবের লাইফ নিয়ে যদি কোন বুদ্ধিমান আমেরিকান ট্যুরিস্ট একটা বেস্ট সেলার সেক্স স্ক্যান্ডাল লেখে, তাহলে তুমি নিশ্চয়ই আপত্তি করবে না ? তাই না গণেশ ?

গণেশ তবুও নিরুত্তর।

যতীনদা থামেন না।—গণেশচন্দ্র ! আরো ব্যাপার আছে। গৌতম মুনির অভিশাপে ইন্দ্রের সর্বাঙ্গ স্ত্রী-চিহ্নে ভরে যায়। সে খবর জান ? পরে গৌতম মুনিকে অনেক ধরাধরি ও ইনফ্লুয়েন্স করার পর এঁরই বরে ঐ সহস্র স্ত্রী-চিহ্ন এক-একটি চোখ হয় এবং সেজন্য ইন্দ্রের নাম হয় সহস্রাক্ষ।

এসব শুনতে গিয়ে আমার চোখ মুখ লাল হয়ে উঠত। লজ্জায় মুখ দিয়ে কথা বেরুত না অনেকক্ষণ।

প্রথম যেদিন ককটেল পার্টিতে গেলাম, সেদিন হাসিমুখে মেয়ে পুরুষদের মদ খেতে দেখে আমি তাজ্জব বনে গিয়েছিলাম। শরৎচন্দ্রের নাটক নভেলে মদ খাওয়ার কথা অনেক পড়েছি। শুনেছি, মদ খেলে মানুষ মাতাল হয়,

মরেও যায়। হাসিমুখে গল্প করতে করতে যে মদ খাওয়া যায়, তা আমার কল্পনার বাইরে ছিল। তাইতো প্রথম প্রথম হাইকোর্ট দেখার মত অবাক বিস্ময়ে মদ খাওয়া দেখেছি।

ধীরে ধীরে আমার মন ও মতের পরিবর্তন হয়েছে। আজ জানি চা কফির মত মদও একটা পানীয়। একটু খেলে মানুষ মাতাল হয় না, মরেও যায় না। তবে একথাও জানি, বেশী খাওয়া ভাল নয়।

দিনে দিনে তিলে তিলে আমার অভিজ্ঞতার ঝুলি পূর্ণ হতে লাগল, মন থেকে সন্দেহ ও বিস্ময়ের মেঘও একটু একটু করে কাটতে লাগল। এখন আমিও অনেকটা সহজ সরল হয়ে উঠেছি। বছর খানেক লুকিয়ে লুকিয়ে এক আধ পেগ হুইস্কী খেয়েছি। এখন পার্টিতে গেলে যে দু-চার পেগ খাই তা সবার সামনেই, গর্বের সঙ্গে খাই। আগে মিস লুথরা বা উড়ু উড়ু মিসেস চ্যাটার্জীর মত বারুদের স্তূপের কাছ থেকে একশ হাত দূরে থাকতাম। আজকাল আর সেসব বালাই নেই।

মনে পড়ে মিস্টার ও মিসেস উডবার্নের ককটেল পার্টির কথা। সেই দিনই দুপুরে রায়পুর কংগ্রেস সেসন কভার করে দিল্লী ফিরেছি। স্নান-আহার সেরে ডিভানের পর শুয়ে পুরনো দিনের এক বাণ্ডিল প্রেমপত্র পড়তে পড়তে কখন যে ঘুমিয়ে পড়েছি, খেয়াল নেই। কদিনের অত্যাচারের মাশুল দিয়ে যখন ঘুম ভাঙল, তখন বাজে সাতটা। দৌড়ে বাথরুমে গিয়ে, হুড়মুড় করে স্যুট পরে কালো টাই-এর নট বাঁধতে বাঁধতে যখন গাড়িতে বসলাম, তখন প্রায় সাড়ে সাতটা। আমার ফিফ্‌টি-টু মডেলের বিলেতী পুষ্পকরথ তীরবেগে ছুটিয়েও উডবার্ন-দম্পতির নিমন্ত্রণ রক্ষা করতে যখন তাঁদের গৃহে আমার পদার্পণ হলো তখন প্রায় আটটা বাজে।

মিসেস উডবার্ন দ্বারদেশে অভ্যর্থনা করে বললেন, ইউ নটি বয়! এক ঘণ্টা লেট করে এলে। এদিকে তোমাকে না দেখতে পেয়ে মিস লুথরা আর মিসেস চ্যাটার্জী একটা পেগও হাতে তুলছে না!

দুজনেই দু-এক পা এগিয়ে গেছি। আর দু-এক পা এগুলেই অতিথিদের ভিড়ে আমি হারিয়ে যাব। মিসেস উডবার্ন কানে কানে বলেন, যাও না, আজকে তোমার কপালে দুঃখ আছে। সারা রাত্রি হয়ত ছুটিই পাবে না!

আমি বললাম, মাই ডিয়ার লেডী, ও ভয়ে শঙ্কিত নয় বীরের হৃদয়।

কয়েক মুহূর্তের মধ্যেই মিসেস উডবার্নের সতর্কবাণীর সত্যতা উপলব্ধি করলাম। ভিড়ের মধ্যে কোথা থেকে হঠাৎ মিসেস চ্যাটার্জী আমার সামনে হাজির হয়ে বললেন, ছিঃ ছিঃ। এত দেরী করে কোনো ভদ্রলোক পার্টিতে আসে? তাছাড়া তুমি তো জান আজকাল তোমার সঙ্গে ছাড়া ফার্স্ট পেগটা খাই না···

খুনীর আসামীর মত করজোড়ে আমি দেবীর কৃপাভিক্ষা চাইলাম, সরি ম্যাডাম।

আমার গালে একটা ছোট মিষ্টি চড় মেরে মিসেস চ্যাটার্জী বললেন,

আবার ম্যাডাম ? তোমাকে না বলেছি তুমি আমাকে ছবি বলেই ডাকবে। আর উই নট ফ্রেন্ডস ?

দেবীর যে অভিমান হয়েছে, সেকথা আমি জানতাম। ইদানীং বছর খানেক তাঁর মায়াবিনী দৃষ্টি যে অধমের ওপর পড়েছে, সে খবর আমি রাখতাম। চটপট অভিমান ভাঙাবার জন্য মিসেস চ্যাটার্জীর কানে কানে বললাম, 'তুমি কি কেবলি ছবি' ? নাথিং মোর ?

এক কথায় ক্লিন বোল্ড ! আমাকে ডান হাত দিয়ে বেশ একটু নিবিড় করে কাছে টেনে নিলেন। ঐ একটুকু ছোঁয়াতেই আমি মিসেস চ্যাটার্জীর অশান্ত হৃদয়ের হদিশ পেলাম।

যাই হোক এইভাবে কোনমতে হাইকোর্টের পর্ব শেষ হলো। এবার সুপ্রীমকোর্টের পালা! মিস লুথরা সব অপরাধ মার্জনা করতে পারেন, পারেন না শুধু উপেক্ষা বরদাস্ত করতে। আর তাছাড়া উপেক্ষা সহ্য করলেনই বা কেন ? কী নেই তাঁর ? রূপ-যৌবনের বান ডেকে যাচ্ছে তাঁর সর্বাঙ্গ দিয়ে! তাছাড়া ইদানীং দর্জিগুলো এমন নির্লজ্জভাবে কাপড় চুরি করতে আরম্ভ করেছে যে তাঁর স্পর্ধিত যৌবনের উদ্ধত পতাকা নিঃসংকোচে সবার দৃষ্টি আকর্ষণ করে। মোলায়েম গলায় চিকন চেনটার সঙ্গে যে বিরাট লকেটটা তাঁর যৌবনের উত্তাপে প্রতিটি মুহূর্তে তিলে তিলে দগ্ধ হচ্ছে, সেটিকে আবিষ্কার করতে একটুও কষ্ট করতে হয় না। কোমরটা যে চিকন ও তার আশপাশে স্নেহজাতীয় পদার্থের যথেষ্ট অভাব আছে, সে খবর জানতেও কোনই অসুবিধা নেই। পিতৃপুরুষ যে এককালে ভূমধ্যসাগরের নিকটবর্তী ও নীলনদের আশ-পাশের লোকজনের সঙ্গে বৈবাহিক সূত্রে আবদ্ধ হয়েছিলেন, সেকথা আজও মিস লুথরাকে দেখলে বোঝা যায়। পিতা-পিতামহ, মাতা-মাতামহ যে পেশোয়ারের আঙ্গুর আপেল আখরোট খেয়ে দিন কাটিয়েছেন সে-পরিচয় আজও পাওয়া যায়। কমনীয় ভাবের একটু অভাব আছে সত্য, তবে সে দৈন্য চোখেই পড়ে না। টকটকে রঙ, গাল দুটিতে এখনও ঈষৎ গোলাপী আভা। তবুও এর ওপর দিয়ে মিস লুথরা একটু ম্যাক্স-ফ্যাক্টরের চর্চা করেন বেশ সযত্নে।

তাইতো আমি ওর নাম দিয়েছি মিস লুটরা। আধা-কাঁচা, আধ-পাকা পুরুষদেরও সব কিছু লুটপাট করে নিতে পারেন ইনি এবং সেজন্য কোন প্রচেষ্টার প্রয়োজন হয় না তাঁর।

বুকটা ঢিপ ঢিপই করছিল। মনে মনে ভেবে দেখলাম, আজেবাজে মিথ্যা কথা বলে কোন লাভ নেই, চালিয়াতী করেও পেরে ওঠা শক্ত, তাই সোজাসুজি আত্মসমর্পণ করলাম। তাছাড়া মিস লুথরার কাছে আত্মসমর্পণ করে অপমানের চাইতে গর্বই বেশী হয়।

আমার মত আধাকাঁচা বয়সের হাফ ব্যাচিলারদের প্রতি মিস লুথরার অশেষ কৃপা। আমি তাঁর ঔদার্যের পরিচয় একবার নয়, বহুবার পেয়েছি। সেদিনও পেলাম। তবে খেসারত দিতে হলো। হাইকোর্ট ও সুপ্রীমকোর্টের

দ্‌জন জজ একসঙ্গে রায় দিলেন, তুমি একটি পেগও পাবে না আজ এবং আমাদের দ্‌জনকে নিঃসঙ্কোচে সার্ভ করে যাও।

তথাস্তু!

মিস্টার উডবার্ন একবার আমার হয়ে ওকালতি করতে গিয়েছিলেন কিন্তু সাফ জবাব পেলেন মিসেস চ্যাটার্জীর কাছ থেকে, দেখ সাহেব, আজকাল আর টেমস-এর পাড়ে প্রিভি কাউন্সিলে আমাদের কোন মামলার বিচার হয় না। বাড়ির বুড়ো সারেঙ্গীর মত আমি শুধু ওদের রসের জোগানদার হলাম, ভাগ পেলাম না একটুও। একটি একটি করে চার-চারটি পেগ উড়ে গেল কিছুক্ষণের মধ্যেই। অনেকক্ষণ ধরে উপবাস করে থাকবার পর পানের বাসনা একটু তীব্রতরই হয়েছিল। আদি ও অকৃত্রিম স্কটল্যাণ্ডের অতখানি সোমরস প্রায় ঢক্‌ ঢক্‌ করে গেলবার ফল পেতে দেরী হলো না। মিসেস চ্যাটার্জীর বেশ মুড্‌ এসেছিল। আমাকে বললেন, আই অ্যাম সরি, ইউ কাণ্ট ড্রিঙ্ক হুইস্কী টু নাইট, বাট ইফ্‌ ইউস্‌ ইউ ক্যান ডিঙ্ক মী।

মিস লুথরার অবস্থাও খুব ভাল ছিল না। নেশার ঘোরে কখন যে বুকের ওপর থেকে কাশ্মীরি সিল্কের শাড়িটা কোলের ওপর পড়ে গেছে, খেয়াল নেই। পুলিশ! পুলিশ! প্লিজ হেল্‌প মী, প্লিজ!

মিস্টার উডবার্ন ছুটে এলেন চীৎকার শুনে। মিস লুথরা হুইস্কির গেলাসটা ছুঁড়ে ফেলে তাঁর হাতটা বুকের ওপর টেনে নিয়ে বললেন, লুক হিয়ার, আমার শাড়ি নেই! প্লিজ পুলিশকে খবর দিয়ে আমাকে বাঁচান!

পুলিশকে ডাকতে হলো না, আমিই পুলিশের কাজ করে দিলাম।

মিস লুথরার শাড়ি খোঁজার জন্য পুলিশ হবো, ক'বছর আগে কল্পনাও করি নি। কোনদিন কি স্বপ্নেও ভেবেছি মিসেস চ্যাট্যার্জী তাঁর সমস্ত ঐশ্বর্য তুলে ধরবেন আমার কাছে? ভাবিনি। কিন্তু আজ জানি সমাজের এই স্তরে সব কিছু সম্ভব। তা নয়ত মিস পাইকে নিয়ে কি প্রকাশ্যে মিস্টার চ্যাটার্জীর অতখানি বাড়াবাড়ি সম্ভব?

মিস্টার চ্যাটার্জী ভারত-সরকারের একজন স্বনামধন্য অফিসার। তবে ঐ দশটা থেকে পাঁচটা। সন্ধ্যার পর ভুলে যান অতীত, বর্তমান, ভবিষ্যৎ। জেট প্লেনের চাইতেও দ্রুত গতিতে হুইস্কীর বোতল চড়ে চলে যান স্বর্গ, চলে যান মর্ত্য! একবার টেক্‌ অফ্‌ করলে, মাঝরাত কি শেষরাতের দিকে কোথায় যে ল্যাণ্ড করবেন তা কোনো জ্যোতিষীও বলতে পারবেন না। তবে দিল্লীর কিছু কিছু অফিসার ও সাংবাদিকরা জানি, আজকাল আবহাওয়া ভাল না থাকায় প্রায়ই তাঁকে মিস পাই-এর ফ্ল্যাটে ফোর্স ল্যাণ্ড করতে হয়।

মিস পাই মহারাষ্ট্র ক্যাডারের একজন আই-এ-এস অফিসার। বয়সের চাইতে অভিজ্ঞতা বোধকরি একটু বেশীই হবে। বয়সটা কাঁচা হলেও বছর দশকে বিলেতে লেখাপড়া শেখার ফলে পুরুষ মানুষ দেখলে ওর অ্যালার্জি হয় না। বরং তাঁদের বিপদের দিনে পাশে এসে দাঁড়ান, হাসিমুখে এগিয়ে আসেন।

সেবার একটা নিউ ইয়ার্স ইভ্‌-এর পার্টিতে মিস্টার চ্যাটার্জী হুইস্কীর

বোতল চড়ে টেক্ অফ্ করার পরই লুটিয়ে পড়লেন মিস পাই-এর চরণ-প্রান্তে। নেশার ঘোরে অঘোর, তবুও মূল্যবোধ হতে ত্রুটি হ'ল না তাঁর। মিস পাই-এর পা দুটি জড়িয়ে ধরে বললেন, কে বলে তুমি মিস পাই? তুমি মিস কোটি কোটি টাকা, ডলার, পাউন্ড! তুমি স্টেট ব্যাঙ্ক, রিজার্ভ ব্যাঙ্ক, ওয়ার্ল্ড্ ব্যাঙ্ক।

মিস পাই টেনে তুলে ধরলেন মিস্টার চ্যাটার্জীকে। পাশে একটা সোফায় বসিয়ে এগিয়ে গেলেন মিসেস চ্যাটার্জীর কাছে। বললেন, চ্যাটার্জী আউট হয়ে গেছে। আপনি কি এখন ওকে বাড়ি নিয়ে যাবেন?

মিসেস চ্যাটার্জী বললেন, আই উইস, আই কুড গো। কিন্তু এতই এলাম। তাছাড়া আমাদের এম্পোরিয়াম সম্পর্কে কতকগুলো জরুরি আলোচনা সবে শুরু করেছি…

আমি চ্যাটার্জীকে নিয়ে বাড়ি যাচ্ছি। আপনি বাড়ি ফেরার পথে ওকে তুলে নেবেন।

মিসেস চ্যাটার্জী বাড়ি ফেরার পথে তুলে নিয়েছিলেন স্বামীকে, তবে রাত্রিতে নয়, ভোরবেলায়।

সারাদিন কাজকর্মের চাপে দুজনের দেখাই হয় না। কিন্তু গভীর রাত্রিতে প্রমত্ত অবস্থায় দেখা হলেও মিস পাই-এর বুদ্ধি ও কর্ম-নৈপুণ্যের পরিচয় পেতে চ্যাটার্জী সাহেবের দেরী হয় নি। তিন বছরে সাতবার ইণ্ডিয়ান ডেলিগেশনের সদস্যা হয়ে বিদেশে গিয়েছেন মিস পাই।

চ্যাটার্জী সাহেব অতিখ্যাত ব্যারিস্টারের পুত্র। তাইতো ওঁকে দেখে আমি আশ্চর্য হই নে—আশ্চর্য হই মিসেস চ্যাটার্জীকে দেখে। শ্রীরামপুরের বিখ্যাত মুখার্জি বংশের মেয়ে ইনি। গৃহদেবতার অর্চনার জন্য দুটি ঘোড়ার গাড়ি আজও যায় দক্ষিণেশ্বরে গঙ্গাজল আনতে। মেয়েদের তো দূরের কথা, মুখার্জি বাড়ির ছেলেদের দর্শন পাওয়াও একটা দুর্লভ ব্যাপার! ও বাড়ির ছেলেরা আজও শুধু ব্যবসা আর বাবুগিরি করেই জীবন কাটায়। তবে হ্যাঁ মোহনবাগানের খেলা বা শ্রীরঙ্গমে শিশির ভাদুড়ীর নতুন নাটক হলে ব্যবসা থেকে সেদিন ছুটি। মেয়েরাও দেখে, তবে শাড়ি গহনার মধ্যে জীবনের চোদ্দ আনা কাটিয়ে দিতে হয়। বুড়োর দল সব বাতের রুগী। তামাক, অফিস আর তাকিয়া নিয়েই দিন-রাত্রি কাটছে তাদের।

আমার বান্ধবী শ্রীমতী ছবি চ্যাটার্জী এই বাড়িরই মেয়ে। উপযুক্ত পাত্রের হাতেই তিনি পড়েছিলেন, সে-বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই। তবে এহেন উপযুক্ত পাত্রের জন্য তিনি উপযুক্ত পাত্রী ছিলেন না। ডজ্ শেভরলেটের সঙ্গে ঘোড়ার গাড়ি পারবে কেন? লণ্ডনের সঙ্গে কি শ্রীরামপুরের তুলনা হয়? যাঁর ধ্যান, জ্ঞান, স্বপ্ন, সাধনা হচ্ছে ইউরোপ, তাঁর কাছে 'ছবি' ঘরের আর পাঁচটা আসবাবপত্রের মত শুধু সাজাবার বস্তু, জীবন-যাত্রার সহচরী নয়।

ট্র্যাডিশনকে সহজে দূরে ঠেলে ফেলা যায় না, কিন্তু একবার যদি ঠেলে

ফেলা যায়, তাহলে অতীত ট্র্যাডিশনের টিকিটও খুঁজে পাওয়া মুস্কিল। তবে এসব সময়সাপেক্ষ ব্যাপার। ছবি চ্যাটার্জীরও সময় লেগেছিল। আমার সঙ্গে বার্লিন কেম্পিনিস্কি হোটেলের বারে যখন মিসেস চ্যাটার্জীর প্রথম দেখা, প্রথম পরিচয় হয়, তখন কি স্বপ্নেও ভাবতে পেরেছি শ্রীরামপুর মুখার্জীবাড়ির মেয়ে ইনি ? স্বামীর সঙ্গে লণ্ডন গিয়েছিলেন। স্বামী কর্মব্যস্ত ছিলেন। একলাই চলে এসেছিলেন বার্লিন ফিল্ম ফেস্টিভ্যাল দেখতে। ইণ্ডিয়ান ডেলিগেশনের দুটি অভিনেত্রীর চাইতে মিসেস চ্যাটার্জীই বেশী পপুলার হয়েছিলেন বিদেশী ডেলিগেটদের মধ্যে।

দূর প্রবাসে মিসেস চ্যাটার্জীকে আমারও বেশ লেগেছিল। বার্লিনের কটি দিন বেশ কেটেছিল। তাছাড়া লণ্ডন ফেরার পথে জুরিখের দুটি দিন ?

॥ দুই ॥

দূর থেকে মনে হয় সবাই ভাল, সবাই সোজা পথে এগিয়ে চলেছেন। মনে হয় সমাজের শাসন সবাই মেনে চলেছেন। এই যে আমাদের চারপাশে এত মানুষ ঘোরাফেরা করছেন, দেখে কি মনে হয় তাঁরা খারাপ? শাঁখা-সিঁদূর পরে যাঁরা স্বামী-পুত্র নিয়ে ঘর-সংসার করছেন, মনে হয় কি তাঁদের জীবনে কোনও কাহিনী লুকিয়ে আছে? কিছু মনে হওয়ার উপায় নেই। এই যে লক্ষ লক্ষ মানুষ, যাঁরা কল-কারখানা, অফিস-আদালত, ব্যবসা-বাণিজ্যের বিস্তীর্ণ কর্মক্ষেত্রে জীবিকার জন্য তিনশ পঁয়ষট্টি দিন সংগ্রাম করছেন এবং অফিস ছুটির সঙ্গে সঙ্গে বিদ্যুৎস্ফুলিঙ্গের মত ছিটকে বেরিয়ে আসেন, তাঁরা কি সবাই ঘরের টানে, প্রিয়জনের আকর্ষণের জন্য প্রতিদিন ছিটকে বেরিয়ে আসেন? আগে বিশ্বাস করতাম এঁরা সবাই ঘরের টানেই অফিস থেকে মুক্তি পাবার জন্য উন্মাদ হয়ে ওঠেন।

আজ দেখে দেখে জেনেছি পৃথিবীর মত আমরা অনেকেই নিয়ম মেনে চলি, কর্তব্য পালন করি, কিন্তু পথটা অনেকেরই বাঁকা।

এই তো মিঃ বোস! হাসি-খুশিভরা মানুষটি। ভগবান তাঁকে দশ হাতে উজাড় করে দিয়েছেন। অর্থ, যশ, প্রতিপত্তি, সব কিছু। আজকাল দিল্লীতে বাঙ্গালীর প্রতিষ্ঠা প্রতিপত্তি নেই বললেই চলে। তবুও যে দু-চারজন মুষ্টিমেয় বাঙ্গালী বেশ মেজাজের সঙ্গে দিন কাটাচ্ছেন, বোস সাহেব তাঁদের অন্যতম। চাকরি করেন দিল্লীতে, কিন্তু বারো মাসের মধ্যে সাত-আট মাসই উড়ে বেড়ান। আজ মাদ্রাজ, কাল বোম্বে, পরশু কলকাতা তো লেগেই আছে। এ ছাড়া পূর্বে টোকিও, পশ্চিমে নিউ ইয়র্ক-সানফ্রান্সিস্কোও বছরে দু-বার হয়ই।

স্বামীর গর্বে মিসেস বোসের মুখে হাসি লেগেই আছে। যখন বিয়ে হয়েছিল তখন স্বামী নিতান্তই সাধারণ কেরানী ছিলেন। কিন্তু মাথা ভর্তি যার শুধুই ব্রেন, তাঁকে কি আটকানো যায়? মিস্টার বোসকেও যায়নি। বিশ বছরে আজ অত বড় ইণ্ডিয়ান-কাম-অ্যামেরিকান ফার্মের অন্যতম কর্মকর্তা। যে স্বামী হাজার তিনেক মাইনে, ডিপ্লোম্যাটিক এনক্লেভে বিনা ভাড়ায় প্রাসাদ, বিনা খরচে কোম্পানীর একখানি অস্টিন-কেম্ব্রিজ উপভোগ করেন, সে স্বামীকে কোন্ স্ত্রী ভালোবাসেন না? মিসেস বোসও ভালবাসেন।

স্বামী-সোহাগিনী মিসেস বোসের ঢল ঢল ভাব দিল্লীর বাঙ্গালী বাড়ির অন্দরমহলের অন্যতম উপাদেয় আলোচনার বিষয়। স্বামীর ভালবাসার জীবন্ত নিদর্শন স্বরূপ নিত্য নতুন শাড়ি গহনার চলন্ত প্রদর্শনী দেখিয়ে মিসেস বোস স্বাভাবিক আত্মতৃপ্তি পান।

পূজা-পার্বণ থিয়েটার-জলসাতেও বোস সাহেবের অশেষ উৎসাহ। কাজের

চাপে সব সময় অনুষ্ঠানে উপস্থিত থাকতে পারেন না, কিন্তু অকৃপণ ঔদার্যে সাহায্য করতে কুণ্ঠা নেই। জানাশোনা লোকের ছেলেমেয়ের বিয়ে হলেও হাল ধরেন ইনি। কলকাতা থেকে রজনীগন্ধার মালা আনিয়ে, টোপর আনিয়ে দেওয়া ছাড়াও গাড়ি দেন এবং ভাল মিষ্টি বা খাঁটি বেনারসী শাড়ির ব্যবস্থাও যিনি করেন, তিনিই আমাদের মিস্টার বোস।

বোস সাহেবের আরো অনেক গুণ আছে। বিপদে কোন মানুষ তাঁর কাছে গেলে টাকাই দেন না, হাসিমুখে কথা বলেন, এক পেট মিষ্টিও খাইয়ে দেন।

এই মহাপুরুষটির মহাজীবনের সমস্ত ইতিহাস আমার জানা নেই। তবে যে টুকরো টুকরো ইতিহাস জানি, তাও বেশ দীর্ঘ। কাশ্মীরি গেটের মণ্টু চ্যাটার্জি এসে বলেন, দাদা, ছোট ছেলেটার জন্য দু-এক বোতল কডলিভার অয়েল দরকার। অনেক খুঁজলাম কোথাও পেলাম না। শুনছি নাকি আজকাল ইণ্ডিয়াতেই পাওয়া যায় না।

হাসিমুখে উত্তর আসে, ইণ্ডিয়াতে কডলিভার অয়েল পাওরা গেলেও তোমার দাদাকে তো পাওয়া যায়।

আদর করে মণ্টুর পিঠে একটা চড় মেরে বললেন, বাড়ি যাও, ঠিক সময় পেয়ে যাবে।

যে কথা সেই কাজ। কদিন বাদে অস্টিন-কেম্ব্রিজ হাঁকিয়ে মণ্টু চ্যাটার্জীর বাড়িতে দু বোতল কডলিভার অয়েল নিয়ে হাজির।

গোলমার্কেটের মিষ্টির দোকানে বসে বসে আড্ডা দিয়েই ক'বছর কাটিয়ে দিল শংকর। রাহুর দশা ঠিক মুখোমুখি, অকস্মাৎ এক জার্মান কোম্পানীর মেমসাহেবের সঙ্গে তার পরিচয় হলো। ইস্ত্রি করা প্যান্ট আর টেরিলিনের শার্ট পরে ঘোরাঘুরি শুরু করে দিল মেমসাহেবের অফিসে, বাড়িতে। যখন সামনের দিগন্ত বিস্তৃত উজ্জ্বল ভবিষ্যতের মাঝখানে একটু কুয়াশা দেখল, শংকর কালবিলম্ব না করে ছুটে গেল তাঁর বোসদার কাছে। ড্রইংরুমে ঠিক বলতে সাহস পেল না, সামনের লনে কানে কানে কী যেন বলল।

বোসদা বেশ রাগ করার ভান করে বললেন, তুই একটা ইডিয়ট। এর জন্যে আবার এতদূর কেউ ছুটে আসে?

যীশুখৃষ্টের পুণ্য জন্মদিনের ঠিক আগের দিন সন্ধ্যায় শুধু দু বোতল স্কচ হুইস্কীই নয়, আর এক বোতল রেড ওয়াইন ও একটা ফুলের তোড়াও হাজির মেমসাহেবের বাংলোয়। সঙ্গে একটা ছোট্ট কার্ডে লেখা ছিল মেরী ক্রীসমাস অ্যাণ্ড এ হ্যাপি নিউ ইয়ার। একটু নীচে ডান পাশে লেখা ছিল 'ইওর লাভিং শংকর'।

এই তরুণ ভারতবাসীর ভদ্রতা, সৌজন্য ও সর্বোপরি আন্তরিকতায় মুগ্ধ হয়েছিলেন নবাগত প্রৌঢ় জার্মান ভদ্রলোকটির স্ত্রী, সৌজন্য ও আন্তরিকতার পুরস্কার পেতে দেরী হয়নি শংকরের। মাস দুয়েক পরে ইস্ত্রি করা প্যান্ট, টেরিলিন শার্ট ও একটা টাই চড়িয়ে শংকর মাসিক তিনশ' পঁচিশ টাকা পারিশ্রমিকের বিনিময়ে মেমসাহেবের সেবা শুরু করে দিল।

ক'বছরের মধ্যে জার্মান প্রতিষ্ঠানটির উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে শংকরেরও উন্নতি হয়েছে। মাইনে ডবল হয়েছে, শনিবার-রবিবার ছুটি। তাছাড়া বছরে এক মাসের জন্য হিল্ স্টেশনে বেড়াবার ছুটি ও এক মাসের স্পেশ্যাল পে।

শংকর একমাসের ছুটি, স্পেশ্যাল পে—দুই-ই নেয়, তবে হিল্ স্টেশন যায় না। গোলমার্কেটে মিষ্টির দোকানের আড্ডাখানায় ফুলকপির গরম গরম শিঙ্গাড়া খেতে খেতে গুল মারতে মারতে এভারেস্টেরও চূড়া ছাড়িয়ে চলে যায়। শংকর দিল্লীতে জন্মালেও তার বাবা জন্মেছিলেন কুমিল্লায়। গোলমার্কেটের আড্ডাখানায় শংকর বাঙ্গাল বলেই খ্যাতি অর্জন করে। ডি-সি-এস-এ ইস্টবেঙ্গল খেলতে এলে শংকর গোলমার্কেটের আড্ডাখানা ছেড়ে দিনগুলো দিল্লী গেটের ধারে, স্টেডিয়ামের চারপাশে ঘোরাঘুরি করেই কাটিয়ে দিত। আজকাল আর ইস্টবেঙ্গলের নামটি পর্যন্ত সহ্য করতে পারে না সে। মোহনবাগানের খেলা দেখাতে সে নিজের পকেট থেকে টাকা দিয়ে দলবল নিয়ে যায় মাঠে।

শংকরের এই পরিবর্তনে গোলমার্কেটের আড্ডাখানায় ঝড় নয় সাইক্লোন বয়ে গিয়েছিল। বাঙ্গাল-ঘটি, ইস্টবেঙ্গল-মোহনবাগান, দু পক্ষই সমানভাবে আশ্চর্য ও স্তম্ভিত হয়েছিল শংকরের দল পরিবর্তনের জন্য। দু'শো নাটকের হিরো ও গোলমার্কেটের আড্ডাখানায় প্রায় পঁয়ত্রিশ বছরের অভিজ্ঞতা থাকা সত্ত্বেও পটলদাও এ রহস্যের কোন কিনারা করতে পারেন নি। পটলদার এই প্রথম ব্যর্থতা।

গোলমার্কেটের আড্ডাখানায় কী যেন একটা শোকের ছায়া আচ্ছন্ন করে রাখল। শেষে একদিন শংকর নিজেই সব রহস্যের যবনিকা পাত করল।

শিঙ্গাড়া চা খাওয়া শেষ হলো, হিপ্ পকেট থেকে অ্যামেরিকান সিগারেটের প্যাকেটটা বের করে একটা ধরিয়ে নিল। পর পর ক'টা টান মেরে শংকর শুরু করে, আমাদের মত জার্মানীতেও ইষ্টু-বিষ্টু অর্থাৎ ইস্ট-ওয়েস্ট অর্থাৎ বাঙ্গাল-ঘটি আছে।

আমেরিকান সিগারেটে আর একটা টান মেরে নেয়। বলে, ম্যাক্সমুলারের প্রপৌত্রের ছোটশালার মেজজামাই-এর বাল্যবন্ধু ও হিটলারের প্রাইভেট টিউটরের পাশের ফ্ল্যাটের বৃদ্ধ ভদ্রলোকের নাতি হচ্ছেন আমার অফিসের সাহেব। উনি ডুসলডর্ফের লোক অর্থাৎ পশ্চিম জার্মানির লোক। ইস্টের প্রতি অর্থাৎ ইস্ট বার্লিন বা ইস্ট জার্মানি সম্পর্কে যদি আমার বিন্দুমাত্র দুর্বলতা থাকে তবে আর ও কোম্পানীতে আমার একটি মুহূর্তও থাকা চলবে না।

সিগারেটে পর পর আরো দু-তিনটে টান মেরে ফেলে দেয় শংকর। শেষে বলে, জানেন পটলদা, লাইফে অনেকদিন ভেরাণ্ডা ভেজেছি, অনেক সাফার করেছি, আমি আর রিস্ক নিতে রাজী নই।

বন্ধু-বান্ধবরা এদিক-ওদিক চায়। এখনও যেন ঠিক বুঝে উঠতে পারে না কেউ।

শংকর এবার সকলের দুর্ভাবনা শেষ করে,—অফিসে বসে যদি কোনদিন ইস্টবেঙ্গল-মোহনবাগান নিয়ে আলোচনা করবার সময় হঠাৎ সাহেবের কানে 'ইস্ট' কথাটি যায়, তাহলে ওরা ধরে নেবে আমি কমিউনিস্ট, আমি ইস্ট বার্লিনের চর। আর···

পটলদা আর এগুতে দেন না। বলল, তোর মাথায় যে এত ব্রেন আছে, তা তো জানতাম না।

সেসব যাই হোক গোলমার্কেটের শংকর যে আজ নিজের পায়ে দাঁড়িয়েছে, তার পিছনে বোস সাহেবের নিশ্চয়ই কিছু অবদান আছে। নতুন ও পুরনো দিল্লীর বাঙ্গালীপাড়ায় ঘোরাঘুরি করলে বোস সাহেবের আরো অনেক অবদানের কাহিনী জানা যাবে।

রাজধানী দিল্লীতে আমাদের যে বোস সাহেব প্রকাশ্য দিবালোকে সসম্মানে ঘুরে বেড়ান, একদিন রাত্রির অন্ধকারে, লোকচক্ষুর আড়ালে পালিয়েছিলেন ভারতবর্ষের মাটি ছেড়ে। নাগপুর থেকে আঠাশ মাইল দক্ষিণে বাংলা ও মহারাষ্ট্রের বিপ্লবীরা যে ঐতিহাসিক ডাকাতি করেছিলেন, ক্ষুধার্ত পথক্লান্ত সেই সব মহাবিপ্লবীদের সাহায্য করার অছিলায় এই সাহেব তাঁদের তুলে দিয়েছিলেন ইংরেজ পুলিশের হাতে। সে কথা শংকর, মণ্টু চ্যাটার্জি জানে না, জানে না দিল্লীর মানুষ। জানে না আরো অনেক কিছু। কোর্টে সরকারের পক্ষ সমর্থন করে বিপ্লবীদের বিরুদ্ধে অনেক অলীক অভিযোগ শুনিয়েছিলেন বোস সাহেব। বিকেল বেলায় কোর্টরুম থেকে বেরিয়ে পুলিশের গাড়িতে ওঠবার সময় দশ বছরের একটি শিশুর হাতের রিভলবারটা একবার মাত্র গর্জন করে উঠেছিল- গুড়ুম।

সেসব অনেক কথা। অনেক ইতিহাস। বোস সাহেব প্রাণে বেঁচেছিলেন ; কিন্তু জখমটা বেশ ভাল রকমেরই হয়েছিল। যদি কেউ একবার বোস সাহেবের জামা আর গেঞ্জিটা তুলতে পারেন, তবে দেখতে পাবেন দশ বছরের মহারাষ্ট্রের সেই বালকের শ্রদ্ধা নিবেদনের স্মৃতিচিহ্ন।

এসব কথা কেউ জানে না। যাঁরা জানতেন তাঁরাও হয়ত ভুলে গেছেন। তবে বোস সাহেবের সাক্ষ্যদান মত যে তিনজন বিপ্লবী যুবক ফাঁসিকাঠে প্রাণ দিয়েছেন ও যে সাতজন নাগপুর সেণ্ট্রাল জেলের অন্ধকার কক্ষে বছরের পর বছর কারাযন্ত্রণা ভোগ করেছেন, তাঁদের আত্মীয়-পরিজনরা নিশ্চয়ই আমাদের মিস্টার বোসকে স্মৃতি থেকে মুছে ফেলতে পারেন নি।

ভগবান সত্যি মহান। তিনি দয়ার অবতার! তিনি ন্যায়ের বিধান! ভগবানের বিশেষণের কি শেষ আছে? তাইতো বিশ্বাসঘাতক মীরজাফর মিস্টার বোস সার্থক, সাফল্যমণ্ডিত ও সর্বজনশ্রদ্ধেয়। যাঁরা তাঁর মিথ্যা ভাষণের বলিদান হলেন, তাঁরা তো হারিয়ে গেছেন আমাদের মন থেকে। তাঁদের বৃদ্ধ বাবা-মা নিশ্চয়ই দারিদ্র্যের অসহ্য জ্বালায় জ্বলতে জ্বলতে শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেছেন।

পৃথিবীর অন্য কোন দেশে মিস্টার বোসের জন্ম হলে ইতিহাসটা বোধহয়

উল্টো হতো ? যে-দেশে বারো মাসে তেরো পার্বণ নেই, ব্রতপালন উপবাস নেই, যে-দেশে দরিদ্র মানুষের রক্ত শোষণ করে গুণ্ডাপাণ্ডারা মন্দিরে দেবতার ভরণ-পোষণ চালায় না, যে-দেশে হাঁচি-কাশি-টিকটিকির শাসন মানুষকে মেনে চলতে হয় না, সে দেশে ভগবানও বোস সাহেবের অন্য বিচার করতেন। কিন্তু ভারতবর্ষে মীরজাফর শাস্তি পায় না, শাস্তি পায় মীরমদন।

বোস সাহেবের ইতিহাস আমিও হয়ত কোনদিন জানতে পেতাম না, জানতাম না যে তাঁর যৌবন-প্রৌঢ়ত্বের সন্ধিক্ষণের দিনগুলি বড়ই অন্ধকার, কলঙ্কজনক। অতীতের দ্বিভাষাভিত্তিক বোম্বাই রাজ্যকে দু-টুকরো করে উনিশশ' ষাট সালের পয়লা মে জন্ম হলো মহারাষ্ট্রের, গুজরাটের।

আরব সাগরের গর্জনকে ম্লান করে সেদিন মহারাষ্ট্রবাসীদের আনন্দ উৎসবের সুর ছড়িয়ে পড়েছিল দিগ্‌দিগন্তে। শিবাজীপার্ক—চৌপট্টিতে হলো ঐতিহাসিক উৎসব। দিল্লী থেকে স্বয়ং প্রধানমন্ত্রী হাজির হয়েছিলেন শিবাজীপার্ক, চৌপট্টির উৎসবে। অনেক সাংবাদিকের মত আমিও গিয়েছিলাম, গিয়েছিলাম মহারাষ্ট্রবাসীর আনন্দোৎসবের খবর দেশের দিগন্তে দিগন্তে পৌঁছে দিতে। সেদিন সে আনন্দোৎসবের দিনে চৌপট্টির জনসভায় এক বৃদ্ধকে একপাশে চুপটি করে চোখের জল ফেলতে দেখেছিলাম। সাংবাদিকের স্বাভাবিক কৌতূহল নিয়েই বৃদ্ধের কাছে গিয়েছিলাম তাঁর চোখের জলের ইতিহাস জানতে। বৃদ্ধ এড়িয়ে যাবার চেষ্টা করেছিলেন। কিন্তু পরে শুনিয়েছিলেন তাঁর চোখের জলের ইতিহাস, শুনিয়েছিলেন মিস্টার বোসের অমর অক্ষয় কীর্তি।

চৌপট্টির সভা শেষ হয়ে গেছে। লোকের ভিড় পাতলা হতে শুরু করেছে। কিন্তু তবুও আমরা দুজনের কেউই নড়তে পারিনি। অনেকক্ষণ পর একটা দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলে বৃদ্ধ বললে, ঐ বিভীষণ বোসটা কোথায় আছে জানি না, আমাদের কেউই জানে না। যদি জানত

আরব সাগরের ওপর দিয়ে একবার দৃষ্টিটা ঘুরিয়ে নিলেন বৃদ্ধ। তারপর নিজের মনেই বললেন, সে নিশ্চয়ই আজো বিলেত বা আমেরিকায় লুকিয়ে আছে। ভারতবর্ষে থাকলে নিশ্চয়ই···

আমি সেদিন শুধু মনে মনে হেসেছিলাম। মনে মনে হাসব না কেন ? যাঁদের চলার পথটা বাঁকা, যাঁরা অন্ধকার গলির মধ্যেই জীবনের পাথেয় সঞ্চয় করেছে, ভবিষ্যতের বনিয়াদ গড়েছে, তাদের জীবন তো দুঃখের হয় না ! সমাজ তো তাদের ঘৃণা করে না, শাস্তি দেয় না, প্রতিশোধ নেয় না। ভারতবর্ষের সব মানুষ বুদ্ধদেব হয়ে উঠেছি। অপরাধীকে ক্ষমা করে ভালবেসে আমরা যেন আমাদের মহত্ত্বের ঢাক বাজাচ্ছি।

তা নইলে আমাদের প্রভুদয়াল সিং আজো কেমন করে বেঁচে আছেন ? বেবী ফুডের মধ্যে পচা আটা, ময়দা, চালের গুঁড়ো মিশিয়ে ভারতবর্ষের শিশু-মৃত্যুর হার বেশ উঁচুতে রেখেছিলেন আমাদের প্রভুদয়ালজী।

দু-পাঁচ হাজার বছরের ইতিহাস আমাদের মনে বেশ উজ্জ্বল, বেশ স্পষ্ট

থাকে, কিন্তু নিকট অতীতকে বড় তাড়াতাড়ি স্মৃতি থেকে মুছে ফেলি। তাইতো ভুলে গেছি উনিশশ' চল্লিশ-বিয়াল্লিশ-পঁয়তাল্লিশের প্রভুদয়ালজীকে। আজ আমরা যে প্রভুদয়ালজীকে চিনি, তিনি কোটিপতি শিল্পপতি, তিনি কাশীধাম-পুরীধামে পুণ্যার্থীদের জন্য ধর্মশালা বানিয়েছেন, তৈরী করেছেন মন্দির, প্রতিষ্ঠা করেছেন শ্বেত পাথরের বিগ্রহ। পুণ্যকামী মানুষের আশীর্বাদ নিত্য বর্ষিত হচ্ছে একদা বেবীফুডের ব্যবসাদার প্রভুদয়ালজীর ওপর।

ইংলণ্ড-আমেরিকা-জাপান-জার্মানী বা রাশিয়ার মানুষ প্রতিটি মানুষের মধ্যে ভগবান দেখতে পায় না। দেখতে পায় না শিবকে প্রতিটি আত্মার মধ্যে বিরাজ করতে। তাই তো তারা মানুষকে শুধু মানুষের মর্যাদা দেয়, তার অতিরিক্ত কিছু নয়। আমরা মানুষের মধ্যে শিব ঠাকুর আবিষ্কার করি, নানা ব্রতপালন ও উপবাসের দিন মানুষকে পুজো করি। তাইতো শুধু ভারতবর্ষেই প্রভুদয়ালজী পাওয়া যায়, বেবীফুডের মধ্যে পচা চাল-আটা-ময়দাও শুধু এখানেই পাওয়া যায়।

বেশী দূরে যাবার দরকার নেই। এই তো পাশের দেশ আফগানিস্থান। যে দেশে একদিন বেদ রচিত হয়েছিল, সেই দেশের মানুষকে আমরা মানুষের মর্যাদা দিই না, স্বীকৃতি দিই না, বলি কাবুলিওয়ালা। এই অশিক্ষিতের দেশে কোন ধর্মশালা নেই, কোন প্রভুদয়ালজীও নেই। যদি কোন কারণে কোন প্রভুদয়ালজী আবিষ্কার হয়, তাহলে তাকে কাবুলের 'জোশন' (স্বাধীনতা উৎসব) গ্রাউণ্ডে হাজার হাজার মানুষের সামনে ইহলীলা শেষ করতে হবে। ইদানীংকালে কেউ এই চরম শাস্তি পেয়েছে বলে জানি না তবে কোন প্রভুদয়ালজীর সন্ধানও কেউ পায়নি।

আমাদের দেশে ছোরা-ছুরি, লাঠি-বন্দুক দিয়ে মানুষকে খুন করলে যা খুন করার চেষ্টা করলে ফাঁসি হয়, যাবজ্জীবন কারাদণ্ড হয়। কিন্তু যেসব মহাপুরুষরা এই মহৎ কার্জটিই ধীরে ধীরে করে, যারা ঔষধ-খাবার-দাবারে মারাত্মক ভেজাল মেশায়, তারা লক্ষজনের আশীর্বাদ কুড়িয়ে ধন্য হয়।

সত্য সেলুকাস, কী বিচিত্র এই দেশ!

আমি জীবিত হয়েও মৃত সৈনিকের অভিনয় করে চলেছি। দেখতে পাচ্ছি সব কিছু, বুঝতেও পারি সব কিছু। কিন্তু তবুও বেশ ঠুঁটো জগন্নাথ হয়ে বোসদার সঙ্গে আড্ডা দিই, প্রভুদয়ালজীর মন্দির প্রতিষ্ঠার দিন চীফ মিনিস্টারের বক্তৃতা রিপোর্ট করি।

পৃথিবীটা ঠিক সমান নয়, গোল। তাইতো যারা সোজা চলতে চায়, তারাও অনেক সময় পেরে ওঠে না। পিছলে পড়ে যায় অনেক, অনেক নীচে। তারপর? তারপর অনেকেই আরো নামতে থাকে। নামতে নামতেই একদিন শেষ হয়, মিশে যায় এই পৃথিবীর মাটিতেই। সেদিন এদের চিতার আগুন নেভাবার জন্য কলসী কলসী জল তো দূরের কথা, এক ফোঁটা চোখের জল ফেলার মত কাউকে পাওয়া যায় না।

এই তো বৌদি! কি দোষ করেছিল সে? কি অন্যায় অপরাধের জন্য সে

ছিটকে পড়েছিল ঐ অন্ধকার গুহার মধ্যে ? কোন্ পাপের জন্য এই নিরপরাধ মহীয়সী নারীকে এই জঘন্য শাস্তি পেতে হয়েছিল ? কোথায় ছিলেন ভগবান ? আত্মীয়-বন্ধু-শুভাকাঙ্খীর দল ? কোথায় ছিল সমাজ ? কোথায় ছিলেন হিন্দুধর্মের পাণ্ডারা ? এঁরা সবাই বোধহয় একসঙ্গে ছুটি নিয়েছিলেন, নয়ত কুম্ভকর্ণের নিদ্রায় সাময়িকভাবে মৃত্যু হয়েছিল এঁদের সবার।

সকাল বেলাতেই সূর্য ঢাকা পড়ল। সারা আকাশ ঘন কালো মেঘে মেঘে ছেয়ে গেল। একটিবারের জন্যও বিদ্যুৎ পর্যন্ত চমকে উঠল না, শুধুই বৃষ্টি। সব কিছু ভেসে গেল। সদানন্দবাবুর জীবনের সমস্ত আনন্দ একটি মুহূর্তের মধ্যে মিলিয়ে গেল। দুটি পা কেটে বাদ দেওয়া হলো!

চাকরিটা ঘোরাঘুরির। কখনও রেল, কখনও বাসে। কখনও পাঞ্জাবে, কখনও বা রাজস্থান, কখনও বা উত্তর প্রদেশ, মধ্যপ্রদেশ। সামান্য মাইনে, কমিশনই ভরসা। ঘোরাঘুরির তাগিদ তাই বেশী। সকালে গিয়ে রাত্রিতেই সাধারণতঃ ফিরে আসেন। তবে দূরে গেলে তা সম্ভব হয় না। কোন কোন সময় চার-পাঁচ দিনও বাইরে থাকতে হয়।

রেলে-বাসে ঘোরাঘুরির কষ্ট তো আছেই। থাকারও। ডেইলী অ্যালাউন্স —দৈনিক রাহা খরচ মোটে পাঁচ টাকা, তাই বেশীর ভাগই ধর্মশালায় বা রেলস্টেশনের ওয়েটিং রুমে। কদাচিৎ কখনও ছোটখাট হোটেলেও। এত কাণ্ড করেও পাঁচ টাকার গণ্ডীর মধ্যে নিতান্ত প্রয়োজনীয় খরচকে বন্দী করে রাখতে বেশ কষ্ট হয়। তবু সে কষ্ট হাসিমুখে সহ্য করে সদানন্দ।

বিয়ের বছর খানেকের মধ্যেই আগের চাকরিটা গেল। পুরো কোম্পানীটাই উঠে গেল। ছোট প্রাইভেট ফার্মের চাকরির সব অসুবিধাগুলোই ছিল। মাইনে কম, খাটুনি বেশী। তারপর প্রভিডেণ্ট ফাণ্ড, গ্র্যাচুইটি, বোনাস, কিছুই ছিল না। একমাত্র উপরি পাওনা ছিল বড়বাবুর অসভ্য ব্যবহার। তবু সদানন্দ মুখটি বুজে কাজ করেছে। মালতীকে সুখী করেছে।

যারা ভগবানকে ঘুষ দিতে পারে না, তাঁবেদারী করতে পারে না, অসংখ্য শিশুর কঙ্কাল দিয়ে ধর্মশালা তৈরী করতে পারে না, লাখ টাকার বিগ্রহ প্রতিষ্ঠা করতে পারে না, তাদের সুখ দিতে, শান্তি দিতে, স্বস্তি দিতে ভগবানের বড় কার্পণ্য, স্বাদ পেয়েছিল সদানন্দ, মালতী।

অনেক কষ্টে সদানন্দের অদৃষ্টে এই নতুন চাকরিটা জুটেছিল। ক্যানভাসার কাম সেল্সম্যান। চাকরিটা জোগাড় করার কষ্টের চাইতে চাকরি করার কষ্টটা ছিল আরো বেশী। তবুও অশান্ত মন শান্ত হলো। কিন্তু ভগবান সহ্য করতে পারলেন না।

ট্রেনটা ছেড়ে দিয়েছিল। দৌড়ে ধরতে গিয়েছিল সদানন্দ। হাতলটা প্রায় হাতের মধ্যে বিলীন হয়ে গেল। মাত্র বত্রিশ বছর বয়সে জীবন-নাট্যের পঞ্চম-অঙ্কে অভিনয় করতে হবে, একথা কোনদিন একটি মুহূর্তের জন্যও কল্পনা করে নি সদানন্দ। দুটি পা-ই হারাল।

মালতীর মাথায় বিনা মেঘে বজ্রাঘাত হলো। হৃদ্‌পিণ্ডটা বোধকরি হঠাৎ

থমকে দাঁড়িয়েছিল। আরউইন হাসপাতালের এমার্জেন্সী ওয়ার্ডে সদানন্দকে প্রথম দেখে একটিবারের জন্য বিকট চীৎকার করে সবকিছু থেমে গিয়েছিল। সহায়হীনা, সম্বলহীনা মালতী কর্তব্যের তাগিদে একটু চোখের জল ফেলার পর্যন্ত অবকাশ পেল না। অনেকবার ইচ্ছা করেছিল একটু প্রাণ ছেড়ে কাঁদতে। ইচ্ছা করছিল, লোকজনের ভিড় থেকে পালিয়ে গিয়ে নিস্তব্ধ যমুনা পাড়ে গিয়ে চোখের জল ফেলতে। পারেনি। আরো অনেক কিছুর মত একটু চোখের জল ফেলার সুযোগটুকুও পেল না মালতী। মাত্র ছাব্বিশ বছর বয়সে সমস্ত দুনিয়াটা যেন অন্ধকার হয়ে গেল। টলমল করে উঠল ভবিষ্যৎ।

অপারেশন থিয়েটারে নেবার আগে মালতী দস্তখত করল বণ্ডে। অপারেশনে স্বামীর মৃত্যু হলে কেউ দায়ী নয়, ঘণ্টা আড়াই অপারেশন থিয়েটারের বাইরে স্থির হয়ে দাঁড়িয়েছিল মালতী। পাশের বেঞ্চিটায় একটু বসতে পর্যন্ত ইচ্ছা করল না।

স্বামী ফিরে পেয়েছিল মালতী, কিন্তু বিকলাঙ্গ। হাঁটুর বেশ খানিকটা ওপর থেকে দুটি পা কেটে বাদ দেওয়া হয়েছে। রাস্তাঘাটে, কলকাতার গঙ্গার ধারে, বেনারসে বিশ্বনাথ মন্দিরের আশেপাশে মালতী হাত-পা কাটা মানুষ দেখেছে। তবে তাঁরা ভিখারী। ভাবতে গিয়ে কাঁটা দেয়! এরাও নিশ্চয় একদিন সুস্থ স্বাভাবিক মানুষ ছিল, সদানন্দের মত কোন দুর্ঘটনায় এরাও হারিয়েছে হাত-পা। আর ফিরে যেতে পারেনি অতীত দিনে। যাঁরা এদের সুখের দিনে আপন ছিলেন, তাঁরা দূরে সরে গেছেন। যে-সমাজের শাসন এরা মাথা পেতে গ্রহণ করেছে, সেই সমাজ এদের কোলে টেনে নেয়নি, অপাংক্তেয় করে দূরে সরিয়ে দিয়েছে। তবে কি সদানন্দও···ভাবতে গিয়ে উন্মাদ হবার উপক্রম হয় মালতী।

হাসপাতালের ওরার্ডেই সদানন্দ অনেক কথা বলতে চেয়েছে মালতীকে। পারেনি। শুধু চোখের জল ফেলতে ফেলতে বলেছে, মালতী, এ কী সর্বনাশ হলো?

স্বামীকে সমবেদনা জানাতে গিয়েও পারেনি সে। চোখের জল তাঁরও এসেছে। অনেক কথা বলতে তারও ইচ্ছা করেছে। কিছুই পারেনি, সেও শুধুই কেঁদেছে। আর বলেছে, তুমি একটু ঘুমোও।

মালতী বৌদির এসব ইতিহাস আমি কিছুই জানতাম না, জানতাম না তার মনের আগুন বা জীবন-সংগ্রামের ইতিহাস। এসব জানবার কোন কারণ বা প্রয়োজন হয়নি। কত মেয়ের জীবনেই তো কত কাহিনী লুকিয়ে আছে কিন্তু তাদের সবার সেসব কাহিনীতে আমার কি প্রয়োজন? বিধাতাপুরুষের বিরুদ্ধে তাদের অভিযোগের তদন্ত করা, বিচরে করা তো আমার কাজ নয়। বিধাতার অভিশাপের বিরুদ্ধে কে কোথায় সংগ্রাম করছেন, কে হারছেন, কে জিতছেন, তার লম্বা ফিরিস্তি রাখতে আমার কি আগ্রহ থাকতে পারে? আমি কি পারব তাদের চোখের জল মুছিয়ে দিতে? পারব কি তাদের রাহুর দশা

থেকে মুক্তি দিতে ? পারব না। কিছুই পারব না। তাই তো কোন মানুষের কোন কাহিনী জানতেই আমার আগ্রহ নেই, উৎসাহ নেই। কিন্তু তবুও অনেকের অনেক কাহিনী, অনেক ইতিহাসই জেনেছি। নিজের আগ্রহে বা অপরের তাগিদে নয়। ঘটনাচক্রে জেনেছি বা জানিয়েছে। মালতী বৌদির ইতিহাস জানারও কোন কারণ ছিল না। আজ পিছন ফিরতে গিয়ে দেখছি, তার সব কিছু জেনে ফেলেছি। হয়ত এমন কিছুও জেনেছি যা তার স্বামীও জানে না।

হিন্দী রঙ্গমঞ্চের পৃথ্বীরাজ কাপুর, মারাঠী মঞ্চের নানা পালুশকার, কলকাতার রঙ্গজগতের শিশির ভাদুড়ী, নির্মলেন্দু লাহিড়ী, লণ্ডন থিয়েটার জগতের স্যার লরেন্স-এর মত রাজধানী দিল্লীর হাফ অ্যামেচার অভিনয়-জগতের সব চাইতে উজ্জ্বল জ্যোতিষ্ক হচ্ছেন ল্যাটাদা। আমি থিয়েটার করি না, দেখিও না। একেবারেই দেখি না, তা নয়, কদাচিৎ দেখি, কিন্তু তবুও ল্যাটাদার গ্রেটনেসের কথা আমার জানতে বাকি নেই।

ল্যাটাদা শুধু উজ্জ্বল জ্যোতিষ্কই নন, বক্স অফিস হিটও! উত্তমকুমার, সুচিত্রা সেন, বৈজয়ন্তীমালা, দিলীপকুমার বা শিবাজী গণেশনের মত পোস্টারে ল্যাটাদার নাম থাকলেই হলো! আইফ্যাক্স, সপ্রু হাউস ভরে যাবে। শুধু তাই নয়। থিয়েটারের দিন কত দূর-দূরান্তর থেকে কতজনকে ব্যর্থ হয়ে ফেরত যেতে হয়। হাউস ফুল! মন্ত্রমুগ্ধের মত সবাই ল্যাটাদার অভিনয় দেখেন। অভিনয় শেষ হবার পরও অনেকে ল্যাটাদাকে দেখতে স্টেজের মধ্যে যান। একদল ছেলেমেয়ে তো তাঁর অটোগ্রাফ না নিয়েই ছাড়ে না।

ল্যাটাদার এই প্রেস্টিজ একদিনে হয় নি। অনেকদিন লেগেছে। অনেকের আশীর্বাদ, ভালবাসা পাবার পর আজ ইনি বক্স-অফিস হিট্ হয়েছেন। এদের সবার প্রতি ল্যাটাদা কৃতজ্ঞ। আজও থিয়েটার শেষ হবার পর স্টেজ থেকে নেমে আসেন অডিয়েন্সের মধ্যে, কিছু বৃদ্ধ-বৃদ্ধাকে প্রণাম করেন, সমবয়সীদের সঙ্গে শুভেচ্ছা বিনিময় করেন, ছোটদের একটু গাল টিপে আদর করেন। লুঠ করে নিয়ে যান এদের সবার আশীর্বাদ, শুভেচ্ছা।

তবে ল্যাটাদা সব চাইতে বেশী কৃতজ্ঞ লর্ড ও লেডী ওয়াভেলের প্রতি। ভুলতে পারেন না সেদিনের ইতিহাস, অনেক স্মৃতির চাপেও মরেনি সে স্মৃতি। নববর্ষ উপলক্ষে বাঙ্গালীদের থিয়েটার হচ্ছিল গোলমার্কেটের ধারে কোন্‌একটা স্কোয়ারের মাঠে। কে জানত বড়লাটের স্ত্রী লেডী ওয়াভেল বেরিয়েছেন সদ্য আগত ভাইপো-ভাইঝিকে নিয়ে দিল্লী দেখাতে। কেউ জানত না। ল্যাটাদাও না। ভাইপো-ভাইঝি যে ইণ্ডিয়ান ক্রাউড আর ইণ্ডিয়ান নেটিভদের অভিনয় দেখবার জন্য পিসিমার কাছে আবদার করে গাড়ি থামাতে বলেছিল,সে কথাই বা কে জানত ? কেউ না। হঠাৎ একদল মিলিটারী পুলিশ ভাইসরয় লজের গাড়ি নিয়ে মাঠের মধ্যে আসতে সবাই চমকে গিয়েছিলে। ল্যাটাদাই শুধু চমকে নার্ভাস হন নি। ওদিকে ভ্রূক্ষেপ না করে যথারীতি অভিনয় করেছিলেন।

বিশ্বাস করতে কষ্ট হয় কিন্তু তবুও একথা সত্যি। লেডী ওয়াভেল ভাইপো-ভাইঝিকে নিয়ে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে পুরো একটা সিন অভিনয় দেখলেন। পরে নিজে স্টেজে উঠে গিয়ে লেডী ওয়াভেল ল্যাটাদাকে অভিনন্দন জানিয়েছিলেন। বলেছিলেন, থ্যাংক ইউ ভেরী মাচ্ ফর ইওর ওয়ান্ডারফুল অ্যাক্টিং। আমি আমার স্বামীকে বলব তোমার কথা।

শুধু শুকনো প্রশংসা করেন নি লেডী ওয়াভেল। ইম্পিরিয়্যাল ব্যাঙ্ক অফ ইণ্ডিয়ার একটা একশো টাকার চেকও দিয়েছিলেন ল্যাটাদাকে।

এতটা সম্মান, ভালবাসার জন্য প্রস্তুত ছিলেন না ল্যাটাদা। এবার সত্যি কেমন যেন একটু নার্ভাস হলেন।

লেডী ওয়াভেলের ভাইপো হ্যান্ডসেক্ করে বললেন, প্ল্যাড টু মীট ইউ।

ভাইঝি তো ল্যাটাদার হাতে একটা চুমুই খেয়েছিলো। আর বলেছিলেন, কনগ্রাচুলেশনস্ ফর ইওর ওয়াণ্ডারফুল অ্যাক্টিং।

শুনেছি পরের তিন দিন ল্যাটাদা বাড়ি ফিরতে সময় পান নি। ঘরে ঘরে আদর অভ্যর্থনা নিমন্ত্রণ। গোলমার্কেটের দোকানদাররা ল্যাটাদার কাছ থেকে চা আর মিষ্টি-সিঙ্গাড়ার দাম নেওয়াও বন্ধ করে দিল। তখনও ইনি জানেন না ভবিষ্যতের গর্ভে আরো রহস্য লুকিয়ে আছে।

এক সপ্তাহ ঘুরতে-না-ঘুরতেই মিলিটারী মোটর সাইকেল রাইডার এসে ভাইসরয় ও প্রধান সেনাপতি লর্ড ওয়াভেলের ডেপুটি মিলিটারী সেক্রেটারীর একটা চিঠি দিয়ে গেল। ভাইসরয়'স হাউসে ভাইসরয়ের সামনে অভিনয় করার আমন্ত্রণ পেলেন ল্যাটাদা!

ভারতবর্ষের দণ্ড-মুণ্ডের একচ্ছত্র অধিপতি, চল্লিশ কোটি ভারতবাসীর ভাগ্যবিধাতা লর্ড ওয়াভেল মুগ্ধ হলেন ল্যাটাদার অভিনয় দেখে। নিজেই সই করা একটা সার্টিফিকেট ছাড়াও লর্ড ওয়াভেল রাজার মুকুট আঁকা একটা সোনার মেডেল দিলেন অভিনেতাকে অভিনয়ের স্বীকৃতি স্বরূপ। লেডী ওয়াভেল দিয়েছিলেন একটা ফুলের তোড়া আর একটা রোলেক্স ঘড়ি।

এরপর চা খাবার সময় ভারতের ভাগ্যবিধাতা ও ইংলণ্ডেশ্বরের প্রতিনিধি স্বয়ং ল্যাটাদাকে জিজ্ঞাসা করেছিলেন, হোয়াট ক্যান আই ডু ফর ইউ?

ল্যাটাদা তাজ্জব বনে গিয়েছিলেন প্রশ্ন শুনে। কণ্ঠস্বর রুদ্ধ হয়ে এসেছিল। কিন্তু হাজার হোক পাকা অভিনেতা। নিজেকে সামলে নিয়ে বলেছিলেন, ইওর এক্সেলেন্সী, আপনার সেবা করার সুযোগ পেলেই আমি কৃতার্থ হবো, আমার জীবন ধন্য হবে।

আবার মিলিটারী মোটর সাইকেল রাইডার। আবার ডেপুটি মিলিটারী সেক্রেটারীর চিঠি। দুদিন পরে হোম ডিপার্টমেণ্ট থেকেও চিঠি এলো। নন্-ম্যাট্রিক ল্যাটাদা হোম ডিপার্টমেণ্টে আপার ডিভিশন ক্লার্ক হলেন।

সেদিনের সে-সব স্মৃতিকে আজও ধরে রেখেছেন ল্যাটাদা। কালীবাগে ল্যাটাদার বাড়ির ড্রইংরুমে আজও সসম্ভ্রমে টাঙানো আছে লর্ড ওয়াভেলের সার্টিফিকেট।

ল্যাটাদের প্রতি লর্ড ওয়াভেলের ভালবাসার ইতিহাস এখানেই শেষ হয় নি। ভাইসরয় হাউসে একটা করে বাংলা থিয়েটার আর ল্যাটাদার একটা প্রমোশন বাৎসরিক ঘটনা ছিল। শুধু তাই নয়, রয়্যাল এয়ার ফোর্সের প্লেনে করে ল্যাটাদা দলবল নিয়ে গিয়েছিলেন বর্মার জঙ্গলে।

ভারতীয় সৈন্যদের চিত্ত বিনোদনের জন্য থিয়েটার করেছিলেন।

ল্যাটাদা আমার মত কিছু কিছু লোককে খুব প্রাইভেটলি বলেছেন, তাঁর অভিনয়-খ্যাতির কথা আজাদ হিন্দ ফৌজের কাছেও পৌঁছে যায়। ওঁদের কিছু সেপাই আর অফিসার লুকিয়ে ছদ্মবেশে থিয়েটারও দেখেছিলেন।

অবিশ্বাস করার কোন কারণ নেই। তবে যাঁরা ল্যাটাদের রাইভাল, তাঁরা বলেন, ওসব পুরোপুরিই গুল। ফোর টোয়েন্টি!

ওরা আরো অনেক কিছু বলেন। বলেন, ইংরেজের পা চেটে বড় হয়েছে তো, তাই ঐ একটু স্বদেশীপনার টাচ্ দিয়ে···

আমার কি দরকার ওসব ঝামেলার মধ্যে গিয়ে? ল্যাটাদার জীবনী তো স্কুল-কলেজের পাঠ্যপুস্তক হবে না যে তাতে কিছু অতিশয়োক্তি বা ভুল-ভ্রান্তি বা গুল থাকলে মহাভারত অশুদ্ধ হয়ে যাবে। সুতরাং ওসব নিয়ে আমি মাথা ঘামাই না।

যদি মালতীবৌদির জীবন-নাট্যের চরম দৃশ্যে ল্যাটাদার কোন পার্ট না থাকত, তাহলে আমি তাঁর জীবনের কিছুই জানতাম না, জানতে পারতামও না। যাক সে কথা।

মনে হয় ভারতবর্ষ থেকে বিদায় নেবার সময় লর্ড ওয়াভেল কানে কানে লর্ড মাউণ্টব্যাটেনকে বলেছিলেন ল্যাটাদার কথা। তা নাহলে মাউণ্টব্যাটেন আসার এক মাসের মধ্যে তাঁর আণ্ডার সেক্রেটারী হওয়া উচিত বা সম্ভব, কোনটাই ছিল না। তবে বোধহয় মাউণ্টব্যাটেন যাবার সময় পণ্ডিতজীকে কিছু বলে যেতে পারেন নি তাড়াতাড়ির জন্য। তাইতো আজও ল্যাটাদা আণ্ডার সেক্রেটারী!

মালতীবৌদি বা ল্যাটাদার কোন কিছুই আমি আগে জানতাম না। এঁদের সব কিছুই আমি পরে শুনেছি। ল্যাটাদার নাম শুনেছি, ছবি দেখেছি, অভিনয়ও দেখেছি। সাক্ষাৎ পরিচয় আগে ছিল না। মালতীবৌদিকেও আমি আগে চিনতাম না।

একদিন এক বাঙ্গালীর চায়ের দোকানে পাশের টেবিল থেকে অনেক কথা ভেসে এলো কানে।

শুনেছিস, ল্যাটাদা আবার লাট খাচ্ছে···

সে কিরে? নুটবিহারীর বিমলা কোথায় গেল?

অনেকদিন পর মনে পড়ল দুই পুরুষের কথা। মনে পড়ল নুটবিহারীকে, বিমলাকে। ল্যাটাদার প্রসঙ্গে আলোচনা হচ্ছিল। অনুমান করতে কষ্ট হলো না তাঁরই এক নায়িকাকে নিয়ে সরস আলোচনা। চা খেতে খেতেই আরো অনেক খবর কানে ভেসে এলো।

তুই দেখছি কোন খবরই রাখিস না। বিমলার তো বিয়ে হয়ে গেছে।

এত এক্সপিরিয়েন্সড মেয়েকে আবার কে বিয়ে করল রে?

তুই বড় পুরোনো কাসুন্দি ঘাঁটতে ভালবাসিস। বিয়ে করেছে, দ্যাটস অল। কোথায় কাকে, কেন, কবে কোন্ লগ্নে বিয়ে করেছে, তাতে আমাদের কি দরকার?

আমি আড় চোখে চেয়ে দেখি দিল্লীর নাট্যজগতের দুটি অতি উৎসাহী ছোকরাকে। ওরাও একবার এপাশ ওপাশ দেখে নিয়ে বলে, ল্যাটাদার লেটেস্ট বিগ গেম হচ্ছে মালতী চৌধুরী।

আলোচনাটা ঠিক রুচিসম্মত হচ্ছিল না। কিন্তু নাট্যজগতের গ্রীনরুমের খবর জানার আগ্রহে দুটো কচুরির অর্ডার দিলাম। মুখরোচক কচুরি খেতে খেতে ততোধিক মুখরোচক আলোচনা শুনলাম। শুনলাম, ল্যাটাদা আর মালতী চৌধুরীর বই এবার সুপার হিট হবেই। আর? আর দিল্লীর থিয়েটার জগতকে ফ্ল্যাট করে দেবে এই মালতী চৌধুরী।

কচুরির শেষ টুকরোটা মুখে দেবার সঙ্গে সঙ্গে কানে এলো মালতী চৌধুরীর রূপ যৌবনের বর্ণনা। বর্ণনা দেবার রকম-সকম দেখে মনে হলো শুধু ল্যাটাদা নয়, এরাও লাট খেতে শুরু করেছে।

মাস খানেকের মধ্যেই বাংলা খবরের কাগজের মধ্যে একটা হ্যাণ্ডবিল পেলাম। ল্যাটাদার আগামী প্রোডাকসনের বিজ্ঞপ্তি। কাউকে কিছু না বলে পরদিনই একটা টিকিট কিনে নিলাম।

থিয়েটারের দিন একটু সকাল সকালই গেলাম। দেখলাম, সত্যি হাউস ফুল! টিকিট না পেয়ে অনেককে ব্যর্থ মনোরথ হয়ে ঘোরাঘুরি করতেও দেখলাম। অন্য দিনের চাইতে সেদিন একটু অতিরিক্ত মনযোগ দিয়েই অভিনয় দেখলাম। ল্যাটাদার অভিনয় সুপার্ব। তবে ওভার অ্যাকটিং-এর দিকে বেশ ঝোঁক। বিশেষ করে নবাগতা নায়িকা মালতী চৌধুরীর সঙ্গে অসামাজিক প্রেমের দৃশ্যগুলিতে। নবাগতা নায়িকাকেও বেশ লাগল। হয়তো একটু আড়ষ্টতা আছে কিন্তু তার চাইতে তাঁর দেহের ও অভিনয়ের আকর্ষণ অনেক বেশী। ল্যাটাদার ক্ষমতার তারিফ না করে পারলাম না। একটা আনকোরা মেয়েকে নিয়ে এমন সাকসেসফুল প্লে করানো সহজ ব্যাপার নয়। বুঝলাম, বেশ দরদ দিয়ে শিখিয়েছেন। তখন তার বেশী কিছু জানতে পারি নি, বুঝতেও পারি নি।

পরে অবশ্য সব কিছু জেনেছিলাম। জেনেছিলাম জীবন-সংগ্রামের অজ্ঞাত, অপরিচিত অলি-গলিতে ঘোরাঘুরি করতে করতে বৌদি হাজির হয়েছিলেন ল্যাটাদের দরবারে। তার কিছুকাল আগেই 'বিমলা' বিদায় নিয়েছে। তাইতো দশ হাত দিয়ে ল্যাটাদা বৌদিকে গ্রহণ করলেন। প্রতিশ্রুতি দিলেন অভিনয় শেখাবার এবং উপযুক্ত পারিশ্রমিকের ব্যবস্থা করার। প্রতিশ্রুতি তিনি রক্ষা করেছিলেন, একথা সত্যি। তবে শুধু অভিনয় শিখিয়েই ক্ষান্ত হন নি। আরো বেশ কয়েক ধাপ এগিয়েছিলেন। কৌশলে শিষ্যার কাছ থেকে

গুরুদক্ষিণাও নিয়েছিলেন ল্যাটাদা।

শুধু ল্যাটাদা নয়, ক্লাবের আরো কয়েকজনের লোলুপ দৃষ্টি পড়েছিল ভাগ্য বিড়ম্বিতা এই নারীর ওপর। একবার মীরাটে থিয়েটার করতে গিয়েছিলেন এরা সবাই। প্রোগ্রাম ছিল তিন দিনের। প্রথম দিন দুটো সিন হতে-না-হতেই আলো নিভে গেল। চারিদিক থেকে সোরগোল উঠল। অভিনয় থেমে গেল। কিন্তু সেই অন্ধকারের সুযোগে কো-অ্যাক্টর সন্তোষবাবু হঠাৎ জড়িয়ে ধরলেন মালতীবৌদিকে। বৌদি বাধা দিয়েছিলেন, আপত্তি করেছিলেন। হাজার লোকের সোরগোলের মধ্যে বৌদির সে আপত্তি বোধ হয় সন্তোষবাবুর কানে পৌঁছয় নি। হিংস্র পশুর মত সন্তোষবাবু এক লাফে মালতীবৌদিকে টেনে নিয়েছিলেন নিজের বুকের মধ্যে, দুটি ওষ্ঠের বিষ ঢেলেছিলেন তাঁর ওষ্ঠে।

এমন ঘটনা আরো কয়েকবার ঘটেছে বৌদির জীবনে। লজ্জায় কিছু বলতে পারেন নি কাউকে, অভাবের তাড়নায় বিদ্রোহ করতে পারেন নি। একবার তো ঐ বেঁটে কালো মেক-আপম্যান চন্দ্রশেখরটা কি ভয়ঙ্কর দুঃসাহসিক কাজ করতে উদ্যত হয়েছিল। বৌদি আর স্থির থাকতে পারেন নি। এক লাথি মেরে ফেলে দিয়েছিলেন চন্দ্রশেখরকে।

শুধু একটু বেঁচে থাকবার তাগিদে বৌদি অনেক কিছুই সহ্য করছিলেন কিন্তু একদিন মনে মনে স্থির করলেন, আর নয়।

বিয়ের অনেকদিন আগে ম্যাট্রিক পাশ করেছিলেন। কিন্তু তারপর লেখা-পড়ার আর কোন চর্চা রাখতে পারেন নি। এতদিন পর হঠাৎ একদিন ইংলিশ কনভারসেশন ক্লাসে ভর্তি হলেন। ছ'মাসের কোর্স। কিন্তু মাস তিনেক পর থেকেই রিহার্সালে ফাঁকি দিয়ে এদিক-ওদিক চাকরির চেষ্টায় লেগে পড়লেন। দুটো খবরের কাগজ কিনে সদানন্দকে দিয়ে প্রায় রোজই একটা দুটো দরখাস্ত পাঠাতে লাগলেন। কয়েকটা চিঠির উত্তর এলো। ইণ্টারভিউ পেলেন। বিশেষ পছন্দ হলো না কোনটাই। অধিকাংশই ছোটখাট লোকাল ফার্ম। কোথাও রিসেপসনিস্ট, কোথাও সেলসগার্লের চাকরি। দিল্লীর লোকাল ফার্মগুলোর বড় বদনাম। নানা রকমের বদনাম।

ইংলিশ কনভারসেশন-এর কোর্স শেষ হলো, কিন্তু চাকরির বিশেষ কিছু সুবিধা হলো না।

এদিকে সদানন্দ দু বগলে দুটো ক্রাচ লাগিয়েই দু-একবার এদিক-ওদিক ঘোরাঘুরি করলেন বসে বসে যদি টুকটাক কিছু করার সুযোগ আসে। এলো না।

ওদিকে ল্যাটাদা হয়ত অনুমান করতে পেরেছিল ক্লাবে মালতীবৌদির দিন ঘনিয়ে এসেছে। হাজার হোক পাকা অভিনেতা। হিরোইনের মতিগতি না বুঝলে কি অভিনয় করা যায়। কামনালালসার জিভটা লক-লক করে উঠেছিল ল্যাটাদার মনের মধ্যে।

কয়েকদিনের মধ্যেই আগ্রাতে একটা প্রোগ্রাম নিলেন ল্যাটাদা, বেশ মোটা

টাকায় রফা করেছেন। হিরোইন মালতীবৌদির আড়াইশো, ল্যাটাদারও আড়াইশো। তারপর কেউ কেউ একশ, কেউ কেউ পঞ্চাশ। মালতীবৌদির ইচ্ছা ছিল না বাইরে যাবার। অনেক অসুবিধা। অনেক ঝঞ্ঝাট। তাছাড়া বাইরে গেলে নিজেকে বাঁচিয়ে রাখাই একটা বিরাট সমস্যা। দিল্লীতে যারা দূরে দাঁড়িয়ে কথা বলে বাইরে গেলে তারাই গায়ে হাত না দিয়ে কথা বলতে পারে না। তাছাড়া যারা ভাল, তারাও বাইরে গেলে খারাপ হয়ে যায়। একটু নেশা না করলে মুড আসে না তাদের এবং সেই মুডের ঘোরে মালতীবৌদির দেহটাই সব চাইতে প্রধান আকর্ষণীয় হয়ে ওঠে।

অনেক বার অনেক বিপদ ও বিপর্যয়ের মুখোমুখী দাঁড়াতে হয়েছে মালতীবৌদিকে। ছোটখাটো ঘটনা তো হামেশাই ঘটে যায়। চেষ্টা করেও ঠেকানো মুশকিল। দলের পাণ্ডা ল্যাটাদা নিজেও কিছু কম নন। এমন অহেতুক খাতির, যত্ন, তদারক করেন যে তা অসহ্য মনে হয়। কিন্তু তবুও সহ্য করতে হয়।

বাইরে গেলে অধিকাংশ সময়েই স্থানীয় কোন স্কুল-বাড়িতে আশ্রয় নিতে হয়। দরজা জানালাগুলো তেমন মজবুত হয় না। তাছাড়া অধিকাংশ স্কুলের ঘরগুলোর জানালায় লোহার শিক থাকে না। গরমের দিনে দরজা বন্ধ করলেও জানালা না খুলে শোবার উপায় থাকে না। জানালা টপকে ঘরে ঢুকতে অন্য কারুর সাহস হয় না। কিন্তু ল্যাটাদার কিসের ভয়?

মাঝরাতে হঠাৎ হাজির হন মালতীবৌদির ঘরে। অযাচিতভাবে একটু স্নেহ দেখিয়ে মালতীবৌদির গায়ে-মাথায় হাত দিতে দিতে প্রশ্ন করেন, বড্ড গরম, তাই না মালতী?

না, তেমন কিছু নয়।

না বললে শুনব কেন মালতী? আমি নিজেই ঘরে টিকতে পারছি না।

হাতপাখা দিয়ে হাওয়া করতে করতে ল্যাটাদা আরো একটু আদর করেন। মালতীবৌদি বাধা দেন। বলেন, আপনি শুতে যান। কেউ এমনি করে বসে থাকলে আমি ঘুমুতে পারি না।

ক্লাবের সবাই ল্যাটাদাকে ভয় করেন, ভক্তি করেন। ল্যাটাদার প্রতি মালতীবৌদির ভক্তি আছে কিনা জানি না, তবে ভয় নিশ্চয়ই করেন। তাই তো খুব বেশী কড়া হতে পারেন না।

নরম মিহি গলায় মালতীবৌদি আবার বলেন, এবার আপনি একটু বিশ্রাম নিন, নয়ত কাল আবার প্লে করতে ভীষণ কষ্ট হবে।

অন্ধকারের মধ্যে ল্যাটাদাকে দেখা যায় না! তবে তিনি যে একটু মুচকি হাসলেন, সেটুকু বুঝতে মালতীবৌদির কষ্ট হয় না।

ল্যাটাদা ঠিক আগের মতনই স্থির হয়ে বসে থাকেন মালতীবৌদির চৌকির এক পাশে। হাতটা কিন্তু স্থির থাকে না। হাতটা ঘোরাফেরা করে এদিক-ওদিক। কখনও পিঠে, কখনও গলার আশপাশে। মালতীবৌদি আড়ষ্ট হন। শাড়ীর আঁচলটা একটু টানবার চেষ্টা করেন।

ল্যাটাদা বলেন, আঃ, এই গরমে আর কাপড় জড়িও না।

ল্যাটাদার অবাধ্য হাতকে স্বাধীনতা দিতে মালতীবৌদির ভাল লাগে না। লজ্জা লাগে, ভয় লাগে, ঘৃণা লাগে। যে দেহ তিলে তিলে ধীরে ধীরে প্রস্ফুটিত হয়েছে, যার গন্ধ অনেকে পায় কিন্তু স্পর্শ পায় না, পেতে পারে না, পাবার অধিকার নেই, মালতীবৌদির সেই অনন্য সম্পদ নিয়েই রাতের অন্ধকারে খেলা করেন ল্যাটাদা। নিস্তব্ধ রাতের অন্ধকারে কামাতুর ল্যাটাদার হাতের স্পর্শে মালতীবৌদি ভয় পান, শিউরে ওঠেন। কচ্চিৎ কখনও বা হয়তো একটু শিহরণও জেগেছে।

দিল্লীতে সম্ভব হয় না, কিন্তু বাইরে গেলে কখনও কখনও ল্যাটাদা আবার মালতীবৌদির দেহসৌষ্ঠব রক্ষার চিন্তায় পাগল হয়ে ওঠেন।

না না, মালতী, মনে হচ্ছে তোমার কোমরটা একটু বেশী ভারী হয়ে উঠেছে।

পোড়া গরু সিঁদুরে মেঘ দেখলেই ভয় পায়। মালতীবৌদি বলেন, না না, আমার কোমর ঠিকই আছে। কদিন আগেও দেখেছি···

ল্যাটাদা ছাড়বার পাত্র নন। নিজে হাতে পরীক্ষা করে রায় দেন, হ্যাঁ, একটু বেড়েছে বৈকি!

প্রেসক্রিপশন করেন কিছু ফ্রি হ্যাণ্ড এক্সারসাইজ। তবে প্রেসক্রিপশন লিখেই চুপ করে থাকার মত ডাক্তার ল্যাটাদা নন।

অসহ্য মনে হয় মালতীবৌদির। অনধিকার চর্চার একটা সীমা থাকে কিন্তু ল্যাটাদার সে সীমাও নেই। বাইরে গেলে এমনি অনেক বাতিক দেখা দেয় ল্যাটাদার। তাইতো বাইরে যেতে মন চায় না। কিন্তু হাজার হোক আড়াইশো টাকা! আগ্রাতেও যান!

কথা ছিল আটটায় আরম্ভ হয়ে এগারোটার মধ্যে শেষ হবে। কি জানি কি কারণে দেরী হয়ে গেল বেশ। ইণ্টারভেলই হলো এগারোটায়। লুচি-মাংস খেয়ে, মেক্-আপ ঠিক করে আবার প্লে শুরু করতেও খানিকটা সময় লাগলো। প্লে যখন শেষ হলো তখন দেড়টা বেজে গেছে। শুতে শুতে প্রায় আড়াইটা বেজে গেল। ক্লান্ত দেহ বিছানায় আশ্রয় নিতে নিতেই ঘুমের মধ্যে ডুবে গেল। সবাই ঘুমুলেন। মালতীবৌদিও ঘুমিয়ে পড়লেন।

ঘুমটা যখন ভেঙে গেল, তখন চমকে উঠেছিলেন মালতীবৌদি। টর্চলাইট জেবলে ল্যাটাদা হুমড়ি খেয়ে মালতীবৌদিকে দেখছিলেন। এত গভীর রাতে চোরের মত এমন করে ঢোকার জন্য মালতীবৌদি জবলে উঠলেন। বিছানা ছেড়ে বসলেন। বললেন, যান, ঘরে যান। আমাকে অনেক দেখেছেন। স্টেজে ফ্লাড্ লাইটের সামনেও দেখেছেন। সুতরাং এত রাত্রে ঐ ছোট্ট টর্চের আলোয় না দেখলেও চলবে।

ল্যাটাদা মুচকি হাসেন। তবে হাসিটা যেন ঠিক আগের মত নয়। ঐ ছোট্ট টর্চের আলোয় তাঁর চোখের আগুন, মনের তৃষ্ণা দেখে মালতীবৌদি ভয় পান। নিঃশ্বাসটাও যেন কেমন ঘন, কেমন গরম। গলার পাশে সে নিঃশ্বাস

যেন আগুনের হল্কার মত মনে হচ্ছে।

ল্যাটাদা বলেন, আজ না হয় নাই গেলাম। ভাবছি তোমাকে একটু ভাল করে দেখব।

এ কথার চট করে উত্তর দেওয়া মুস্কিল! মালতীবৌদি একটু জড়সড় হয়ে সরে বসেন।

ল্যাটাদা আবার মুচকি হাসেন। বলেন, কত দূরে যাবে মালতী?

একি কথা! মালতীবৌদির মুখটা ফ্যাকাশে হয়ে যায়। চৌকির একেবারে শেষ সীমায় সরে যান।

পরের কাহিনী সবিস্তারে লেখারও নয়, জানারও নয়। মালতীবৌদি চৌকি ছেড়ে ঘরের কোণায় আশ্রয় নিয়েছিলেন। এক কোণা থেকে অন্য কোণায় ছুটে গিয়েছিলেন। ল্যাটাদার গালে ঠাস ঠাস করে চড় মেরেছিলেন, হাত কামড়ে দিয়েছিলেন। ঘর ছেড়ে বাইরে পালিয়ে যাবার চেষ্টা করেছিলেন, চীৎকার করে সবাইকে জানিয়ে দেবারও ভয় দেখিয়েছিলেন। কিন্তু সেদিন গভীর রাত্রে কামাসক্ত কাণ্ডজ্ঞানহীন ল্যাটাদাকে কিছুতেই সংযত করা সম্ভব হয় নি।

অনেকক্ষণ ধরে অনেক লড়াই, অনেক লুকোচুরির পর রাত্রির প্রায় শেষ প্রহরে ল্যাটাদা ঝাঁপ দিয়ে পড়লেন মালতীবৌদির ওপর। অর্ধমৃত নেংটি ইঁদুর নিয়ে শিকারী বিড়াল যেমন খেলা করে, ল্যাটাদাও তেমনি খেলা শুরু করে দিলেন এই ভাগ্যবিড়ম্বিতা বন্ধুহীনা যুবতীকে নিয়ে। এক টানে শাড়ীটা খুলে ছুঁড়ে ফেলে দিলেন অনেক দূরে।

ছোট্ট টর্চ লাইটের আলোয় সে দৃশ্য উপভোগ করলেন কয়েক মিনিট। তারপর আবার এগিয়ে এলেন। নিবিড় হলেন।

রাগে, হিংসায়, ঘৃণায় মালতীবৌদি থুথু দিয়েছিলেন ল্যাটাদার মুখে। মালতীবৌদির থুথু সেদিন চন্দনের মত মিষ্টি ও পবিত্র মনে হয়েছিল ল্যাটাদার। তাইতো আরো, আরো এগিয়েছিলেন। শেষ পর্যন্ত সমস্ত ইন্দ্রিয় দিয়ে মালতীবৌদির যৌবনের অনন্ত ঐশ্বর্যের পরিপূর্ণ স্বাদ গ্রহণ করলেন ল্যাটাদা।

অর্ধচেতন অবস্থায় মালতীবৌদি চৌকির ওপর পড়ে রইলেন। ল্যাটাদা যাবার সময় শুধু মন্তব্য করে গেলেন, অনেক দিন তোমাকে আমি ছেড়ে দিয়েছি। এই ক্লাবের সব মেয়েরাই গুরুদক্ষিণা দিয়েছে এবং দিতে হয়। তুমি ক্লাব ছাড়ার আগে নিজেই সে দক্ষিণা নিয়ে নিলাম। মনে কিছু করো না।

আগ্রা থেকে ফিরে এসেই মালতীবৌদি ক্লাব ছাড়লেন। ল্যাটাদা আর আপত্তি করলেন না। উপরন্তু একটা ফেয়ারওয়েল দিলেন।

নতুন চাকরির চেষ্টায় দুটো সপ্তাহ পেরিয়ে গেল। রোজকার মত সেদিনও বেরুলেন মালতী। বিকেলের দিকে বাড়ী ফিরে সদানন্দর কাছে শুনালন ল্যাটাদা এসেছিলেন।

ল্যাটাদা?

হ্যাঁ ল্যাটাদা।

কেন ? আবার কি কোন থিয়েটার নাকি

মালতী কথা শেষ করতে পারে না। সদানন্দ বলে, ল্যাটাদাকে আমার তো বেশ লাগে। অথচ তুমি যে কেন খাপ্পা, তা বুঝতে পারি না। হাজার হোক লোকটা আমাদের ভাল চায়, উপকার করে।

মালতী জিজ্ঞাসা করে, কেন, আবার নতুন কি উপকার করল ?

ঠাট্টা করো না মালতী। সত্যিই একটা ভাল খবর দিয়ে গেছেন। তুমি দেখা করলেই চাকরিটা হয়ে যাবে। মাইনেও ভাল। প্রায় পাঁচশো।

মালতী বলে, খোকার হাতের মোয়া কিনা! ল্যাটাদা বললেই পাঁচশো টাকার চাকরি হয়ে গেল আর কি!

স্বামী-স্ত্রীর তর্ক হয়। মালতী উড়িয়ে দেয়, বলে, ওসব বাজে ব্যাপার।

সদানন্দ বলে, আহা, কত জায়গাতেই তো ঘুরছ, একবার ঘুরেই এসো না।

বোধ হয় মালতীর মনে একটু দ্বিধা দেখা দেয়। ভাবে, যদি একবার দেখা করলে চাকরিটা হয়েই যায়!

পরের দিনই মালতী গিয়েছিল মিঃ দেশাই-এর সঙ্গে দেখা করতে। আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন প্লেন কোম্পানীর এরিয়া সেল্‌স ম্যানেজার। একটু নার্ভাসই হয়েছিল মালতী। বেশী দ্বিধা করেই পুস্-ডোরটা ঠেলে ঘরে ঢুকল। মিঃ দেশাই চমকে দিলেন, আসুন মিসেস চৌধুরী।

মালতী অবাক বিস্ময়ে তাকায়।

মিঃ দেশাই বলেন, এ কি, আপনার মাতৃভাষা শুনে আপনি অবাক হচ্ছেন!

নার্ভাসনেস কেটে যায়। একটু হাসির রেখা ফুটে ওঠে ঠোঁটের পাশে। মালতী বলে, আপনি তো চমৎকার বাংলা বলেন।

মিঃ দেশাই ইসারায় চেয়ারে বসার অনুরোধ করেন। নিজেও নিজের আসনে বসেন। এবার বললেন, কি আশ্চর্য! বাংলা বলব না ? জন্মেছি কলকাতায়, মানুষ হয়েছি কলকাতায়। মিত্র স্কুল থেকে ম্যাট্রিক পাশ করেছি, আশুতোষ থেকে বি-এ পাশ করেছি, রিপন কলেজে ল' পাশ করেছি। সুতরাং···

আর এগুতে হয় না। মিঃ দেশাই যে বাংলা থিয়েটারের ভীষণ ভক্ত, সেকথা শুনে অবাক হয় না মালতী। প্রাথমিক আলাপ পরিচয়ের পর্ব শেষ হয়। কাজের কথা শুরু হয় এবার।

আমি ল্যাটাদার একজন ফ্যান। তাছাড়া আমরা পরস্পরের বিশেষ ঘনিষ্ঠ বন্ধুও। ওর কাছে আমি আপনার সব কথা শুনেছি।

মালতী চমকে ওঠে। পরমুহূর্তেই নিশ্চিন্ত হয়।

মিঃ দেশাই বলেন, ল্যাটাদার কাছে আপনার দুঃখের কাহিনী শোনবার পর থেকেই ভাবছি কি করা যায় আপনার জন্য। ক'দিন আগেই একটা নতুন ওপেনিং-এর স্যাংশন আসার পর ল্যাটাদাকে ফোন করে আপনাকে খবর দিতে বলি।

মিঃ দেশাই-এর আন্তরিকতায় মুগ্ধ হন মালতীবৌদি। ধন্যবাদ জানিয়েও ছোট করতে কুণ্ঠাবোধ হয়। শুধু বলেন, আপনি মহৎ, তাই আপনি আমাকে সাহায্য করতে চাইছেন, কিন্তু আমি কি পারব এখানকার কাজ করতে ?

একটু অভিজ্ঞতা থাকলে ভাল হতো। তবে একটু চেষ্টা করলেই দু-এক মাসে শিখে নিতে পারবেন।

দিন দশেক পরে, মাসের পয়লা থেকে মালতীবৌদি তাঁর নতুন জীবন শুরু করলেন। মিঃ দেশাই-এর আস্থার মর্যাদা রেখেছিলেন তিনি। মাস খানেকের মধ্যেই কাজকর্ম শিখেছিলেন।

প্রথম মাসের মাইনে পেয়ে মালতী আর সদানন্দ গিয়ে প্রণাম করে এসেছিল ল্যাটাদাকে। ল্যাটাদা বলেছিলেন, মালতী, আমি জানি আমার অনেক দুর্নাম। তার কিছুটা সত্যি, কিছুটা মিথ্যে। আমি হয়তো তোমাদের মত অত ভাল নই, তবে মানুষের ভাল করতে পারলে আমি বড় আনন্দ পাই, তৃপ্তি পাই।

একবার যেন মালতীবৌদির সন্দেহ হয়, এও কি অভিনয় ? না, তাতো নয়। তিনি নিজেও তো অভিনয় করেছেন অনেক দিন।

ল্যাটাদা একটু থেমে যান। দৃষ্টিটা কেমন যেন ঝাপসা হয়। আবার শুরু করেন, যাদের কোন চুলোয় জায়গা হয় না, তাদের নিয়েই আমার ক্লাব। কোন জায়গায় যাদের দু'মুঠো জোটবার সম্ভাবনা নেই, তাদেরই দু'মুঠো অন্ন দেবার জন্য আমার অভিনয়।

বিদায় দেবার আগে ল্যাটাদা বলেন, আমি জানি মালতী তুমি আমাকে ঘেন্না কর। তবে তুমি জেনে রাখ, আমি তোমাকে শ্রদ্ধা করি, ভালবাসি, স্নেহ করি। জীবনের যে কোন প্রয়োজনে তুমি আমার কাছে আসতে পার এবং আমি সানন্দে তোমাদের সাহায্য করবার চেষ্টা করব।

মালতীবৌদি জীবন-নাট্যের এসব দৃশ্যের অভিনয় অনেকদিন আগেই করেছেন। আজ আরো এগিয়ে এসেছেন। মাইনে পাঁচশ' থেকে আটশ' হয়েছে। আরো অনেক কিছু হয়েছে। মিঃ দেশাই-এর এক শালা ডিফেন্স মিনিষ্ট্রির জয়েণ্ট সেক্রেটারী। তাঁরই সাহায্যে সদানন্দ পুণায় গিয়ে দুটি কৃত্রিম পা লাগতে পেরেছে। সাধারণতঃ যুদ্ধে আহত সৈন্যদের জন্য ব্যবস্থা হলেও স্পেশ্যাল কেস হিসাবে সদানন্দও দেশরক্ষা দপ্তরের সাহায্য পেয়েছে। অনেক খরচ লাগার কথা কিন্তু তাও বিশেষ লাগে নি। আজকাল আর দু-বগলে ক্রাচ লাগিয়ে চলতে হয় না। পরের কৃপাপ্রার্থী হতে হয় না তাকে। হাঁটা-চলা তো বটেই, দৌড়-ঝাঁপও করতে পারে সদানন্দ।

অভিনেত্রী মালতী চৌধুরী দিল্লীর থিয়েটার রসিকদের স্মৃতি থেকে বিদায় নিয়েছে। ক্যানভাসার-কাম-সেল্সম্যান সদানন্দকেও ভুলে গেছে সবাই। দরিয়াগঞ্জের মালতী প্রিণ্টিং ওয়ার্কস-এর মালিক হচ্ছেন সদানন্দ চৌধুরী।

মিঃ দেশাই-এর সঙ্গে আমার পরিচয় বহুদিনের। যখন দিল্লীতে আমার পরিচয়ের গণ্ডী যথেষ্ট সীমাবদ্ধ ছিল, তখন মিঃ দেশাইকে পেয়ে অনেকটা

স্বস্তি পেয়েছিলাম। ভাল কচুরি খাবার লোভ হলেই মিসেস দেশাইকে টেলিফোন করি, দিদি, কাল রাত্তিরে স্বপ্ন দেখলাম আপনার বাড়ীতে আমি কচুরি খাচ্ছি।

দিদি বলেন, শুধু কচুরি?

ইচ্ছা তো করে আরো কিছু পাই, কিন্তু লজ্জায় বলতে পারি কই!

মিঃ দেশাই-এর ড্রইংরুমে বসে একদিন দিদির নিজের হাতের তৈরি কচুরী খাবার সময়ই মালতীবৌদির সঙ্গে আমার আলাপ।

আজ আমি শুধু দিদিরই প্রাইভেট সেক্রেটারী নই, মালতীবৌদিরও।

সদানন্দদা-মালতীবৌদির জীবন থেকে অমাবস্যার অন্ধকার বিদায় নিয়েছে। এখন পূর্ব দিকের সোনালী আলো ছড়িয়ে পড়েছে ওদের জীবনে। হাসি-খুশি আনন্দ-তৃপ্তি সার্থকতায় দু'টি জীবন ঝলমল করে উঠেছে আবার।

আমরা সবাই খুশি। কিন্তু হয়তো যে মানুষটি সব চাইতে বেশী খুশি হতেন, যিনি এই সুখের প্রাসাদের ভিত্তি প্রস্তর স্থাপন করেছিলেন, সেই ল্যাটাদাই আজ আর নেই। শুধু দুই পুরুষ, মিশরকুমারী, সিরাজদ্দৌল্লা, সীতা, আলমগীর, কেদার রায়, চন্দ্রগুপ্ত, তটিনীর বিচার, দুর্গাদাস, নিষ্কৃতি, পরিণীতা, বিপ্রদাস, মেবার পতন, সাজাহান নয়, জীবন-নাট্যের সমস্ত অভিনয় থেকে তিনি ছুটি নিয়েছেন।

বেঁচে থাকতে ল্যাটাদাকে ঠিক শ্রদ্ধা করতে পারেন নি মালতীবৌদি। আর আজ? আজ মালতীবৌদির ড্রইংরুমে একটাই ছবি আছে। সেটা ল্যাটাদার। সদানন্দদা বাড়ী না থাকলে মালতীবৌদি তুলে নেন ঐ ফটোটা, হয়তো লুকিয়ে একটু আদরও করেন।

॥ তিন ॥

দিনের বেলার সূর্যের কথা না হয় বাদই দিলাম। রাত্রের আকাশের দিকে তাকালে শুধু চাঁদই দেখতে পাওয়া যায় না, দেখা যায় অসংখ্য গ্রহ, নক্ষত্র। এদের মধ্যে কেউ বড়, কেউ ছোট! কেউ বেশী উজ্জ্বল, কেউ কম। কারুর গুরুত্ব বেশী, কারুর কম। কেউ বা কাছে, কেউ দূরে।

আমরা যারা পৃথিবীর মানুষ তারা সবাইকে চিনি না, জানি না। মঙ্গল শুক্র বা শনিগ্রহ ছাড়া হয়ত সপ্তর্ষিমণ্ডলকে চিনতে পারি। ওদের স্বভাব, চরিত্র, বৈশিষ্ট্যের কিছু কিছু খবর রাখি, কিন্তু দিগন্তবিস্তৃত আকাশে এরাই তো সব নয়। আরো অনেকে আছে। তাদের খবর রাখার তাগিদ আমাদের বড় কম।

সমাজ-সংসার আমাদের চারপাশে যে অসংখ্য মানুষের ভীড়, তাদের মধ্যে আমরা শুধু চিনে রেখেছি জেনে রেখেছি মঙ্গল-শুক্র-শনিগ্রহ ও সপ্তর্ষিমণ্ডলকে।

খবরের কাগজের স্পেশ্যাল করেস্‌পনডেণ্টের চাকরি করতে গিয়ে বিচরণ করতে হয় স্বর্গ, মর্ত্য, পাতাল। দেখা পাওয়া যায় তিন দুনিয়ার নানা মানুষের, নানা চরিত্রের।

কবে, কখন, কোথায় কার সঙ্গে আলাপ হয়ে যায়, তার হিসাব রাখাও সম্ভব নয়। এত লোকের সঙ্গে আলাপ হয় যে খেয়ালই থাকে না। বাজপেয়ী সাহেবের সঙ্গে কবে, কোথায়, কখন, কেমন করে আলাপ হয়েছিল, সে কথা আমার মনে নেই। তবে এইটুকু মনে আছে, জেনারেল ইলেকশনে হেরে যাবার পরই বাজপেয়ী সাহেব হঠাৎ রাজনীতিতে খুব বেশী সক্রিয় হয়ে উঠলেন। সাধারণতঃ নির্বাচনে হেরে যাবার পর বাজপেয়ী সাহেবের সমগোত্রীয়রা হারিয়ে যান জনারণ্যের ভীড়ে। রাম-শ্যাম-যদু-মধুর মতন বাজপেয়ী সাহেব সাধারণ মানুষ নন। তিনি শুধু বর্তমানই দেখেন না, ভবিষ্যতের দিকেও সতর্ক দৃষ্টি রাখেন। ভবিষ্যতের দিকে সেই সতর্ক দৃষ্টি রেখেই বাজপেয়ী সাহেব অস্বাভাবিক সক্রিয় হয়ে উঠলেন রাজনীতিতে। ইলেকশনে হেরে যাবার সমস্ত গ্লানি সরিয়ে দিয়ে তিনি স্বচ্ছন্দে বিচরণ শুরু করলেন ভারতের রাজনীতির সর্বোচ্চ মহলে।

বাজপেয়ী সাহেব অতীতে জমিদার ছিলেন। এখন জমি হারিয়েছেন কিন্তু কারখানার মালিক হয়েছেন। নায়েব মশাই-এর ঘরে জেনারেল ম্যানেজার বসেন। অতীতের নাচঘর এখন বোর্ড অফ ডাইরেক্টর্স'দের মিটিং রুম হয়েছে। ন্যাংটো মেয়েদের ছবি আঁকা যে ঘরে আগে জমিদার শঙ্করনাথ বাজপেয়ী জরির তাকিয়া হেলান দিয়ে রাজ্য শাসন বা দুঃশাসন করতেন, এখন সেই ঘরে বসেই তিনি ম্যানেজিং ডাইরেক্টর-চেয়ারম্যানের কাজ চালান। আর বিশেষ

কিছু পরিবর্তন হয়নি। শুধু তাকিয়া বিদায় নিয়ে মেহগনী কাঠের কিছু নতুন ফার্নিচার এসেছে। আর দেওয়ালের একদিকে নতুন কারখানার ফটো ঝুলছে।

সরকার জমিদারী কেড়ে নিলেন কিন্তু বাজপেয়ী সাহেবের আয় বেড়ে গেল। অনেক নগদ টাকাও হাতে এলো। জমিগুলো সরকার নিয়ে নিলো। বিনিময়ে মোটা অঙ্কের ক্ষতিপূরণ। পতিত জমিগুলোর জন্যও সমান ক্ষতিপূরণ এলো। বড় বড় শহরে যে প্রাসাদগুলো ছিল, সেগুলো ব্যক্তিগত সম্পত্তি বলে সরকার হাত দিলেন না। দার্জিলিং, কার্শিয়াং, কলকাতা, পাটনা, দ্বারভাঙ্গা, মুসৌরী, নিউ দিল্লীর প্রাসাদগুলো বাজপেয়ী সাহেবেরই থেকে গেল।

জমিদারীতে অনাথ হবার পর বাজপেয়ী সাহেব রাতারাতি দেশপ্রেমিক হলেন। সিল্ক ছেড়ে খদ্দর ধরলেন। ঘোড়ার গাড়ী বাতিল করে মোটর গাড়ী ধরলেন।

এসব খবর আমরা সবাই জানতাম। আরোও কিছু কিছু খবর জানতাম। জানতাম, প্রাইম মিনিস্টার লণ্ডন গেলে উনিও যেতেন। কোন ধাক্কাধাক্কি বা ঝামেলা না করেই প্রাইম মিনিস্টারের পাশে দাঁড়িয়ে হেঁ-হেঁ করে হাসতে হাসতে ছবি তুলতেন। প্রাইম মিনিস্টার নিউইয়র্ক গেলে বাজপেয়ী সাহেবও যেতেন শ্রদ্ধা জানাতে।

এসব আমরা জানতে পারতাম। কিন্তু কেউ জানতে পারত না যে বড় বড় সেক্রেটারীরা, বিদেশ গেলেও বাজপেয়ী সাহেব যেতেন তাঁদের সাহচর্য উপভোগের জন্য! মিনিস্টার বিদেশে গেলে খবরের কাগজে রিপোর্ট ছাপা হয়। সেক্রেটারীরা গেলে সব সময় কাগজে খবর ছাপা হয় না। রোম, জেনেভা, লণ্ডন, নিউইয়র্ক, মস্কো বা টোকিও থেকে রয়টার বা অ্যাসো-সিয়েটেড প্রেস মন্ত্রীদের খবর পাঠায়, কিন্তু সেক্রেটারীদের আগমন-নির্গমনের খবর রাখার প্রয়োজন বোধ করে না। বেচারা ফরেন করেসপনডেণ্টরা তো জানে না যে দিল্লীতে উদ্যোগ ভবনের সেক্শন অফিসারদের শ্রীচরণে তৈল মর্দনের জন্য বড় বড় কোম্পানী হাজার হাজার টাকা মাইনের অফিসার রাখে। সেক্রেটারীদের কথা তো ছেড়ে দিলাম।

এমনি করে আমাদের সবার চোখ ফাঁকি দিয়ে বাজপেয়ী সাহেব বেশ একটা মাঝারি ধরনের ভি-আই-পি হয়ে উঠলেন। দেখতে দেখতে ডজন তিন-চার কমিটির সদস্যও হলেন।

একটির পর একটি পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা শেষ হলো। ভাকরা-নাঙ্গাল, ডি-ভি-সি, ময়ূরাক্ষী তৈরী হলো।

বায়স্কোপে সে সব দেখান হলো। প্রদর্শনী করা হলো। হাটে-ঘাটে-মাঠে ও পার্লামেণ্টে লক্ষ লক্ষ বক্তৃতা দেওয়া হল। জাপান-জার্মান রাশিয়া-আমেরিকার সার্টিফিকেট জোগাড় করা হলো। আমাদের চাষীরা তবুও বলদ ছেড়ে ট্রাক্টর ধরল না, গোবরের সার ত্যাগ করে অ্যামোনিয়া ফসফেট ব্যবহার

করা শিখল না। শেষে রেডিওকে বলা হলো, চাষীদের শিক্ষার আসর চালু কর। অল-ইণ্ডিয়া রেডিওর আণ্ডারগ্র্যাজুয়েট প্রোগ্রাম-এক্সিকিউটিভ থিয়েটার রোড-পার্ক স্ট্রীট-ম্যাণ্ডেভিলা গার্ডেনের মেমসাহেবদের বক্তৃতা দেবার নেমন্তন্ন করলেন। তারা ছাদে টবের মধ্যে পটল চাষের পরামর্শ দিলেন, অভিজ্ঞতার বর্ণনা দিলেন। পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা আরো এগিয়ে চলে। লাট সাহেবের প্রাসাদের লনে প্রদর্শনী হয়। পরের দিন সকালে দেড় মণ ওজনের কুমড়ো, এক কিলো ওজনের একটা পটল, তিন ফুট লম্বা একটা কলার ছবি ছাপা হলো সমস্ত খবরের কাগজে। চাষীদের উৎসাহ দেবার জন্য আরো অনেক কিছু করা হলো। বাজেটে টাকা বাড়ল, মন্ত্রী-সেক্রেটারীর দল উৎসাহ পেল কিন্তু প্রোলেটারীয়েট চাষীরা যে তিমিরে সে তিমিরেই থেকে গেল।

কুচ পরোয়া নেই। একদিকে বলা হলো সোস্যালিজম করা হবে, অন্যদিকে ভিক্ষার ঝুলি নিয়ে হাই-পাওয়ার ডেলিগেশন রওনা হলেন নিউইয়র্ক। গম চাই, চাল চাই।

এই হাই-পাওয়ার ডেলিগেশনে বাজপেয়ী সাহেবও স্থান পেলেন। পালামের মাটি ছেড়ে আকাশে উড়বার আগে গলাবন্ধ কোট পরে, ব্রিফ কেস হাতে নিয়ে সবাই ছবি তুললেন।

সপ্তাহ দুয়েকের মধ্যেই ডেলিগেশন আবার দেশে ফিরে এলেন। দু হাত নয়, দশ হাত ভর্তি করে ফিরে এলেন। হাজার হাজার লক্ষ লক্ষ টন গম চাল ছাড়াও টেরিলিনের স্যুট, শার্ট, ট্রানজিস্টার, টেপরেকর্ডারও নিয়ে এলেন হাই-পাওয়ার ডেলিগেশন-এর সদস্যরা।

দেশের লক্ষ লক্ষ কোটি কোটি মানুষ হাঁড়ি চড়িয়ে বসে ছিল ডেলিগেশনের আশায়। হাতে সময় একেবারেই ছিল না। হুড়মুড় করে ফিরে আসতে হয়েছিল। কোনমতে এক ফাঁকে একটু সময় করে নিয়ে বাজপেয়ী সাহেব একটা কোলাবরেশনের ব্যবস্থা করেছিলেন।

তাড়াহুড়োর জন্য বাজপেয়ী সাহেব আরো অনেক কিছুই করতে পারেন নি। ইচ্ছা ছিল বন্ধুবান্ধবদের একটু ভালভাবে আপ্যায়ন করেন। পারেন নি। নিউইয়র্কের ভাল ভাল নাইট ক্লাবগুলোতেও যেতে পারেন নি। একদিন ফিফটি ফাইভ স্ট্রীটে 'ব্লু এঞ্জেল'-এ গিয়েছিলেন আর দিল্লী রওনা হবার আগের দিন সারা সন্ধ্যা, সারা রাত্তিরটা 'ইজিপশিয়ান গার্ডেনস্'-এ বেলী ডান্সারদের নাচ দেখানো ছাড়া কিছুই সম্ভব হয় নি।

বাজপেয়ী সাহেব মর্মাহত হলেও তাঁর বিচরণ সরকারী বন্ধুরা ক্ষুণ্ণ হন নি। তাঁরা জানেন, ভারত সরকার যা ডেইলী অ্যালাউন্স দেন, তা দিয়ে নিউইয়র্কে সন্ধ্যাবেলায় কোন হরিসভায় গিয়ে কীর্তন শোনাও সম্ভব নয়। সুতরাং বাজপেয়ী না থাকলে তো...

যাকগে সেসব কথা। জমিদার শঙ্করনাথ বাজপেয়ী আরো উঠলেন। চড় চড় করে উঠলেন।

কিছুকাল বাদে মিসেস বাজপেয়ীও স্টেজে নামলেন। মিস্টার বাজপেয়ীর

আর্থিক প্রতিপত্তি ম্লান হয়ে গেল। এক সপ্তাহে দেড় কোটি টাকার সেভিংস সার্টিফিকেট বিক্রী করে রাজধানীর ইলাইট সোসাইটির ললনাকুলের সব চাইতে উজ্জ্বল জ্যোতিষ্ক হলেন মিসেস বাজপেয়ী।

কফি হাউসের আড্ডাখানায় কিছু আজেবাজে লোক কুৎসিত ইঙ্গিত করলেও মিসেস বাজপেয়ীর কৃতিত্বকে অস্বীকার করা অন্যায় হবে। তবে একথাও সত্য মিসেস বাজপেয়ীর রূপ ছিল, লাবণ্য ছিল, যৌবন চলে গেলেও আকর্ষণ যথেষ্টই ছিল। সূর্য অস্ত গেলেও আলো বিদায় নেয় না। দুপুর-বেলার চাইতে গোধূলী অনেক মিষ্টি, অনেক বেশী আকর্ষণীয়। তাই বোধহয় মিসেস বাজপেয়ীকে এখনও অনেক বেশী মিষ্টি, অনেক বেশী তৃপ্তির মনে হয়।

প্রথম দিন যখন আমি দেখি তখন ভাবতে পারিনি গোধূলি বলে। ভেবেছিলাম প্রভাত বেলার প্রথম স্পর্শ। যৌবনের মধ্যাহ্ন যে পালিয়ে গেছে, আর ফিরবে না, ফিরতে পারে না, কল্পনাও করি নি। আমার দুটি চোখের পাতায় যেন একটু সুরমা লেগে গিয়েছিল।

রাজধানীর রঙ্গমঞ্চ থেকে মিস্টার বাজপেয়ী হঠাৎ কোথায় হারিয়ে গেলেন। একবার যেন মনে হয়েছিল, তাঁর অভিনয়ের পালা শেষ হয়েছে।

খবরের কাগজের স্টাফ রিপোর্টারদের মত স্পেশ্যাল করেসপনডেণ্টদের এক্তিয়ার স্বর্গ-মর্ত্য-পাতাল পর্যন্ত ব্যাপ্ত নয়। পাটের গুদামে অগ্নিকাণ্ড, চিড়িয়াখানায় নতুন অতিথির আবির্ভাব ও তিরোধান, সমবায় সমিতির পানের দোকানের উদ্বোধনে মন্ত্রীর বক্তৃতা, বৃষ্টির জলে লবণের স্বাদ, খরা-অতিবৃষ্টি-বন্যা, ট্রাফিক জ্যাম, পুলিশ অফিসারের অকস্মাৎ বদলী, রবীন্দ্রজয়ন্তী, নববর্ষ, টাকায় দশ সের ইলিশ মাছ, জামাইষষ্ঠীতে পঁচিশ টাকায় এক কিলো সন্দেশ ইত্যাদি ইত্যাদি সব কিছুই স্টাফ রিপোর্টারদের এক্তিয়ার। স্পেশ্যাল করেসপনডেণ্টরা শুধু সর্বভারতীয় ও আন্তর্জাতিক রাজনীতির ক্ষেত্রেই বন্দী।

মিসেস বাজপেয়ী তাই ঠিক আমার এক্তিয়ারে ছিলেন না। কিন্তু যেভাবে অপ্রতিহত গতিতে উপরে উঠতে শুরু করেছিলেন, তখন খেয়াল না করে উপায় থাকে নি। প্রত্যক্ষ যোগাযোগ না রাখলেও নজর এড়িয়ে চলতে পারি নি। তাছাড়া টপ পলিটিক্যাল সার্কেলে ছাড়াও টপ ডিপ্লোম্যাটিক সার্কেলেও মিসেস বাজপেয়ীর যোগাযোগ বড় নিবিড় হয়ে উঠছিল। কখনও খবরের তাগিদে, কখনও সামাজিক প্রয়োজনে ডিপ্লোম্যাটিক পার্টিতে যেতেই হতো। আর সেই সব পার্টিতে মিসেস বাজপেয়ীর জনপ্রিয়তা দেখে মুগ্ধ হতাম।

মিসেস বাজপেয়ীর রূপ ছিল, যৌবন ছিল। আমার মত ছোকরাদের কাছে এর আকর্ষণ অনেক। কিন্তু আমার কাছে তার চাইতেও বড় আকর্ষণ ছিল তাঁর দেশপ্রেম। ভারতবর্ষের প্রতি ভালবাসা। ভারতবর্ষের কোটি কোটি দরিদ্র মানুষের প্রতি তাঁর দরদ। কোটিপতির পাশে বসে শ্যাম্পেন বা ফ্রেঞ্চ ওয়াইন-এর গেলাস হাতে নিয়েও ভুলতে পারতেন না নিজের দেশের সেইসব মানুষদের, যারা একমুষ্টি অন্নের জন্য মন্দিরে যায়, দারোগার পা জড়িয়ে

ধরে, ভদ্দরলোকদের দ্বারে দ্বারে ঘুরে বেড়ায়।

ভগবান এই পৃথিবীতে কিছু কিছু দুর্লভ চরিত্রের নারী পুরুষ পাঠান, যাঁরা শুধু পরের সেবায় নিজেদের জীবন উৎসর্গ করেন। একটি মুহূর্ত অপচয় না করে শুধু কাজ করে যান। বিনিময়ে কোন প্রত্যাশাও এরা করেন না। এরা প্রশংসা চান না, হাততালি চান না, খবরের কাগজে ছবি ছাপাতে চান না। চান না অর্থ, চান না মন্ত্রীত্ব।

এই ধরনের দুর্লভ চরিত্রের নারী পুরুষ পৃথিবীর অন্যান্য দেশে খুব বেশী না থাকলেও আমাদের ভারতবর্ষে নেহাৎ কম নেই। আমরা ভাগ্যবান। হাজার হোক বুদ্ধদেব, গান্ধীজীর দেশ তো!

মিসেস বাজপেয়ীও এই ধরনের দুর্লভ চরিত্রের একজন অনন্যা।

এই তো সেবার চীন হিমালয় টপকে এদিকে এলে কি অসাধারণ কাণ্ডটাই না করলেন। কোটিপতি শঙ্কর বাজপেয়ীর স্ত্রী দেশের সেই চরম দুর্যোগের দিনে চোখের জল সামলাতে পারেন নি। ঐশ্বর্য, ঐতিহ্যকে পিছনে ফেলে, নিজের সুখ-শান্তি, আহার-নিদ্রা বিসর্জন দিয়ে ঝাঁপ দিলেন দেশের কাজে। দ্বারে দ্বারে ভিক্ষার ঝুলি নিয়ে হাজির হলেন। ভারতবর্ষের মানুষের অন্তরাত্মা এখনও মরেনি, দেশপ্রেমের ধারা একেবারে শুকিয়ে যায় নি। তাইতো তাঁরা ব্যর্থ করেন নি মিসেস বাজপেয়ীকে।

খুব বেশী দিন নয়, মাত্র সপ্তাহ দুয়েকের প্রচেষ্টায় অসাধ্য সাধন করলেন মিসেস বাজপেয়ী। কয়েক লক্ষ নগদ টাকা ছাড়াও অসংখ্য জিনিস সংগ্রহ করলেন। কয়েক হাজার বোতল হুইস্কী, রাম, বিয়ার, জিনও ভিক্ষা পেলেন। আরো পেলেন, পেলেন অনেক কিছু। ডিপ্লোম্যাটিক এনক্লেভের নিজের প্রাসাদের দুটি বিরাট লিভিংরুম ভরে গেল।

মিসেস বাজপেয়ী তবু থামেন না। আরো এগিয়ে যান। আরো কয়েক লক্ষ টাকা সংগ্রহের জন্য নতুন উদ্যমে এগিয়ে যান। তাঁর সে শুভ প্রচেষ্টা ব্যর্থ হয়নি, দিল্লীর নারীপুরুষ নির্বিশেষে উপলব্ধি করেছিলেন এই মহীয়সী দেশপ্রেমিকার অন্তরের বাণী।

মাস তিনেক পরে একদিন সুপ্রভাতে মহা ধুমধাম করে কয়েক ডজন প্রেস ফটোগ্রাফারকে সাক্ষী রেখে এক অনন্য দেশপ্রেমিক মন্ত্রীর হাতে সমর্পণ করলেন তাঁর সংগৃহীত সব কিছু। মন্ত্রীপ্রবর মিসেস বাজপেয়ীর দেশপ্রেমে মুগ্ধ হয়ে একটা ছোট সুন্দর বক্তৃতা দিলেন, মুভী ক্যামেরার দিকে মুখ করে ছলছল চোখে দেশবাসীর উদ্দেশ্যে আরো, আরো অনেক স্বার্থত্যাগ করার আবেদন করলেন। চারদিক থেকে হাততালি পড়ল। অধোবদনে বিনম্র চিত্তে মিসেস বাজপেয়ী সমস্ত প্রশংসার ঊর্ধ্বে নিজেকে সরিয়ে রাখলেন।

মিসেস বাজপেয়ীর এসব কীর্তি, কাহিনী, আত্মত্যাগ সবাই জানত। আমিও জানতাম। অনেকের মত দূর থেকে আমিও হয়তো তাঁকে শ্রদ্ধাও করতাম। রাজধানীর নিত্যকার রঙ্গমঞ্চে এমনি অনেক নারীপুরুষ নিয়মিত অভিনয় করেন। কেউ দুটি একটি দৃশ্যে অভিনয় করেই বিদায় নেন, কেউ বা

দীর্ঘদিন ধরে অভিনয় করতে করতে অকস্মাৎ একদিন সবাইকে চমকে দিয়ে নায়ক নায়িকার ভূমিকায় আত্মপ্রকাশ করেন। তাইতো অত অসংখ্য চরিত্রের প্রতি নজর রাখা আমার মত অপদার্থ সাংবাদিকের পক্ষে সম্ভব হতো না। মিসেস বাজপেয়ীর প্রতি যে ভবিষ্যতেও নজর দিতে হবে, তাও ভাবি নি। কিন্তু একদিন—

দিল্লীর হাড় কাঁপানো কনকনে শীতের চরম দুঃখের দিনে পার্লামেণ্টের যে বাজেট অধিবেশন শুরু হয়েছিল, প্রায় একশ কুড়ি ডিগ্রী গরমের মধ্যে মে মাসের বারবেলায় সেই অধিবেশন শেষ হলো। এম· পি-দের সঙ্গে সঙ্গে আমরাও হাঁপ ছেড়ে বাঁচলাম।

পরের দুটো দিন আর ঘর থেকে বেরুলামই না। বেলা ন'টা কি সাড়ে ন'টা পর্যন্ত ঘুমোলাম। পাঁচ-সাত কাপ বেড-টি খেয়ে, আট-দশটা সিগারেট উড়িয়ে খবরের কাগজ পড়লাম। তারপর কয়েকটা টেলিফোন এলো, গেল। বেলা তিনটেয় লাঞ্চ, চারটেয় টি। আবার টেলিফোন। আবার চা।

বিকেল গড়িয়ে সন্ধ্যা নেমে এলো। দিনের আলো পালিয়ে আবছা অন্ধকার চারপাশে আস্তে আস্তে ভীড় জমাতে লাগল। ঘরের মধ্যে আর নিজেকে বন্দী করে রাখতে পারলাম না।

বেরিয়ে পড়লাম। ভাবনা চিন্তা না করেই বেরিয়ে পড়লাম। কোথায় যাব, কার কাছে যাব, কি করব, কোন কিছুই না ভেবে বেরিয়ে পড়লাম। ঝোঁকের মাথায় অনেক সময়ই আমি অমনি বেরিয়ে পড়ি। আজও বেরুলাম।

গাড়ীতে স্টার্ট দিয়ে অলি-গলি ডিঙিয়ে লিংক রোডে পড়লাম। ডানদিকে না বাঁ দিকে যাব, ভাবতে ভাবতে ডান দিকেই স্টিয়ারিং ঘুরে গেল। লোদী হোটেল পাশে রেখে লোদী রোড পার হলাম। ওবেরয় ইণ্টার-কণ্টিনেণ্টাল হোটেলের গা ঘেঁষে ওয়েলেসলী রোড ধরে এগুতে এগুতে ইণ্ডিয়া গেট পার হলাম।

সামনেই কার্জন রোড। কিন্তু আর একবার স্টিয়ারিংটা ঘুরে গেল। শেষ পর্যন্ত হাজির হলাম ক্যাপ্টেন বড়ুয়ার আস্তানায়। পেলাম না। এলাম এয়ার ফোর্সের 'সেণ্ট্রাল ভিস্তা' মেসে। সামনের ব্লকটা ছাড়িয়ে পিছনের লাউঞ্জ-এর দিকে এগুতেই দেখি স্কোয়াড্রন লীডার আলু সেন গাড়ীতে স্টার্ট দিচ্ছে। এক সহকর্মী হঠাৎ অসুস্থ হয়ে পড়ায় আলু সেনের স্পেশ্যাল ডিউটি পড়েছে।

সকাল বেলাতেই খবর পেয়েছিল। কিন্তু সারা রাত্রি ডিউটি দেবার আগে একটু দিবানিদ্রা দিতে গিয়ে দেরী হয়ে গেছে আলু সেনের। স্ট্যাণ্ডার্ড হেরল্ডের স্টিয়ারিং ঘোরাতে ঘোরাতে আলু সেন বললো, জার্নালিস্ট, রিয়েলি সরি। কাল আসিস।

আমি শুধু বললাম, মুভ অন, বেবী। আই নীড কম্পানী টু-ডে, নট টুমরো।

আলু সেন গাড়ীটা পুরো ঘুরিয়ে নিল, কেন রে? কাল বুঝি দেবী টুর করে ফিরবেন?

মুচকি হেসে আলু সেন বিদায় নিল। আমি সেণ্ট্রাল ভিস্তা মেস থেকে বেরিয়ে আসতে আসতে একটা সিগারেট ধরিয়ে আবার গাড়ীতে বসলাম।

আজ ঠিক মনে নেই সেদিন সে সন্ধ্যায় কেন ও কি ভাবে মালতীবৌদির আস্তানায় হাজির হলাম। ভেবেছিলাম এতদিন পর হাজির হয়ে মালতীবৌদি ও সদানন্দদাকে চমকে দেব। তারপর কিছু খাতির ভালবাসা উপভোগ করব। হাসি-ঠাট্টা গল্প-গুজব চা-কফির পর্ব শেষ হতে হতে বেশ রাত হবে। মালতীবৌদি বলবে খেয়ে যেতে। সদানন্দদা বলবেন, এ কথা আর জিজ্ঞাসা করার কি আছে মালতী! আমি প্রবল আপত্তি করব, কিন্তু শেষ পর্যন্ত মাত্র খানকয়েক লুচি খেতে রাজী হবো। শেষ পর্যন্ত অবশ্য আমার প্রয়োজন ও ক্ষমতার অতিরিক্তই খাব এবং মধ্য রাত্রির প্রাক্কালে বিদায় নেবার আগে মালতীবৌদিকে নিয়মমাফিক ধন্যবাদ জানিয়ে ছোট করব না। শুধু বলব, রোজ রোজ খাঁটি ঘি-এর লুচি খাইয়ে আমার লিভারটায় আর সর্বনাশ করো না। সামনের রবিবার খাঁটি ডালডায় ভেজে কড়াইশুঁটির কচুরি খেতে দিও।

সদানন্দদা আমার কথা শুনে মুচকি মুচকি হাসবেন আর মালতীবৌদি বলবেন, অত ভণিতা না করে সোজাসুজি বললেই হয় কড়াইশুঁটির কচুরি খেতে ইচ্ছে হয়েছে।

প্ল্যান না করলেও মালতীবৌদির ওখানে গিয়ে আরো অনেক মজা, অনেক আনন্দ হয়। তাইতো সেদিনও অনেক প্রত্যাশা নিয়ে গিয়েছিলাম। কিন্তু বিধাতাপুরুষ সব ভণ্ডুল করে দিলেন।

শুনেছি ভগবানের দয়ার শেষ নেই। তিনি নাকি দয়ার অবতার, সর্ব-মঙ্গলময়। অথচ আমি তো দেখি তিনি মানুষকে দুঃখ দিতে শিরোমণি মশাই। এই লক্ষ লক্ষ কোটি কোটি মানুষের সুখ-দুঃখের কণ্ট্রোল রুমের অফিসার-ইন্-চার্জ হয়ে বোধকরি বিধাতাপুরুষের আর একটু কাণ্ডজ্ঞান থাকা উচিত ছিল। অংকশাস্ত্রে আর একটু জ্ঞান অর্জন করার পরই এতগুলো মানুষের জীবনের হিসাব-নিকাশ যোগ-বিয়োগ-গুণ-ভাগ করা উচিত ছিল। আমরা সোস্যালিস্ট হবার পর বিধাতাপুরুষ এই চাকরিটা পান নি। যখন তিনি এই চাকরিটা পেয়েছিলেন তখন পাবলিক সার্ভিস কমিশন কাজ শুরু করে নি। এমনভাবে বিধাতাপুরুষ কাজটি জোগাড় করেছেন যে শত আন্দোলন করেও তাঁকে এই পদ থেকে হঠানো সম্ভব নয়। তইতো এতগুলো মানুষের জীবনের হিসাব-নিকাশ ওলট-পালট করে দিলেও কিছু করা সম্ভব হচ্ছে না।

সেদিন সন্ধ্যায় মালতীবৌয়ির আস্তানায় পেঁছিবার পর অতীতের অনেকবারের মত আবার বিধাতাপুরুষের নতুন কিছু ত্রুটি-বিচ্যুতি নজরে পড়ল। শুধু যে আমার কপালে খাঁটি ঘি-এর লুচি জুটল না, তা নয়। মিসেস বাজপেয়ীর মত অনন্যা মহিলার ক্ষেত্রেও যে ভাগ্যবিধাতা এমন করে হিসাব-নিকাশের গরমিল্ল করবেন ভাবি নি। আর ভাবি নি, মিসেস বাজপেয়ীর জীবন-সাগরের ঢেউ আমাদের পর্যন্ত তলিয়ে নিয়ে যাবে। কত কিছুই তো

ভাবি নি, আশা করি নি, কিন্তু আমার ভাবনা-চিন্তা আশা-আকাঙ্ক্ষার বাইরেও তো অনেক কিছুই ঘটল, ভবিষ্যতেও ঘটবে। সবই বুঝি। তবুও চমকে গিয়েছিলাম সেদিন।...

মালতীবৌদি শুয়ে শুয়ে কাঁদছিলেন। সদানন্দদা পাথরের মূর্তির মত নিশ্চল হয়ে ওপাশের ঘরে বসেছিলেন। আমি ঘরে ঢুকে বেশ কিছুক্ষণ চুপচাপ দাঁড়িয়ে রইলাম। তারপর সদানন্দদা বললেন, বসো। আমি তবুও বসতে পারলাম না, স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে রইলাম। আরো কিছু সময় কেটে গেল! সদানন্দদা এবার বললেন, তোমার বৌদির এক বিশেষ বন্ধু আজ সুইসাইড করেছেন। সারা দিনে এক ফোঁটা জলও মুখে দেয় নি। যদি পার ওকে কিছু খাওয়াও।

ঘণ্টা দুয়েকের চেষ্টায় মালতীবৌদিকে শুধু এক গেলাস দুধ খাইয়েছিলাম। দুধ খাবার পর আবার বালিশে মুখ গুঁজে বিছানায় লুটিয়ে পড়ল।

পরের দিন সব কথা শুনলাম।

সে অনেক দিন আগেকার কথা। চন্দ্রিকাপ্রসাদজী জমিদারপুত্র হয়েও শুধু বেনারসের বাঈজীবাড়ীতে জীবন কাটাতে চাননি। তাই তো তিনি কোনমতে ঐ জমিদারবাড়ীর নাগপাশ থেকে নিজেকে মুক্ত করে লক্ষ্মৌ গিয়েছিলেন লেখাপড়া শিখতে। একটা নয়, দুটো নয়, তিন-তিনটে পাশ করে এই বিখ্যাত বংশের প্রথম ও একমাত্র গ্রাজুয়েট হলেন। গ্রাজুয়েট পুত্রের অভ্যর্থনার জন্য পিতা বিরাট উৎসবের আয়োজন করলেন। বাজী পোড়ানো হলো, ভোজসভা বসল, সারা রাত্তির ধরে সেরা বাঈজীদের নাচ হলো। বিশিষ্ট অতিথিদের জন্য শুদ্ধ বিলাতী মদও দেওয়া হলো অকৃপণভাবে।

সেদিনের সে উৎসবের অন্যান্য বিশিষ্ট অতিথিদের মধ্যে সেসনজজ লিটন সাহেবও এসেছিলেন। বাঈজীদের নাচ দেখতে দেখতেই এক ফাঁকে তিনি চন্দ্রিকাপ্রসাদজীকে বললেন, তোমাদের তো এত টাকা আছে, হোয়াই নট গো টু ইংল্যাণ্ড ফর হায়ার স্টাডিজ? তা ছাড়া তুমি যখন আইডিল অ্যাণ্ড ল্যাভিস জমিদারী লাইফের চাইতে লেখাপড়া করাই বেশী পছন্দ কর...

ঐ বাজীগুলো পুড়ে ছাই হয়ে যাবার পরে, বাঈজীগুলো ক্লান্তিতে ঘুমিয়ে পড়বার পরে, মদের বোতলগুলো নিঃশেষ হবার পরে চন্দ্রিকাপ্রসাদজী আর দেরী করেন নি। সোজা চলে গিয়েছিলেন লিটন সাহেবের বাংলোয়। ঠিক হলো চন্দ্রিকাপ্রসাদজী ব্যারিস্টারী পড়বেন এবং লিটন সাহেব তাঁর কিছু বন্ধুবান্ধবকে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা করবার জন্য চিঠিপত্র দিয়ে দেবেন। চন্দ্রিকাপ্রসাদজী জানতেন যে তড়িৎগতিতে তাঁর পরিকল্পনা কার্যকরী না করলে পিতার খামখেয়ালীতে সব কিছু ভেসে যাবে।

লিটন সাহেবের চিঠিপত্রের উত্তর এসে গেল। বন্ধুবান্ধবরা আশ্বাস দিলেন সাহায্য করবার। জাহাজের ক্যাবিন বুক করাও হলো। জামা-কাপড় দিয়ে ট্রাঙ্ক-সুটকেস পর্যন্ত গোছানো হয়ে যাবার পর চন্দ্রিকাপ্রসাদজী পিতার

আশীর্বাদ ও অনুমতি চাইলেন। বৃদ্ধ পিতা প্রথমে চমকে উঠলেন কিন্তু যখন দেখলেন সব উদ্যোগ আয়োজন সম্পূর্ণ, তখন আর আপত্তি করলেন না।

বিদায়-প্রাক্কালে বৃদ্ধ পিতা পূজা-পার্বণ করালেন। নিজেদের গৃহদেবতা সত্যনারায়ণের বিরাট ভোগ দিলেন। সেই পূজার নির্মাল্য ও প্রসাদ খাবার পর এক শুভ দিনে শুভ মুহূর্তে চন্দ্রিকাপ্রসাদজী কলকাতা যাত্রা করলেন। তারপর বোম্বে। তারপর এডেন, পোর্ট-সৈয়দ, নেপলস হয়ে লণ্ডন।

চন্দ্রিকাপ্রসাদজী এক নাগাড়ে পাঁচ বছর বিলাতে ছিলেন। গ্রেস ইন থেকে ব্যারিস্টারী পাশ করার পরও দেশে ফিরলেন না। লেখাপড়ার চর্চায় মেতে রইলেন। পাঁচ বছর পর বৃদ্ধ পিতার পীড়াপীড়িতে দেশে ফিরতেই হলো। দেশে প্রত্যাবর্তনের কিছুদিনের মধ্যেই চন্দ্রিকাপ্রসাদজীর বিয়ে হলো। চন্দ্রিকাপ্রসাদজী আপত্তি করেছিলেন কিন্তু পিতা-মাতা সে আপত্তি অগ্রাহ্য করেছিলেন। ইচ্ছা সহকারে বিয়ে না করলেও চন্দ্রিকাপ্রসাদজী কোনদিনের জন্য স্ত্রীকে অনাদর করেন নি।

বছর কয়েক বাদে চন্দ্রিকাপ্রসাদজীর প্রথম পুত্রের জন্ম হলো। পুত্রের জন্মের কিছুকাল পরে চন্দ্রিকাপ্রসাদজী আবার লণ্ডন গেলেন। বছরখানেক পর আবার দেশে ফিরে এলেন।

তারপর ধীরে ধীরে পিতা-মাতার মৃত্যু হলো। জমিদারীর দায়দায়িত্ব নিজের উপর এসে পড়ল। কিন্তু জমিদারীর গুরু দায়িত্ব বহনের অবসরেও লেখাপড়া বা আইনচর্চা ত্যাগ করলেন না। মাঝে মাঝে বিলাতবাসের অভ্যাসও ছাড়লেন না।

তারপর একদিন চন্দ্রিকাপ্রসাদজীর একমাত্র পুত্রও গ্রাজুয়েট হলেন। সে পুত্র অক্সফোর্ডে পড়বার জন্য বিলেত যাত্রা করলেন। বছর পাঁচেক পরে সে পুত্র দেশে প্রত্যাবর্তনের আগে পিতার কাছে অনুমতি চাইলেন এক বান্ধবীকে বিবাহ করবার জন্য। মেয়েটিও অক্সফোর্ডের ছাত্রী ও সুদর্শনা তবে সে পিতৃমাতৃহীন।

চন্দ্রিকাপ্রসাদজী আপত্তি করেন নি। পুত্র ও পুত্রবধূ দেশে ফিরলেন। উৎসব আনন্দে সবাই মাতোয়ারা হয়ে উঠলেন।

শিক্ষিতা পুত্রবধূ পেয়ে চন্দ্রিকাপ্রসাদজী খুব খুশি। সভা-সমিতি ও পার্টিতে সগর্বে পুত্রবধূর পরিচয় করিয়ে দেন সবার সঙ্গে। কাজকর্ম ও পড়াশোনার মধ্যে অবসর মত পুত্রবধূর সঙ্গে নানা গল্পগুজবও করেন বৃদ্ধ চন্দ্রিকাপ্রসাদজী। একদিন এমন এক অবসরে শুনলেন পুত্রবধূর পরিবারের কাহিনী। শুধু চমকে নয়, যেন আঁতকেও উঠেছিলেন সে কাহিনী শুনে।

এই ঘটনার কিছুকালের মধ্যেই চন্দ্রিকাপ্রসাদজী রহস্যজনকভাবে বিষক্রিয়ায় মারা যান। পোস্টমর্টম রিপোর্টে বলা হয়েছিল যে খাদ্যের মধ্যে কোন মারাত্মক বিষ থাকায় তাঁর মৃত্যু হয়েছে। কেউ কেউ সন্দেহ করেছিলেন চন্দ্রিকাপ্রসাদজী আত্মহত্যা করেছেন, কেউ কেউ ভাবলেন কোন চক্রান্তকারী কোন স্বার্থসিদ্ধির জন্য এ কাজ করেছে। অনেক দিন ধরে গোয়েন্দা বিভাগের

অনেক বড় বড় অফিসার তদন্ত করেও কোন হদিস পেলেন না। দিনে দিনে তিলে তিলে চন্দ্রিকাপ্রসাদজীর মৃত্যুর বিয়োগ-বেদনা সবই ভুলে গেলেন। স্মৃতির তলায় চাপা পড়ল চন্দ্রিকাপ্রসাদজীর আকস্মিক ও রহস্যজনক মৃত্যু-কাহিনী।

বছরের পর বছর কেটে গেল। দিল্লীর ডিপ্লোম্যাটিক এনক্লেভের এক প্রাসাদতুল্য বাড়ীর দোতলার কোণার বেডরুমে চন্দ্রিকাপ্রসাজীর পুত্রবধূ আমাদের অতিখ্যাতা মিসেস বাজপেয়ী অকস্মাৎ আত্মহত্যা করলেন। তবে এবার গোয়েন্দা লাগিয়ে রহস্য উদ্ধারের প্রয়োজন হয় নি। মিসেস বাজপেয়ী নিজেই সব রহস্যের যবনিকাপাত করে কিছু চিঠিপত্র রেখে গিয়েছিলেন। শুধু নিজের মৃত্যুর নয়, বৃদ্ধ চন্দ্রিকাপ্রসাদজীর মৃত্যুর রহস্যও উদ্ধার করেছিলেন মিসেস বাজপেয়ী।

মালতীবৌদি শুয়ে শুয়েই আমাকে এসব কাহিনী শোনালেন। তারপর বালিশের নীচে থেকে একটা মোটা চিঠি আমার হাতে দিয়ে বললেন, বাবলু, পড়ে দেখ। ভগবানের খামখেয়ালীর জন্য কিভাবে একটা নিরপরাধ নিষ্পাপ মেয়ে জীবন আহুতি দিতে বাধ্য হলো।...

ভাই মালতী,

তুই তো জানিস আমি কোনদিনই সুখী হতে পারলাম না। অতি শৈশবে বাবাকে হারালাম। লণ্ডনের মত জায়গায় সেই সেকালে মা চাকরি করে সংসার চালাতেন। এখনকার মত তখন লণ্ডনে এত ভারতীয়ের ভীড় ছিল না। ভারতীয় মেয়েরা তো দূরের কথা, ছেলেরাই তখন বিশেষ চাকরি-বাকরি করত না। প্রায় সবাই পড়াশোনার জন্যেই ওখানে যেত। মা সাধারণ মধ্যবিত্ত বাঙ্গালী ঘরের মেয়ে হলেও অসাধারণ চরিত্রের ছিলেন। বিলেতে গিয়ে একজন অবাঙ্গালী ছাত্রের সঙ্গে তাঁর ভালবাসা ও বিয়ে হয়। বছর দুয়েক পরে আমার জন্ম হলো। কিন্তু জ্ঞান হবার পর শুনলাম বাবা মারা গেছেন। আমাকে নিয়ে বাংলা দেশে ফিরে বসবাস করা অসম্ভব হলেও নতুন করে বিয়ে করে লণ্ডনে বাস করতে মা-র পক্ষে বিন্দুমাত্র অসুবিধা হতো না। তাছাড়া রূপে গুণে আমার মা-র তুলনা করা যায় এমন ভারতীয় মেয়ে বিলেতে দুর্লভ ছিল। অনেক ভাল ভাল ছেলেরা মাকে বিয়ে করতে চেয়েছিলেন, কিন্তু মা শুধু বলতেন, স্বয়ং বিদ্যাসাগর মশাই যখন বিধবা বিবাহ চালু করতে পারেন নি, তখন আপনারা আমার মত একটা বিধবার বিয়ে দিয়ে কি ভারতীয়দের মধ্যে বিধবা বিবাহ চালু করতে পারবেন?

আমি অক্সফোর্ডে পড়বার সময়ই হঠাৎ মা মারা গেলেন! মা মারা যাবার পর আবিষ্কার করলাম ব্যাঙ্কে বেশ কিছু জমিয়ে রেখে গেছেন আমার পড়াশোনা ও অন্যান্য প্রয়োজনের জন্য। তারপর তো বাজপেয়ীকে বিয়ে করে দেশে এলাম।

প্রথম দু-চার বছর বেশ আনন্দে কাটল। শ্বশুরমশাই অত্যন্ত স্নেহ করতেন, স্বামীও যথেষ্ট ভালবাসে। জমিদারবাড়ীর প্রাচুর্যের সঙ্গে এই স্নেহ-

ভালবাসায় আমি মুগ্ধ হয়ে গিয়েছিলাম। কিন্তু ক'বছর পরে যখন আবিষ্কার করলাম সন্তানের পিতা হবার যোগ্যতা আমার স্বামীর নেই, তখন বড্ড আঘাত পেলাম।

মালতী, তুই তো জানিস সে সময়ের কথা। আমি তো প্রায় উন্মাদ হয়ে গিয়েছিলাম, প্রায় বছর খানেক শয্যাশায়ী থাকলেও তোদের মত কয়েকজন বন্ধুর সাহায্যে একদিন আমি আবার স্বাভাবিক হলাম। তবে বাজপেয়ীকে সহ্য করতে পারতাম না। ওকে দেখলেই আমার সর্বাঙ্গ জ্বলে যেত। ওর বাড়ীঘরদোর ঐশ্বর্য পর্যন্ত আমি সহ্য করতে পারতাম না। তাইতো প্রথমে তোদের থিয়েটার নিয়ে এবং পরে আরো অনেক কিছু নিয়ে মেতে উঠলাম। ঠিক দেশপ্রেমের জন্য যে পাগল হয়ে উঠেছিলাম তা নয়। শুধু নিজের নারী-জীবনের ব্যর্থতা ও বাজপেয়ীর স্মৃতিকে চাপা দেবার জন্যই এত কাজে আমি মেতে থাকতাম।

তুই তো জানিস আমাকে নিয়ে দিল্লীর ডিপ্লোম্যাটিক ও অফিসিয়াল সার্কেলে বেশ সরস আলোচনা হয়। অনেক সহৃদয় ও সুপ্রতিষ্ঠিত মানুষই আমার কাছে অনেকবার অনেক চমৎকার প্রস্তাব করেছেন। অনেক অনেক রকম ফাঁদ পেতে আমাকে শিকার করবার চেষ্টা করেছেন। ব্যর্থতায় রাগে হিংসায় এই পশুগুলো শেষপর্যন্ত আমার কুৎসা রটিয়ে বেড়াত। আমি সেসবও গ্রাহ্য করি নি।

কিন্তু একদিন হঠাৎ শ্বশুর মশাই-এর কিছু পুরানো কাগজপত্র ও ডায়েরী আমার হাতে এসে পড়ল। এইসব কাগজপত্র ও ডায়েরী পড়ার পর আমার পক্ষে আর এক মুহূর্তও বেঁচে থাকা সম্ভব নয়। জানিস মালতী, আমার শ্বশুর চন্দ্রিকাপ্রসাদজীই আমার মাকে বিয়ে করেছিলেন এবং চন্দ্রিকাপ্রসাদজীই আমার জন্মদাতা! আমার জন্মের পরও ওদের দুজনের যোগাযোগ হতো, তবে লুকিয়ে লুকিয়ে। আমার জন্মদাতা ও শ্বশুর যে মাঝে মাঝে বিলেত যেতেন, তার কারণ আমার মা। মা-কে উনি খুব শ্রদ্ধা করতেন, ভালবাসতেন। তাছাড়া মা-কে বেশীদিন না দেখে উনি থাকতে পারতেন না। আমার মা একটা চাকরি করতেন সত্য। তবে এই জমিদারী থেকেই মা-র কাছে নিয়মিত টাকা যেত বেনামী হয়ে এবং সেই অর্থের জন্যই আমরা বেশ ভালো ভাবেই দিন কাটিয়েছি। অক্সফোর্ডে পড়তে অনেক টাকার দরকার এবং মা সে টাকা কোথা থেকে জোগাড় করতেন, সেদিন ভেবে দেখি নি। আজ জানলাম সে টাকা কোথা থেকে কে দিয়েছিলেন।

অক্সফোর্ডে পড়বার সময় বাজপেয়ীর সঙ্গে আলাপ হয়, কিন্তু মা-র সঙ্গে আলাপ করাতে পারি নি। ভেবেছিলাম অক্সফোর্ড থেকে বেরুবার পর মা-র সঙ্গে আলাপ পরিচয় করিয়ে বিয়ে করার অনুমতি চাইব, কিন্তু ভগবান আমাকে সে সুযোগ দিলেন না। মা তার আগেই মারা গেলেন। মা বেঁচে থাকলে এবং মা-র সঙ্গে বাজপেয়ীর পরিচয় হলে, তিনি নিশ্চয়ই এ বিয়ে হতে দিতেন না। কিন্তু বিধাতাপুরুষ আমার জীবনটা নিয়ে মাতলামী করবার

জন্য প্রয়োজনীয় সব কিছু আয়োজন সম্পূর্ণ করে রেখেছিলেন ।

ভাই মালতী এবার বল, আমি আর কোন্ আকর্ষণে ও প্রয়োজনের জন্য এই দুনিয়ায় থাকব। বাবা-মা, ভাই-বোন, স্বামী-পুত্রের জন্যই এই দুনিয়াটা মধুর মনে হয়, কিন্তু আমার মত সর্বহারা কোন্ অধিকারে বাঁচবে ?

আমি তাই চললাম। তুই বাজপেয়ীকে বলিস, আমাকে যেন সে ক্ষমা করে ।

তোদের ভাগ্যহীনা
আরতি

মালতীবৌদি থিয়েটার করা ছেড়ে ছিয়েছেন বহুকাল। ল্যাটাদার মত পাকা অভিনেতার সঙ্গে আজ আর তাঁর কোন যোগাযোগ নেই। তাইতো কোনদিন আশা করি নি মালতীবৌদির আস্তানায় বসে বসে এমন চমৎকার একটা নাটক দেখার সুযোগ পাব।

অনেক রাত হয়েছিল। আমি আর দেরী না করে বাসায় ফিরে এলাম। খাওয়া-দাওয়া না করেই শুয়ে পড়লাম, কিন্তু পোড়া চোখে কিছুতেই ঘুম এলো না। চোখের সামনে যেন সিনেমার পর্দায় মিসেস বাজপেয়ীর ঘটনা-বহুল জীবনের প্রতিটি কাহিনী ভেসে উঠেছিল। শেষে কত রাত্রে কখন যে ঘুমিয়ে পড়েছিলাম ঠিক জানি না।

পরের দিন ঘুম ভাঙল বেশ বেলায়। পাশ ফিরে শুয়ে শুয়েই চায়ের কাপে চুমুক দিলাম। তারপর খবরের কাগজগুলো টেনে নিলাম। প্রথম পাতা পড়বার পর কাগজটা ঘুরিয়ে নিয়ে পিছনের পাতা পড়তে গিয়ে দেখলাম মিস্টার বাজপেয়ীও গতকাল সকালে আত্মহত্যা করেছেন। বেশী কিছু ঝঞ্ঝাট ঝামেলা না করে মিস্টার বাজপেয়ী রিভলবারের মাত্র দুটি বুলেট খরচ করেই এতবড় নাটকটার ড্রপ সিন টেনে দিয়েছেন।

॥ চার ॥

পুরোনো দিনগুলো কোথায় যেন হারিয়ে যায়, হারিয়ে গেছে। আজ যেন মনেই পড়ে না হাড় কনকনে শীত পড়েছিল। মনে করতে ইচ্ছেও করে না। আজ কি ভাবা যায় চার চারটে উলের জামা পরে সেদিন দিনের বেলা বেরুতে হতো ? রাত্রে ? বাপ্‌রে বাপ ! সে কথা ভাবতে গেলেও গা শিউরে ওঠে।

পুরোনো দিনের কথা সব সময় মনে পড়ে না। মনে হয় যেন তারা হারিয়ে গেছে। কিন্তু সত্যিই কি অতীত দিনের স্মৃতি হারিয়ে যায় ? না, না, কখনই না। রাতের আকাশ হাজার-হাজার, লক্ষ-লক্ষ, কোটি-কোটি তারায় ভরে থাকে। দিনের বেলা ? লুকোচুরি খেলতে খেলতে লুকিয়ে পড়ে। মজা করে আমাদের সঙ্গে।

পুরোনো দিনের কথা, ফেলে আসা দিনের স্মৃতি রোমন্থন করতে আমার খুব ভাল লাগে। অতীত তো একদিন বর্তমান ছিল। আজ না হয় সেদিনের বর্তমান একটু বুড়ো হয়ে অতীত হয়েছে। তাই বলে তাকে দূরে ঠেলে দেব ? আমিও দিই না, মালতীবৌদিও না। তাইতো মালতীবৌদির সঙ্গে আমার এত ভাব, এত ভালবাসা। এই একই কারণে সদানন্দদাও আমাকে ভালবাসেন।

আজ যখন মালতীবৌদি স্কাই কলারের মাইশোর সিল্কের শাড়ি-ব্লাউজ পরে পৃথিবী বিখ্যাত ঐ এয়ার লাইন্সের অফিসে বসে দেশী-বিদেশী প্যাসেঞ্জারদের সঙ্গে কথাবার্তা বলেন, তখন কি কেউ ভাবতে পারবে তাঁর অতীত দিনের কথা ? কেউ কল্পনা করতে পারবে শুধু একমুষ্টি অন্নের জন্য, স্বামীর চিকিৎসার জন্য ইনি অর্থের বিনিময়ে অভিনয় করতেন ? গ্রীনরুমে ঐ বোম্বেটে মেক-আপ ম্যানটা পর্যন্ত ঠোঁটে লাল টকটকে লিপষ্টিক লাগাতে লাগাতে বলত, আপনার ঠোঁটটা ভারী সুন্দর।

মালতীবৌদি শুধু ভ্রূ-কুঁচকে বিরক্তি প্রকাশ করত, কিন্তু কিছু বলতে পারত না। ওপেনিং সিনেই শেফালী আর কাশ্মীরী গেটের ঐ কুচ্ছিত মেয়েটার পার্ট। ওরা দুজনেই উইং স্ক্রীনের পাশে চলে গেছে। শুধু ওরা নয়, সবাই এখন ষ্টেজের ওদিকে। এক্ষুনি ড্রপ-সিন উঠবে, অভিনয় শুরু হবে।

বোম্বেটেটা এসব জানে। পরের সিনেই মালতীবৌদির এনট্রান্স। মেক-আপ নিতে দেরী হলেই সর্বনাশ। ঐ হতচ্ছাড়াটাকে চটাবার উপায় নেই। সামাজিক বই হলে মালতীবৌদি কেয়ার করতেন না, নিজেই যা হয় করে নিতেন, কিন্তু ঐতিহাসিক বইতে তা সম্ভব নয়। মেক-আপ ম্যান ছাড়া উপায় নেই।

মেক-আপ ম্যান হলধরবাবু—হলধরবাবু না ছাই—শুধু হলধর, ঐ ন্যাকড়ার টুকরোটা দিয়ে মালতীবৌদির ঠোঁটটা পরিষ্কার করে দিল। মালতীবৌদি জিজ্ঞাসা করলেন, মুছে ফেল্লেন কেন ?

'একটু ভুল হয়ে গেছে।'

'কই ? ঠিকই তো ছিল।'

হলধর দিল্লীর মেক-আপ ম্যান হলে কি হবে ? কলকাতায় ফিল্ম-ষ্টুডিও'র টুকটাক খবরাখবর রাখে। হয়ত বা একবার-আধবার কাউকে ধরে স্যুটিং-ট্যুটিংও দেখেছে। ও জানে কলকাতার ষ্টুডিওতে হিরোইনকে ম্যাডাম বলা হয়। হলধরও তাই হিরোইনদের ম্যাডাম বলে।

হলধর বললো, ম্যডাম, আপনার চোখ আর আমার চোখে অনেক পার্থক্য। আমি তো অম্বিকার মত মেক-আপ ম্যান না। অনেক হিসেব-নিকেশ করে মেক-আপ দিতে হয়। ফেস-কাটিং আর ঠোঁটের কায়দা বুঝে লিপষ্টিক লাগাতে হয়।

হলধরের লেকচার শুনতে মালতীবৌদির বিন্দুমাত্র ইচ্ছা হতো না। বললেন, নিন নিন তাড়াতাড়ি করুন টাইম হয়ে গেছে।

হতচ্ছাড়া উত্তর দিল, এই ত ড্রপসিন উঠল। এই ফার্স্ট সিন শেষ হতে অন্তত আঠারো মিনিট লাগবে।

অর্থাৎ ? অর্থাৎ ব্যস্ত হয়ো না মালতী ! তোমাকে একটু আদর করে, একটু ভালবেসে মেক-আপ দিতে দাও। দিল্লীর কয়েক শ' কি হাজার খানেক মেয়েকে রং মাখিয়েছে এই হলধর। একবার শুধু কেয়া'র হাতের একটা থাপ্পড় ছাড়া হলধরের অদৃষ্টে আর কোন বিপদ আসে নি।

মেয়েদের রং মাখাতে মাখাতে হলধরের মনেও রং লাগে। রক্ত চঞ্চল হয়ে ওঠে। আচরণ অসংযত হয়।

হলধর যে সুবিধার লোক নয়, একথা দিল্লীর থিয়েটার মহলের সবাই জানে। ছেলেরা-মেয়েরা সবাই জানে। সবার সঙ্গে হলধর দুষ্টুমি না করলেও একটু এদিক-ওদিক করেই। দিল্লীর কিছু কিছু এ্যাকট্রেসরাও যেন কেমন কেমন। অনেকে আছেন যারা অভিনয় করার জন্য অভিনয় করেন না, প্রেষ্টিজ বাড়াবার জন্য অভিনয় করেন। এইত চাণক্যপুরীর মিসেস মজুমদার ! কেন ডিফেন্স কলোনীর মিসেস পালিত ? অভিনয় তো করেন ঘোড়ার ডিম। অথচ ঢং দেখলে হাসি পায়। দুজনের কারুরই বয়স কম হয়নি। যৌবন কবে পালিয়ে গেছে। প্রৌঢ়ত্বের পর্যন্ত রিটায়ার করার বয়স হয়ে এলো, কিন্তু এখনও কি বিচ্ছিরি লো-কাট রাউণ্ড নেকের ব্লাউজ পরেন। দুজনেরই স্বামীর বয়স হয়েছে, কিন্তু তাঁরাও এখনও ছোকরা সাজেন। নিজেদের শখে না স্ত্রীর দাবড় খেয়ে, তা জানি না। তবে এখনও কলেজের ছোকরাদের মত টি-সার্ট পরেন রোজ সন্ধ্যাবেলায়। দুটো-একটা মিড্‌ডে বিয়ার পার্টিতে মিঃ মজুমদারকে তো স্পোর্টস-উয়ার পরেও আসতে দেখি।

ওরা যা ইচ্ছে তাই করুক। আমার তাতে কি আসে যায় ? তবে বলছিলাম ঐ হলধর বোম্বেটের কথা। একটু বেশি কমার্শিয়াল হবার জন্য মিসেস মজুমদার আর মিসেস পালিত হলধরকে কি স্বাধীনতাই না দেন ! সমাজে লব্ধপ্রতিষ্ঠ মানুষদের স্ত্রীদের নিয়ে এমনি খেলা করতে করতে লোভে হলধরের

জিভটা লকলক করে। আর করবে নাই বা কেন ? রাত দুপুরে ছোট্ট একটা ঘরে হলধর যদি বছরের পর বছর মেয়েদের রং মাখায়, সাজিয়ে-গুজিয়ে দেয় তবে দোষ কি ?

যাকগে ওসব ছাইভস্ম আলোচনা। ঐ হতচ্ছাড়াটা মালতীবৌদির দিকেও অভ্যাস মত হাত বাড়িয়েছিল। লিপষ্টিক মুছে আবার নতুন করে লিপষ্টিক লাগাবার মাঝখানে হঠাৎ আচমকা মালতীবৌদির ঠোঁটের স্বাদ নিয়েছিল ঐ বাঁদরটা।

মালতীবৌদি রেগে আগুন হয়েছিলেন। বোধহয় হলধরের গালে একটা চড়ও মেরেছিলেন, কিন্তু অঙ্গার শত ধোতেন··· । হলধরের অভ্যাস বদলায় নি। ভবিষ্যতেও হাত বাড়িয়েছে মালতীবৌদির দিকে।

আজ মালতীবৌদি যখন ডিউটি শেষ করে ফোর-সিটার ফট্-ফটিয়া ধরবার জন্য সিন্ধিয়া হাউস থেকে মাদ্রাজ হোটেলের দিকে যায়, তখন হলধর তো দূরের কথা অনেক বড় বড় সাহেবরাও একটু এদিক ওদিক করবার সাহস পান না। মালতীবৌদির দেহের গড়ন, চোখের দৃষ্টিতে বেশ একটা ব্যক্তিত্বের ছাপ আছে। সেটা অবশ্য আগেও ছিল। এই ক'বছর ইণ্টারন্যাশনাল এয়ারলাইন্সে কাজ করে সেটা আরো বেশি তীক্ষ্ন আর প্রকাশ্য হয়েছে। আগে যারা গোল মার্কেটের চায়ের দোকানে ওকে নিয়ে অসভ্য-কদর্য আলোচনা করত, আজ তারাও বলে, যাই বলুন না কেন, মেয়েটার পার্টস আছে। কেউ কেউ বলেন, পার্টস-টার্টস বাজে কথা। মেয়েটার বেশ পার্সোনালিটি আছে।

আজ ক'বছরের সুখে-দুঃখে মালতীবৌদির সঙ্গে আমার সম্পর্কটা একটু বিচিত্র ভাবে গড়ে উঠেছে। আমি মালতীবৌদির সবকিছু জানি, মালতীবৌদিও আমার সবকিছু জানেন। মানে সবকিছু। এই যে মালতীবৌদিদের বাপের বাড়ির সব কথা সদানন্দদা জানেন ?

না। হাজার হোক জামাই। সব কথা বলা যায় না, উচিতও নয়।

মালতীবৌদি অফিস থেকে আমাকে টেলিফোন করে বল্লেন, সিনেমায় যাবে ?

'তোমার পয়সায় না আমার পয়সায় ?'

'আমার পয়সায়।'

আমি বল্লাম, সিওর সিওর। সঙ্গে সঙ্গে জিজ্ঞাসা করলাম, তুমি টাকা দেবে ? আমি টিকিট কেটে আনতাম।

মালতীবৌদি বল্লে, উইক-ডে'তে অত ভীড় হবে না। সাড়ে পাঁচটা নাগাদ গিয়েই টিকিট কাটব।

পাঁচটা বাজার আগেই আমি মালতীবৌদির অফিসে গিয়েছিলাম। এয়ার-কণ্ডিশনড্ অফিসে বসে এক গেলাস কোল্ড কফি খেয়ে দুজনে মিলে গিয়েছিলাম রিভোলিতে। হা পোড়া কপাল! হাউস ফুল!

আমি বল্লাম, তোমার বুদ্ধির দোষে আজ আমাদের এই দুরবস্থা। এখন তিন ঘণ্টা কি করি বল ত ?

মালতীবৌদি বিলেতী ইন্সিওরেন্স কোম্পানীর রেসিডেণ্ট ডাইরেক্টরের মত এককথায় ষোল আনা ক্ষতি-পূরণের ব্যবস্থা করলেন, চল গেলর্ড'এ গিয়ে আগে কিছু খাই।

আমি বল্লাম, ভেরি গুড।

গেলর্ড'এ গিয়ে খাওয়া-দাওয়া সেরে দুজনে ঘুরতে বেরুলাম। সেদিন সন্ধ্যায় কনটপ্লেসের ইনার-সার্কেলের মাঠে বসে বসে মালতীবৌদির বাপের বাড়ির অনেক কথা শুনলাম।...

'আমাদের বোনগুলোর অদৃষ্টগুলোই যেন কেমন বিচিত্র।'

'হঠাৎ ওকথা বলছ কেন?'

'মাঝে মাঝেই আমার মনে হয়। আমার জীবনটা যে এরকম ভাবে ওলট-পালট হবে, তা কোনদিন স্বপ্নেও ভাবি নি। কিন্তু তোমার দাদার এ্যাক্সিডেণ্ট হবার পরই বুঝেছিলাম, এবার আমার পালা।

আমি কিছুই বুঝতে পারছিলাম না। জিজ্ঞাসা করলাম, তার মানে?

মালতীবৌদিরা চার বোন। আরতি, প্রণতি, মালতী আর জয়তী। চার বোনের মধ্যে মালতীবৌদির রংটা শুধু চাপাই নয়, দেখতেও ততটা সুন্দরী নয়। অন্য তিন বোনই গ্রাজুয়েট। আরতি বি. এ. পাস করার পর হিস্ট্রি নিয়ে এম. এ. পড়তে শুরু করে। বাবা তখন মেদিনীপুরের ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট। আরতি-প্রণতি কলকাতায় হোস্টেলে থেকেই পড়াশুনা করত। ছুটিতে মেদিনীপুর যেত। একবার গরমের ছুটিতে আরতি মেদিনীপুর এলো না।...'মা, আমাদের ক্লাশের বারোজন মেয়ে দার্জিলিং যাব বলে ঠিক করেছি। ঘুম'এর কাছে মধুছন্দাদেব চায়ের বাগানে থাকব। দিন পনের থেকেই কলকাতা ফিরব এবং সঙ্গে সঙ্গেই তোমাদের কাছে যাব।'

ঐ সেবার দার্জিলিং-এ গিয়েই ইউনিভার্সিটির লেকচারার অসীমবাবুর সঙ্গে আরতির আলাপ প্রেমে গড়াল। পরের মাঘেই ওদের বিয়ে হলো। বাবা—বোনেরাও সুখী হলেন। বি. এ. পাশ করার পর প্রণতির বিয়ে হলো সিভিল সার্জেনের ছেলের সঙ্গে। প্রণতিকে দেখে সিভিল সার্জেনের খুব পছন্দ হওয়ায় পুত্রবধূ করে নিয়ে যান নিজের সংসারে। প্রণতির স্বামীও ডাক্তার।

'তোমার সঙ্গে সদানন্দদার বিয়ে হলো কেমন করে?'

'সেও এক ভারী মজার কথা। বাবা তখন মুর্শিদাবাদের এ্যাডিশন্যাল ডিস্ট্রিক্ট ম্যাজিস্ট্রেট। ম্যাজিস্ট্রেট ছিলেন কৃষ্ণনাথ কলেজের প্রেসিডেণ্ট, তবে তিনি বাবার উপরেই কলেজের দেখাশুনার সব ভার দিয়েছিলেন।

আমার শ্বশুর যখন মারা যান তখন তোমার দাদার বয়স মাত্র আট। শাশুড়ীই ওকে মানুষ করেন। অনেক কষ্টে শাশুড়ী ওকে মানুষ করেন। কিন্তু তবুও বরাবরই খুব ভাল রেজাল্ট করেছে। ফার্স্ট ডিভিশনেই ম্যাট্রিক ও আই. এ. পাশ করে। কিন্তু থার্ড ইয়ার থেকে ফোর্থ ইয়ারে উঠবার পরই শাশুড়ী খুব অসুস্থ হন। বহরমপুরে অনেক ডাক্তার দেখিয়েও ফল হলো না।

তারপর কলকাতা মেডিক্যাল কলেজে নিয়ে গেলে জানা গেল ক্যান্সার। যখন ধরা পড়ল তখন টু লেট। কিছুদিনের মধ্যেই মারা গেলেন।

মা'র চিকিৎসা ও মৃত্যুর জন্য সদানন্দদার অনেক পার্সেণ্টেজ নষ্ট হয়। কলেজের প্রিন্সিপাল ওকে টেষ্ট দিতে বারণ করলেন, টেষ্টে পাশ করলেও তো তোমাকে সেণ্ট-আপ করতে পারব না। তাছাড়া এবার পরীক্ষা দিলে তোমার রেজাল্টও ভাল হবে না। সামনের বারেই পরীক্ষা দিও।

সদানন্দদা অনেক অনুনয়-বিনয় করেছিলেন। আর এক বছর পড়াশুনা করা অসম্ভব। এবার পরীক্ষা দেওয়া না হলে পড়াশুনাই ছাড়তে হবে। প্রিন্সিপ্যাল তবুও রাজী হলেন না।

কোন উপায় না দেখে সদানন্দদা গিয়েছিলেন কলেজের প্রেসিডেণ্ট ডিস্ট্রিক্ট ম্যাজিস্ট্রেটের কাছে। ডিস্ট্রিক্ট ম্যাজিস্ট্রেট পাঠিয়ে দিলেন মালতীবৌদির বাবার কাছে। মালতীবৌদির বাবাও প্রথমে প্রিন্সিপ্যালের মত পরামর্শ দিয়েছিলেন, অত পার্সেণ্টেজ কম, এবার পরীক্ষা না দেওয়াই উচিত।

'কিন্তু তাহলে আমার আর পড়া হবে না।'

'কেন ?'

'আমার অবস্থা সে রকম নয়। তাছাড়া পরীক্ষা দিয়েই যেভাবে হোক আমায় একটা চাকরী জোটাতে হবে।'

'কেন ?'

'মা'র চিকিৎসার জন্য অনেক দেনা হয়ে গেছে।'

'তোমার বাবা কি করেন ?'

'তিনি বহুকাল মারা গেছেন।'

'তোমার দাদা বা আর কেউ···'

'আমার আর কোন ভাই বোন নেই।'

শেষ পর্যন্ত নন্-কলেজিয়েট হয়ে পরীক্ষা দিয়েও সদানন্দদা শুধু ফার্স্ট ক্লাশই পেলেন না, হিস্ট্রিতে ডিস্টিংশনও পেলেন। রেজাল্ট বেরুবার পর সদানন্দদা মালতীবৌদির বাবাকে প্রণাম করতে গিয়েছিলেন। 'শুধু আপনার জন্যই আমার পরীক্ষা দেওয়া হলো। আমি আপনাকে কোনদিন ভুলব না।'

ক'দিন পর মালতীবৌদির বাবা সদানন্দদাকে রাত্রে খাবার নেমন্তন্ন করেছিলেন। কয়েকদিন পর কলকাতা চলে এলেন। একটা মার্কেণ্টাইল ফার্মে শ'দেড়েক টাকার চাকরি জোগাড় করলেন অনেক কষ্টে। মাসে মাসে একবার করে বহরমপুর আসতেন মাত্র একদিনের জন্য। মালতীবৌদির বাবা আর মা'কে প্রত্যেকবার প্রণাম করতে যেতেন।

'তারপর আবার কি ? তোমার দাদাকে বাবার ভীষণ পছন্দ হলো আর আমাকে তুলে দিলেন ওর হাতে।'

এবার মালতীবৌদি একটা দীর্ঘ-নিঃশ্বাস ছাড়লেন। কনটপ্লেসের নিওন সাইনগুলোর ওপর দিয়ে একবার চোখ দুটো ঘুরিয়ে নিলেন। বল্লেন, শুরু হয়েছিল ভালই, কিন্তু ক'বছরের মধ্যে সবকিছু ওলট-পালট হয়ে গেল। বাবা

রিটায়ার করলেন, মা মারা গেলেন। বাবা কলকাতায় বাসা নিলেন। জয়তী ইতিমধ্যে ইউনিভার্সিটিতে ভর্তি হলো।

সব চাইতে আগে দিদির কপাল পুড়ল। ইউনিভার্সিটির সামনে একটা ডবল ডেকারের তলায় চাপা পড়লেন জামাইবাবু। বছর ঘুরতে না ঘুরতে জয়তী 'মানেনজাইটিস্'-এ মারা গেল।

'তারপর?'

'মেজদি ডাক্তারদাকে নিয়ে সুখী, কিন্তু তিন তিনটে বাচ্চাই ওর নষ্ট হয়ে গেছে। এখন যেন ও কেমন হয়ে গেছে। কোনদিন খায়, কোনদিন খায় না। রাত্রে ঠিক ঘুমোয় না। ওর বোধহয় মাথাটাই খারাপ হয়ে যাবে।'

আমি জিজ্ঞাসা করলাম, বার বার কেন বাচ্চা নষ্ট হচ্ছে? চিকিৎসা হয় নি?

'ওদের স্বামী-স্ত্রীর রক্ত দু'রকমের। একজনের আর-এইচ পজিটিভ, আর একজনের আর-এইচ নেগেটিভ। সাধারণত প্রথম একটা-দু'টো বাচ্চা টিঁকে যায়, তৃতীয়টার থেকে কিছুতেই বাঁচে না। এসব ক্ষেত্রে দু'টো বাচ্চা হবার সময়ই ডাক্তাররা মেয়েদের অপারেশন করে দেয়। যাতে আর বাচ্চা না হয়, কিন্তু মেজদির প্রথম দু'টোও টিঁকল না।'

'আর দিদি? আরতি?'

'কিছুদিন কাঁদল, কিছুদিন চুপ করে বসে রইল। অনেক অনুরোধ আসা সত্ত্বেও শ্বশুরবাড়ি বাঁকুড়ায় গেল না। বল্ল, আমার যদি একটা ছেলে থাকত তাহলে শ্বশুরবাড়ি যেতাম। একলা একলা ও বাড়িতে যাব কোন মুখে?'

কলকাতায় বাবার কাছেই থেকে গেল। বছরখানেক বাদে আরতি পড়াশুনা করবে বলে বিলেত চলে গেল। ওর আকস্মিক বিলেত যাবার সিদ্ধান্তে সবাই অবাক হয়েছিলেন, কেউ কেউ আপত্তিও করেছিলেন। আরতি বলেছিল, আমার তো কোন বন্ধন নেই। সুতরাং সমাজ-সংসার আমার কাছে নিরর্থক।

আরতির তখন বয়স কত? বড়জোর ছাব্বিশ-সাতাশ। খুব বেশী হলে আঠাশ। আর চার বোনের মধ্যে আরতিই সব চাইতে সুন্দরী ছিল। তাছাড়া গড়নটাও বেশ লম্বা-চওড়া ছিল। হাজার মেয়ের ভীড়ের মধ্যেও আরতিকে চিনতে কষ্ট হতো না।'

চার-চারটি মেয়ে হবার পর মালতীবৌদির বাবা বেশ চিন্তিত হয়ে পড়েছিলেন। মালতীবৌদির দিদিমা বলেছিলেন, কিছু ভয় নেই বাবা। বিশেষ করে আরতিটার জন্য কোনই ভয় নেই। ওর যা গড়ন তা দেখে জামাই হবার জন্য ছোকরার দল তোমার বাড়িতে লাইন দেবে।

সত্যি আরতিদির জীবনে বহু আমন্ত্রণ এসেছে। স্কুল-কলেজ পেরিয়ে উনি যখন আশুতোষ বিল্ডিং-এ এলেন তখন সত্যি চাঞ্চল্য পড়ে গিয়েছিল। নতুন ছাত্রছাত্রীদের যে অভ্যর্থনা অনুষ্ঠান হয়েছিল তাতে আরতিদি গেয়েছিল, 'এই কথাটি মনে রেখো, তোমাদের এই হাসি খেলায়, আমি যে গান গেয়েছিলাম জীর্ণ পাতা ঝরার বেলায়।' গান শেষ হবার পর পুরো পাঁচ মিনিট ধরে হাততালি পড়েছিল। আরতিদি ভালই গেয়েছিলেন, কিন্তু অতক্ষণ

ধরে হাততালি পড়ার অন্য কারণ ছিল। উনি নিজের সম্পর্কে বিশেষ সচেতন ছিলেন কিন্তু কাউকে ধারে কাছে ঘেঁষতে দেন নি। হয়ত একটু অহংকারী ছিলেন, হয়ত যার তার সঙ্গে মেলামেশা করতে আরতিদির ভাল লাগত না। ভালই হয়েছিল। নিজেকে একটু দূরে দূরে না রাখলে কত কিছু ঘটতে পারত।

অসীমবাবু মারা যাবার পর আরতিদির চেহারাটা ভীষণ খারাপ হয়েছিল। মাস তিন-চার তো ওর দিকে তাকান যেত না। অনেকে চিনতেই পারত না যে এই সেই আরতি। তিলে তিলে বর্তমান পিছু হটতে হটতে অতীত হলো, শুকনো ডালে ডালে আবার কচি সবুজ পাতা এলো, মরা নদী বর্ষার জলে আবার টলমল করে উঠল। সাদা খোলের তাঁতের শাড়ি আর সাদা ভয়েল বা অর্গাণ্ডির একটা মামুলী ব্লাউজ পরে থাকলেও আরতিদির দেহের আগুন বা মনের তৃষ্ণা যেন বড় বেশী চোখে পড়ত। অনেকেই কল্পনা করতে পারতেন না উনি বিধবা। লুকিয়ে লুকিয়ে হয়ত কেউ কেউ ভবিষ্যত জীবনের স্বপ্ন দেখেছেন ওকে নিয়ে।

তাইতো আরতিদির বিলেত যাবার সিদ্ধান্তে চমকে উঠেছিলেন সবাই। আত্মীয়-স্বজন বন্ধু-বান্ধব সবাই একবাক্যে বলেছিলেন, একলা একলা অত দূরদেশে থাকবে? ভাল হবে কি? দু'চারজন তো খোলাখুলিই বলেছিলেন, হাজার হোক বয়েসটা তো বেশি হয় নি। এসব দেশে একলা একলা থাকা কি ভাল হবে?

মালতীবৌদির বাবা বলেছিলেন, এই দেশেই বা ওকে কি নিয়ে থাকতে বলব বলুন? এখানে থেকে জবলেপুড়ে মরার চাইতে ওখানে গিয়ে পড়াশুনা করুক, সেই ভাল।

বৃদ্ধ একটা দীর্ঘনিঃশ্বাস ছেড়ে বলেছিলেন, ও দূরে থাকুক, সেই ভাল; আমি আর ওকে দেখতে পারছি না।

আরতিদি নিজেই আবার কাউকে কাউকে মুখের ওপর বলেছিলেন, উপদেশ দেওয়াটা সহজ কিন্তু পালন করাটা তত সহজ নয়। তাছাড়া আপনাদের উপদেশ শুনে তো আমার জীবন কাটবে না।

কনটপ্লেসের ইনার-সার্কেলে মালতীবৌদির কাছে বসে মুগ্ধ হয়ে আরতিদির কথা শুনছিলাম। আমি বেশ বুঝতে পারছিলাম আরতিদির জীবনে অনেক কিছু ঘটেছে। কখনো উজ্জবল আলোয় ঝলমল করেছে, কখনো অন্ধকারের মধ্যে ডুবে গেছে। হয়ত সে কথা সবাইকে বলার নয়, হয়ত বলা যায় না বা উচিত নয়।

দিদির কথা বলতে গিয়ে মালতীবৌদির চোখের পাতা ভিজে উঠেছিল। ব্যাগ থেকে ছোট্ট রুমালটা বের করে মাঝে মাঝে চোখ দুটো মুছে নিচ্ছিলেন। আবার মাঝে মাঝে ঘন কালো মেঘ সরিয়ে সূর্যের আলো দেখা দিয়েছিল। আরতিদির গর্বে মালতীবৌদির সারা মুখটা উজ্জবল উচ্ছল হয়ে উঠেছিল।

সিনেমার টিকিট না পাবার জন্য প্রথমে ভীষণ রাগ হয়েছিল। গেলর্ডে এক পেট গেলবার পর অর্ধেক রাগ চলে গিয়েছিল। তারপর এই পার্কে বসে বসে আরতিদির কথা শুনবার পর মনে হলো সিনেমার টিকিট না পেয়ে ভালই হয়েছে। মনে হলো ভগবান যা করেন, তা বোধহয় মঙ্গলের জন্যই।

আরতিদির যাবার সবকিছু ঠিক হয়ে গেল। যাবার আগে দুই বোনকে দেখে গেলেন। বলে গেলেন আমার জন্য তোরা ভাবিস না। আমি ভালই থাকব। আর বলেছিলেন, তোদের যে কোন প্রয়োজনে আমাকে মনে করিস। মা নেই, বাবা বুড়ো মানুষ ; সুতরাং আমি ছাড়া তোদের কে দেখবে রে ? আর তাছাড়া তোরা ছাড়া আমার কে আছে বল্ ? তোরাই তো আমার সব।

এই দুনিয়ায় কিছু কিছু মানুষ আছে যাদের স্নেহ ভালবাসার কাছে আত্মসমর্পণ না করে উপায় নেই। এরা হয়ত ভাল, হয়ত খারাপ, কিন্তু তাতে কিছু আসে যায় না। হৃদয়-ঔদার্য বা স্নেহ ভালবাসা, উঁচু-নীচু, ভাল-মন্দ বিচার করে মানুষের চরিত্রে আসে না। আরতিদির চরিত্রে কি ছিল আর কি ছিল না, তা জানি না। তবে দুটি বোনের জন্য হৃদয়ের সমস্ত স্নেহ ভালবাসা তিনি যক্ষের ধনের মত সঞ্চিত করেছিলেন।

এই পৃথিবীর অনেক কিছু তিনি পান নি, হয়ত আরো অনেক কিছু কোনদিনই পাবেন না। তার জন্য তার দুঃখ নেই, হতাশা নেই। আদরের দুটি ছোট বোন তো ভালবাসে। ব্যাস, আর কিছু চাই না।

বাবা আশীর্বাদ আর দুটি বোনের ভালবাসা নিয়ে আরতিদি একদিন সত্যি সত্যিই ভারতবর্ষের মাটি ছেড়ে বিলেত চলে গেলেন।

রাত এগিয়ে চলেছিল। কনটপ্লেসের নিত্যকার দেওয়ালী উৎসবের মেয়াদ ফুরিয়ে এলো। কৃষ্ণচূড়ার ফাঁক দিয়ে শুধু নিওন-সাইনগুলোর লুকোচুরি খেলা নজরে পড়ছিল।

আমি মালতীবৌদিকে বললাম, 'চলো বাড়ি চলো। রাত হয়েছে।'

'রোজই তো ছ'টার মধ্যে বাড়ি যাই। আজ না হয় দেরীই হলো। তাছাড়া তোমার দাদা চন্ডীগড় গিয়েছেন।'

সুখ-দুঃখের কথা, মনের গোপন কথা মানুষ সহজে কাউকে বলতে চায় না, কিন্তু কোন কারণে একবার বলতে শুরু করলে সবকিছু বেরিয়ে আসে। হুড়মুড় করে বেরিয়ে আসে। হঠাৎ সোডার বোতল খুললে যেমন সোডা বেরিয়ে আসে, ঠিক তেমনি করে মালতীবৌদির কাছ থেকে সবকিছু বেরিয়ে এলো।

আরতিদি শুধা আত্মীয়-পরিজন আর ভারতবর্ষের মাটিই পিছনে ফেল্লো না, নিজের অতীত জীবনধারাও রেখে গেল।

সবাই নিজেকে ভালবাসে কিন্তু আরতিদি বোধহয় নিজেকে একটু বেশী ভালবাসত। বোধহয় একটু বেশি স্বপ্ন দেখেছিল নিজেকে নিয়ে, একটু বেশী আনন্দ উপভোগের বাসনা ছিল মনে মনে। রাগ রাগেশ্বরীতে সেতার বাজাতে শুরু করেছিল আরতিদি কিন্তু হঠাৎ একটা তার কেটে গেল। মাত্র

একটা তার কাটলে কি হয় ? পুরো বাজনাটাই মাটি হয়ে গেল। তাছাড়া এমন অপ্রত্যাশিত, এমন অকস্মাৎ সবকিছু ঘটে গেল যে আরতিদি ঠিক স্বীকার করতে পারে নি। কোটিপতি যদি হঠাৎ ভিখারী হয়, তাহলে মন কি তা স্বীকার করতে পারে ? পারে না, পারতে পারে না।

সকালবেলায় বেরুবার সময় অসীমবাবু বলেছিলেন, আজ বুধবার। মনে আছে ?

মনে ঠিকই ছিল কিন্তু তবুও আরতিদি বল্লেন, তা আমি কি করব ?

'প্রতি বুধবারের মত আজও দুপুরবেলা ফিরব। তোমার বুকের মধ্যে একটু শান্তিতে ঘুমাব, একটু…'

অসীমবাবুর পাঞ্জাবির বোতামগুলো আটকাতে আটকাতে আরতিদি বলেছিল, প্রত্যেক বুধবার দুপুরবেলায় তুমি আমাকে বিরক্ত করবে, তা হবে না।

'সত্যি ?'

'সত্যি।'

অসীমবাবুর বাড়ি ফিরতে ফিরতে রোজই সন্ধ্যা হয়। শুধু বুধবার দেড়টায় ক্লাশ শেষ। দু'টোর মধ্যে বাড়ি ফিরে আসেন। আরতিদি দরজা জানালা বন্ধ করে পর্দা ফেলে দিয়ে ঘুমায়। অসীমবাবু এসে বেল বাজালে আলুথালু বেশে উঠে এসে দরজা খুলে দিয়েই আবার বেডরুমের দিকে এগুতে যায়।

অসীমবাবু দরজাটা ভেজিয়ে দিয়েই আরতিদির আঁচল ধরে টান দিয়ে একটু মুচকি হাসেন। 'আঃ চলে যাচ্ছ কেন ?'

'বড্ড ঘুম পেয়েছে।'

আঁচল ধরে টানতে টানতে আরতিদিকে টেনে নেন নিজের বুকের মধ্যে। ব্যাগটা নামিয়ে রেখে দু'হাত দিয়ে জড়িয়ে ধরেন। তারপর দু'হাত দিয়ে আরতিদির মুখখানা তুলে ধরে ঠোঁটে ছোট একটু আদরের স্পর্শ দেন। আরতিদি তবুও চোখ খোলেন না। হয়ত একটু বেশী আদর পাবার জন্য চোখ বুঁজেই এলিয়ে পড়েন।

তারপর দু'হাত দিয়ে জড়িয়ে ধরে নিজের কাঁধে আরতিদির মাথাটা রেখে ধীর পদক্ষেপে বারান্দা দিয়ে হাঁটতে হাঁটতে চলে যান শোবার ঘরে। বুধবার দুপুরবেলায় আরতিদিকে নিয়ে এই ঘরটায় এলেই তরুণ অধ্যাপকের সব সংযম, সব গাম্ভীর্য কোথায় যেন পালিয়ে যায়। অধ্যাপক যেন ছাত্র হয়। ভীষণ দুষ্টু ছাত্র হয়। আরতিদি চোখ বুজে বুজে সব সহ্য করে। সহ্য করে না, উপভোগ করে।

তারপর ঘুমিয়ে পড়ে দু'জনেই। বিকেলবেলা ঝি এসে কতক্ষণ ধরে কতবার বেল বাজায়। দরজা খুলে দিতে আরতিদির অনেক দেরী হয়। ঝিকে দরজা খুলে দেবার পর আর শোওয়া হয় না। ঘরে গিয়ে কাপড়চোপড় ঠিক করে পরে আরতিদি বাথরুমে যায়। তারপর চা করে আবার বেডরুমে

যায়, অসীমবাবুকে ডাক দেয়, ওঠ, চা খাও।

ঘুমের ঘোরেই আরতিদিকে জড়িয়ে ধরেন অসীমবাবু।

'শুনছ, চা ঠাণ্ডা হয়ে যাচ্ছে।' অসীমবাবুর মাথায় কপালে হাত বুলিয়ে দিতে দিতে আরতিদি বলে, 'সারা দুপুর যুদ্ধ করে এখন এই অবেলায় ঘুমোন হচ্ছে।

প্রতি বুধবার দুপুরবেলায় এই একই নাটক অভিনীত হয় কিন্তু নাটকের বিষয়বস্তু এতই চিরন্তন যে কোনদিন পুরানো হয় না। কালজয়ী এই নাটকে অভিনয় করতে গিয়ে নায়ক-নায়িকাও যেন প্রতি বুধবার নিত্য নতুন অনুপ্রেরণা পায়। আরতিদি মুখে যাই বলুক, যতই চোখ বুজে ঘুমের ভান করুক, বুধবার দুপুরবেলাকে ওঁর বড় ভাল লাগে! ছোট্ট দু'খানি ঘরের দুজনের সংসারে রোজ রাত্রেই তো স্বামীকে কাছে পায়, আপন করে পায়, সমস্ত অনুভূতি দিয়ে পায়। কিন্তু বুধবার দুপুরবেলায় পাওয়া যেন উপরি পাওনা। অনেকটা বোনাসের টাকার মত। বড় মিষ্টি, বড় ভাল লাগে। এ পাওনা ন্যায্য পাওনা হলেও উপরি পাওনা। আরতিদির বড় ভাল লাগে।

তাছাড়া ঐ বুধবারের দুপুরবেলা অসীমবাবু যেন একটু বেশী পাগলামি, একটু বেশি দুষ্টুমি করেন। প্রায় ছেলেমানুষীই বলা যায়। আরতিদি মুখে অবশ্য বলেন, আঃ কি অসভ্যতা কর। সব মেয়েরাই অমন বলে, যেন সব মেয়েদেরই বৈরাগ্য দেখা দিয়েছে। নিজেদের দাম বাড়াবার জন্য অনেক মেয়েই অমন করে, অমন বলে। রক্ত-মাংসের দেহের মধ্যে ভিসুভিয়সের আগ্নেয়গিরি লুকিয়ে আছে। ভিতরের কামনা-বাসনার লাভা টগ্‌বগ করে ফুটছে, শুধু মুখে, পাহাড়ের চূড়ায় লজ্জার হাওয়া পেয়ে লাভাটা বসে আছে। একটু ছোঁয়ায়, একটু স্পর্শে, একটু আদর, একটু ভালবাসায় পাহাড়ের মুখ খুলে যায়, আরতিদির মত সব মেয়েরাই কামনা-বাসনার লাভা দিয়ে অসীমবাবুকে জ্বালিয়ে পুড়িয়ে ঘুম পাড়িয়ে দেয়।

সেদিনও বুধবার ছিল। আরতিদি মুখে যাই বলুক না কেন, মনে মনে অনেক আশা, অনেক স্বপ্ন উঁকি দিয়েছিল। খাওয়া-দাওয়া সেরে শুতে যাবার সময় ঘড়িতে দেখল বারোটা বাজে। গুণ গুণ করে একটু গান গাইতে গাইতে ঘুমিয়ে পড়েছিল। ইউনিভার্সিটির সামনে দুর্ঘটনা ঘটেছিল সাড়ে দশটা নাগাদ কিন্তু মেডিক্যাল কলেজের ইমার্জেন্সী ওয়ার্ডে আরতিদি অসীমবাবুকে কাছে পেয়েছিলেন ঐ প্রায় দুটো নাগাদই। প্রতি বুধবারের মত সেদিনও আরতিদির কোলে মাথা রেখে অসীমবাবু ঘুমিয়েছিলেন কিন্তু সে ঘুম তাঁর শেষ ঘুম। আরতিদির শত পাগলামি সত্ত্বেও অসীমবাবু আর একটি বারের জন্যও চোখ মেলে চাইলেন না।

বুধবারের দুপুরবেলায় ভগবান এমন ভাবে রসিকতা করবেন, আরতিদি কোনদিন কল্পনা করেন নি। তাই তো মনে মনে একটা তীব্র প্রতিহিংসার আগুন দাউ দাউ করে জ্বলে উঠেছিল আরতিদির মনে।

সাগরের জলে ভাসতে ভাসতে আরতিদির মনে পড়েছিল অতীত দিনের সব

স্মৃতি। সেই দার্জিলিং-এর কথা থেকে শুরু করে সব কিছু। মনে পড়েছিল সেই সর্বনাশা বুধবারের কথা। আর মনে পড়েছিল একটা নিরপরাধ মেয়ের ভবিষ্যত নিয়ে ভগবানের ছিনিমিনি খেলার কথা।

দিগন্তবিস্তৃত সাগরের জলে ভাসতে ভাসতে আরতিদির আহত মন যেন কোথায় হারিয়ে গেল। স্মৃতি যেন ধীরে ধীরে ঝাপসা হয়ে উঠল। এই অন্ধকারের মধ্যেও কোথা থেকে একটা ক্ষীণ আলোর রশ্মি হঠাৎ উঁকি দিল আরতিদির মনে। ঘণ্টার পর ঘণ্টা, দিনের পর দিন সাগরের নীল জল দেখতে দেখতে আরতিদির দৃষ্টিটাও বোধহয় একটু নীলাভ হয়েছিল।

সবারই বোধহয় এমনি হয়! মানুষ বিচরণ করে সর্বত্র। স্থলে, জলে, আকাশে। কিন্তু তা হোক। সে প্রধানত স্থলচর। মাটির সঙ্গেই মানুষের টান বেশি। মাটি থেকেই মানুষ, মানুষ থেকেই মাটি হয়। তখন বোধহয় মাটির মায়া কাটিয়ে মানুষ জলে বা আকাশে বিচরণ করলে তার কিছু পরিবর্তন হয়। মনের বাঁধন, চরিত্রের শাসন, সমাজের নির্দেশ বোধহয় একটু ঢিলা হয়। আরতিদিরও হয়েছিল। উপরের ডেকে ডেক-চেয়ারে বসে উদার আকাশের দিকে তাকিয়ে চুপটি করে বসেছিল আরতিদি। ভূমধ্যসাগরের মাতাল হাওয়ায় আঁচলটা উড়ে পড়েছিল পাশে। ভূমধ্যসাগরের ঐ মাতাল হাওয়া আরতিদির রূপ-যৌবনের সিন্দুকের ঢাকনা খুলে দিয়েছিল।

বোম্বে থেকে জাহাজ ছাড়ার পর প্রথম দু'একদিন যাত্রীদের মধ্যে একটু আড়ষ্ট ভাব থাকে। এডেন পৌঁছতে না পৌঁছতেই সে আড়ষ্টতা আরব সাগরের জলে হারিয়ে যায়।

আনন্দে-উৎসবে হাসি-খেলায় সমুদ্রের তরঙ্গের তালে তালে যাত্রীদের মন দুলে ওঠে, মেতে ওঠে। কেউ কেউ বা প্রমত্ত হয়ে ওঠে।

মেতে ওঠেনি শুধু আরতিদি। কখনও কেবিনে, কখনও ডেক-চেয়ারে একা একা বসে কাটিয়েছে দিনের পর দিন। একা থেকেছে সত্য, কিন্তু নিঃসঙ্গতার বেদনা?

আরতিদিও তো রক্ত-মাংসের মানুষ, সে তো পাষাণ নয়। এই প্রমত্ত যৌবনের মধ্যাহ্নে তার জীবনে দুর্ঘটনা ঘটেছে সত্য, কিন্তু মন? নিঃসঙ্গতার বেদনা লুকিয়ে লুকিয়ে তাকে জ্বালিয়ে পুড়িয়ে মারছিল। চারদিকে আনন্দ-উৎসবের বন্যা দেখে হয়ত দেহটাও বিদ্রোহ করতে চেয়েছিল, হয়ত স্বপ্ন দেখেছিল বুধবার দুপুরবেলার। ঐ ডেক-চেয়ারে বসে বসে আরো কত কি ভেবেছিল। হয়ত ভেবেছিল···। বুধবার দুপুরবেলা কি আর কোনদিন ফিরে আসবে না? কেউ কি আর কোনদিন আমাকে ভালবাসবে না? আদর করবে না? উপভোগ করবে না? আমাকে নিয়ে কি আর কেউ কোনদিন মাতলামি পাগলামি করবে না? আমার জীবনের আনন্দ-উৎসবের মেয়াদ কি চিরদিনের মত শেষ হয়ে গেল? চৈত্র দিনের ঝরা পাতার মত আমার জীবনের বসন্তোৎসবের দিন চিরকালের মত ফুরিয়ে গেল?

আরতির জীবনে আরতির প্রদীপ জ্বলতে না জ্বলতে দেবালয় চিরদিনের

মত বন্ধ হয়ে গেল ?

জাহাজটা হঠাৎ দুলে উঠল।

'এক্সকিউজ মী, আমার নাম ডাঃ অরবিন্দু সরকার।'

চমকে উঠেছিলেন আরতিদি। একটু সামলে নিয়ে বল্লেন, 'আমার নাম আরতি রায়।'

'ক'দিন ধরেই দেখছি আপনি চুপচাপ একলা একলা বসে থাকেন, আপনার কি শরীর খারাপ ?'

এত বড় জাহাজে এত যাত্রী চলেছেন কিন্তু কেউ আরতিদির কোন খবর জানতে চান নি। ডাইনিং হলে বা সুইমিং হলের ওপাশে বেড়াবার সময় অনেক যাত্রী সতৃষ্ণ নয়নে আরতিদিকে দেখেছেন, কেউবা অশ্লীল ইঙ্গিত বা ইশারা করেছেন। ডাক্তারের এই প্রশ্ন তাই আরতিদির বড় ভাল লেগেছিল। কৃতজ্ঞতার সঙ্গে উত্তর দিয়েছিলেন, 'না না, শরীর ভালই আছে।'

'তবে চুপচাপ বসে আছেন কেন ?'

'এমনি।'

একটা চেয়ার টেনে নিয়ে ডাঃ সরকার পাশে বসেছিলেন।

'আপনার সঙ্গে আলাপ করতে এলাম বলে কিছু মনে করবেন না।'

'না না, মনে করবার কি আছে ?'

সেই হলো শুরু। আরো এক সপ্তাহ পর আরতিদি যখন বিলেতের মাটি স্পর্শ করেছিলেন, তখন ডাঃ সরকার তার পরম বন্ধু হয়ে গেছেন। জেনেছেন তার সব কিছু।

ঠিক ম্যাট্রিক দেবার আগে ডাক্তারের পিতৃবিয়োগ হলো। নিতান্তই অকস্মাৎ। সমগ্র পরিবারের জীবনটা ওলট-পালট হয়ে গেল। পাঁচটি শিশু-সন্তান নিয়ে সহায়-সম্বলহীন বিধবা মা কিংকর্তব্যবিমূঢ় হয়েছিলেন। ছেলের লেখাপড়া, চার-চারটি মেয়ের বিয়ে কে দেবে ? কি হবে ?

কিশোর অরবিন্দু শুধু এইটুকু বুঝেছিল তাকে দাঁড়াতে হবে। মাকে বাঁচাতে হবে, চারটি ছোট বোনকে লেখাপড়া শিখিয়ে বিয়ে দিতে হবে। মনের মধ্যে সবার অলক্ষ্যে প্রতিজ্ঞার হোমাগ্নি জ্বালিয়ে সাধনা শুরু করল। ফার্স্ট ডিভিশনে ম্যাট্রিক পাশ করল, আই-এস-সি পাশ করল। ভর্তি হলো আর. জি. কর মেডিক্যাল কলেজে। ঝড়ের রাতের ঘোর অন্ধকারে ছোট্ট একটা মাটির প্রদীপ হাতে নিয়ে এগিয়ে গেছে অরবিন্দু। বাবার প্রভিডেণ্ট ফাণ্ডের সামান্য কয়েক হাজার টাকা ও মা'র সামান্য গহনা দিয়ে এত দীর্ঘ ঝড়ের রাতের সঙ্গে যুদ্ধ করা সম্ভব হয় নি।

সে অমানিশার কাহিনী দীর্ঘ। কখনো পড়ে গেছে, কখনো উঠে দাঁড়িয়েছে। কখনো থমকে দাঁড়িয়েছে, কখনো ছুটে চলেছে। মধ্যবিত্ত বাঙ্গালী ঘরের আরো পাঁচজনের মত অশেষ দুঃখ বরণ করার পর, অনেক চোখের জল ফেলার পর অরবিন্দু ডাক্তার হলো। ঝড়ের মাতলামি বন্ধ হলো, ভোরের আকাশে আবার সূর্য দেখা দিল।

আরতিদি মুগ্ধ হয়ে শুনছিলেন সে কাহিনী। 'তারপর ?'

'তারপর আবার কি ? চাকরি নিলাম মেডিক্যাল রিপ্রেজেনটেটিভের।'

'ডাক্তারের চাকরি নিলেন না ?'

'না, মাইনে কম বলে। সারাদিন চাকরি করে সন্ধ্যার পর প্রাইভেট প্র্যাকটিশ করতাম পাড়ার মধ্যেই। রোজ দু'তিন টাকা হতো, কিন্তু তখন তার মূল্য অনেক। মাত্র এক টাকা দিলেই বাড়িতে গিয়ে রুগী দেখে আসতাম। টাকা কম নিতাম বটে কিন্তু চিকিৎসায় ফাঁকি দিতাম না। লোকে খুশি হয়ে অনেক সময় পকেটে দশ-পনের-বিশ টাকা পুরে দিয়েছে।'

দূরের আকাশে তারাগুলো মিটমিট করে জ্বলে। মুগ্ধ হয়ে ডাক্তারের কথা শুনছিল আরতিদি। হয়ত বা তার অন্ধকার মনের আকাশেও নতুন আশা-আকাঙ্ক্ষার তারাও মিটমিট করে উঁকি দিয়েছিল।

দু'বছরের মধ্যে বড় দুই বোনের বিয়ে দিল। তারপর অরবিন্দু সত্যি সত্যি ডাক্তারী শুরু করল। এমনি করে এগিয়ে চলেছিল জীবন। ধীরে ধীরে এক পা এক পা করে এগিয়ে চলেছিল ভবিষ্যতের দিকে।

আরতিদি জিজ্ঞাসা করল, 'এখন বিলেত যাচ্ছেন কেন ?'

'বিলেত যাচ্ছি না, বিলেতেই থাকি। ছোট বোনের বিয়ে দিতে কলকাতা গিয়েছিলাম।'

ডাক্তার একবার দীর্ঘনিঃশ্বাস ছাড়ল। অন্তহীন সমুদ্রের চারপাশ দিয়ে একবার দৃষ্টিটা ঘুরিয়ে নিল। বল্লো, 'জানেন, আজ আমার চাইতে সুখী কেউ নেই। বাবা মার যাবার পর ভাবতে পারি নি চার চারটি বোনের বিয়ে দিতে পারব বা মা'কে সুখী করতে পারব।'

হঠাৎ আরতিদির মুখ দিয়ে বেরিয়ে গেল, 'এবার একটু নিজের দিকে তাকান।'

'আমার তো আর কোন প্রত্যাশা নেই। আমার কোন প্রয়োজনও নেই।'

ডাঃ অরবিন্দু সরকার নিজের জীবনের সব কথা শুনিয়েছিলেন আরতিদিকে, কিন্তু আরতিদির কথা জানতে চান নি। শুধু জিজ্ঞেস করলেন, 'বিলেত যাচ্ছেন কেন ?'

এক কথায় আরতিদি কি উত্তর দেবেন ? কিছু দেবার থাকলে তো ! শুধু জানতেন নিজের কাছ থেকে নিজেকে লুকিয়ে রাখবার জন্য কলকাতা ছেড়ে বিলেত চলেছেন, কিন্তু সেকথা কি বলা যায় ? একটু ভেবে বল্লেন, 'কিছু কাজকর্ম আর পড়াশুনা করার ইচ্ছা আছে।'

ডাক্তার আর প্রশ্ন করে নি। আরতিদির মনের কথা জানার তার কি অধিকার ? কি প্রয়োজন ? ভারতবর্ষ থেকে হাজার হাজার মেয়ে বিলেত যায়। তাদের এক একজনের কাহিনী এক এক রকম। কত জনের জীবনে কত রহস্য লুকিয়ে আছে। ডাক্তার তাদের দু'চার জনকে জানে, চেনে। কিছু কিছু মেয়ের বিচিত্র জীবন কাহিনী ডাক্তারকে জানতে হয়েছে। হয়ত একদিন আরতিদির কাহিনীও তাকে জানতে হবে। কিন্তু তার জন্য ব্যস্ত কি ? কিছু

না। ডাক্তার আর কিছু জানতে চাইলেন না। তবে আরতিদিকে দেখে বুঝতে অসুবিধা হয় নি যে এর জীবনে কোন কাহিনী লুকিয়ে আছে।

বোম্বে থেকে যখন বিলাতের জাহাজ ছাড়ে তখন তাতে নানা ধরনের ছেলে মেয়ে থাকে। কেউ ভাল, কেউ মন্দ, কেউ ড্রিঙ্ক করে, কেউ করে না ; কেউ নাচে, কেউ নাচে না ; কেউ সাঁতার কাটে, কেউ কাটে না। প্রথম দু'একদিন চুপচাপ থাকে কিন্তু আরতিদির মত দিনের পর দিন ? কেউ না।

তাছাড়া জাহাজের অন্যান্য মেয়েদের তুলনায় আরতিদির কি ছিল না ? শিক্ষা-দীক্ষা, রূপ-যৌবন সবই ছিল। মধু খাবার লোভে কিছু কিছু যাত্রী তো কয়েকদিন ভনভন করেছিল। তাদের দোষ নেই। সমাজ-সংসারের নাগপাশ থেকে মুক্তি পেয়ে জাহাজে চড়বার পর মধু খাবার লোভ অনেকেরই হয়। ছেলেদেরও হয়, মেয়েদেরও হয়। আরতিদির সব কিছু থাকলেও মন ? অতীত, বর্তমান, ভবিষ্যতের ঝড়ে সে যেন কোথায় হারিয়ে গিয়েছিল।

ডাক্তার আরতিদির মনের নিঃসঙ্গতার ইঙ্গিত পেয়েই স্বেচ্ছায় আলাপ করেছিল। আরতিদিরও ভাল লেগেছিল। ডাক্তারের শান্ত, স্নিগ্ধ, সংযত চরিত্র তাঁর ভাল লেগেছিল। শুধু তাই নয়। আলাপ করার জন্য ডাক্তারের প্রতি কৃতজ্ঞ হয়েছিল আরতিদি। হবে না ? জাহাজের সবাই আনন্দ করছে, শুধু সে একা নির্জন ডেকের একপাশে বসে বসে প্রহর গুণছিল। ডাক্তার এসে তাকে সেই নির্জন বন্দীশালা থেকে মুক্তি দিল।

ডাক্তার একবার জিজ্ঞেস করল, 'লণ্ডনে গিয়ে কোথায় থাকবেন ?'

'আমার বাবার এক বন্ধু আছেন। আপাতত তাঁর কাছেই উঠব।'

একটু পরে আরতিদি জিজ্ঞেস করেছিলেন, 'আপনি কোথায় থাকেন ?'

'চাকরি করি লণ্ডনে, কিন্তু থাকি লণ্ডনের বাইরে।'

'কেন ?'

'কেন আবার ? গরম-মশলার রান্না যেমন সবার সহ্য হয় না, লণ্ডনের মাতাল এ্যাট্‌মসফেয়ারও তেমনি আমার ঠিক ভাল লাগে না।'

ডাক্তারের কথা শুনে আরতিদির মুখে হাসির রেখা ফুটে উঠেছিল। বল্লেন, 'বাঃ, বেশ কথা বল্লেন তো ?'

'কি করব বলুন ? আমি ভীড় থেকে একটু দূরে থাকতেই পছন্দ করি।'

'অহেতুক কৌতূহল বলে যদি কিছু মনে না করেন তাহলে জানতে পারি কি কোথায় থাকেন ?'

'একশ'বার। আমার কিছু লুকোবার নেই। আমি লণ্ডনের কাছেই কিংস্টন সারে'তে থাকি। এই নিন আমার কার্ড।'

ডাক্তার পার্স থেকে কার্ডটা বের করে আরতিদির হাতে দিয়ে বল্লেন, 'যেদিন খুসী যখন ইচ্ছা আসবেন। খিচুড়ি আর ফ্রায়েড এগ খাইয়ে দেব। এর চাইতে বেশী রান্না করতে পারি না।'

আরতিদি একটু অবাক হয়ে প্রশ্ন করলেন, 'আপনি নিজেই রান্না করেন ?'

'তবে কে করবে ?'

এ প্রশ্নের উত্তর কে দেবে ? আরতিদির কাছে অন্তত এ প্রশ্নের উত্তর ছিল না। তবুও একটু ভেবে বল্লেন, 'ঠিক আছে, আমি গিয়ে আপনাকে ভাল করে রান্না করে খাইয়ে আসব।'

'সত্যি ?'

'আমি কি মিথ্যা বলছি ?'

'তা নয়, তবে হয়ত তা সম্ভব হবে না।'

'কেন ?'

'কেন তা জানতে চাইবেন না।'

ডাক্তারের কথায় আরতিদি একটু অবাক হলেন। একটু ভাবলেন। মনে একটু খট্‌কা লাগল। জিজ্ঞেস করলেন, 'কেন বলুন তো ?'

ডাক্তার একটু হাসল। বল্লো, 'লন্ডনে গিয়ে বোধহয় আমাকে মনে রাখার অবকাশ আপনার হবে না। হয়ত প্রয়োজনও হবে না।'

এবারও ঠিক বুঝতে পারলেন না আরতিদি। মনের মধ্যে খট্‌কা থেকেই গেল। কিন্তু তবুও আর প্রশ্ন করলেন না।

একটু পরে ডাক্তার নিজেই আবার বলেছিল, 'লন্ডন তো শহর নয় একটা বিরাট চিড়িয়াখানা। এ চিড়িয়াখানায় ইয়ং ছেলেমেয়েদের মাথা ঠিক রাখা বড় মুস্কিল হয়। তাইতো বলছিলাম লন্ডনে গিয়ে হয়ত আমাকে আর মনে পড়বে না।'

কথাটার ইঙ্গিত বুঝতে কষ্ট হয় নি আরতিদির। অন্যমনস্কভাবেও নিজের দেহের উপর দিয়ে একবার চোখ বুলিয়ে নিলেন। মুহূর্তের জন্য মনে পড়ল ইউনিভার্সিটির দিনগুলো। এই দেহটার জন্যই কি ছেলেরা একটু চঞ্চল হতো আমাকে দেখে ? ক্যানটিনের কোণায় কি এই জন্যই ওরা দল বেঁধে ফিসফিস করে কথা বলত ? অসীম কি এই দেহের আকর্ষণেই আমার কাছে এসেছিল ? সে কি এই দেহটার জন্যই বুধবারের দুপুরবেলা পাগল হয়ে উঠত ? লন্ডনে গিয়েও কি—

আরতিদি আর ভাবে না, ভাবতে পারে না, ভাবতে চায় না। মুহূর্তের একটু উত্তেজনায় সারা শরীরটা কেঁপে ওঠে। হঠাৎ ডাক্তারের হাতটা চেপে ধরে বলে, 'আপনি তো আছেন, ভয় কি আমার ?'

ডাক্তার চমকে ওঠে। আরতিদিও লজ্জা পান। আস্তে হাতটা সরিয়ে নিয়ে মুখটা নীচু করেন।

॥ পাঁচ ॥

বিলেতটা যেন কি এক আশ্চর্য দেশ। এত বড় ইউরোপে এত শহর নগর ছড়িয়ে রয়েছে কিন্তু লণ্ডনের মত দুর্বার আকর্ষণ আর কোন শহরের নেই। অতীত বা বর্তমানের শুধু ইংরেজ সাম্রাজ্যের মানুষের কাছেই নয়, প্রায় সারা পৃথিবীর মানুষের কাছেই লণ্ডনের এক বিশেষ মোহ। সে মোহ, সে আকর্ষণ কি এবং কেন, তা বলা দুঃসাধ্য।

কলকাতায় বসে বসেই আরতিদি এই আকর্ষণ অনুভব করেছিল। ভেবেছিল উন্মত্ত লণ্ডনে নিঃসঙ্গ জীবনের দুঃখকে ভুলবে। লেখাপড়া কাজকর্মের মধ্যে ডুবিয়ে দেবে নিজেকে।

পিতৃবন্ধু অধ্যাপক রায়চৌধুরীর আতিথ্য কয়েকদিন উপভোগ করার পরই আরতিদি বুঝল, আর নয়, এবার নিজের ব্যবস্থা নিজেরই করতে হবে। তিন দিন ঘুরে শেষে ক্যামডেন টাউনের কাছে অতীত দিনের এক বান্ধবীকে খুঁজে বের করল। জানাল সব কথা।

অত্যন্ত ছোট একটা ঘরে ছায়া থাকে। থাকে? থাকে মানে এটা তার সরকারী আস্তানা। রোজ অফিসফেরত একবার ঘুরে যায় চিঠিপত্র নেবার জন্য। অথবা এক কাপ চা খেয়ে কাপড়-চোপড় বদল করে ওভারকোটটা পাল্টে যায়! চলে যায়? কোথায়? কোথায় আবার? ওর বয় ফ্রেণ্ডের কাছে। হেণ্ডন সেণ্ট্রালে মনোহর তানিজার কাছে। রোজ? না, রোজ না, তবে প্রায়ই।

আরতিদি একটু ঘাবড়ে যায়। একটু ভয় পায়। আবার হয়ত একটু মজাও লাগে ভাবতে। ছায়া এমন করে পাল্টে গেছে? পড়াশুনার নাম করে বিলেতে এসে শেষে চাকরি-বাকরি নিয়ে এমন করে পাঞ্জাবী ছেলের সঙ্গে মেতে উঠল?

হ্যাঁ, তাতে আশ্চর্যের কি আছে? বাংলাদেশের মধ্যে বাঙালী ছেলেমেয়ের প্রেম-ভালবাসা যেমন সম্ভব ও স্বাভাবিক, বাংলার বাইরে কি তা সম্ভব? তারপর লণ্ডনে। ছায়া যে একটা স্পানিশ বা ইটালিয়ান ছেলের সঙ্গে জড়িয়ে পড়ে নি, তাই যথেষ্ট।

আরতিদি বোঝে, কিন্তু তবুও একটু অবাক না হয়ে পারে না। পূর্ণ থিয়েটারের মোড় থেকে ছায়া বাসে চাপত। আরো কয়েকজনও চাপত। পাঁচ-ছ'জন ছেলেমেয়ে তো বটেই। পৃথ্বীশও চাপত। রোজই প্রায় একই সময় একই বাসে চাপত। নামত ইউনিভার্সিটি। আলাপ পরিচয় হয়েছিল বৈকি। হয়ত পৃথ্বীশের একটু দুর্বলতা হয়েছিল ছায়ার প্রতি। হয়ত সেজন্যই সিনেমা দেখার আমন্ত্রণ জানিয়েছিল। কিন্তু ছায়া সেদিন শুধু প্রত্যাখ্যানই করে নি পৃথ্বীশকে অপমানও করেছিল।

ছায়া বেশ সভ্য ও শান্ত হলেও ওর দেহের কেমন যেন একটু মাদকতা

ছিল। দেহের গড়নটাই ছিল একটু বিশ্রী ধরনের। মানে আরকি একদল মেয়ের ভীড়ের মধ্যেও ছায়ার দেহটাই সব চাইতে আগে ছেলেদের চোখে পড়ত। চোখে না পড়ে উপায় ছিল না। ওর দেহের গড়নটাই ছেলেদের আমন্ত্রণ জানাবার পক্ষে যথেষ্ট ছিল। পৃথ্বীশ হয়ত সে আমন্ত্রণ প্রত্যাখ্যান করবার মত সাহস পায় নি। কিন্তু তাই বলে অপমান? না না, কেউই ছায়াকে সমর্থন জানাতে পারে নি।

তাছাড়া সেবার সাউথে এক্সকারসনে গিয়ে? মৃন্ময়ের ঐ ছোট্ট এক টুকরো দু'লাইনের চিঠি নিয়ে ছায়া সোজা নালিশ করেছিল ডাঃ চ্যাটার্জীর কাছে। অন্য মেয়েরা আপত্তি করেছিল, অনুরোধ উপরোধ করেছিল, কিন্তু ছায়া মৃন্ময় মিত্রের বেহায়াপনা বরদাস্ত করতে পারে নি।

আর আজ? কি করে লন্ডনে এসে ছায়া এমন করে পাল্টে গেল তা ভাবতেও আরতিদির কষ্ট হয়।

সেদিন সন্ধ্যায় দুজনে বি-বি-সি'র সামনে তানিজার ওখানে গিয়েছিল। আরতিদির নেমন্তন্ন ছিল। তানিজা অত্যন্ত ভদ্রতা ও সৌজন্য দেখিয়ে আরতিদিকে অভ্যর্থনা জানাল। প্রথম এক ঝলক দেখেই তানিজাকে আরতিদির ভাল লেগেছিল। বেশ ভদ্র, সভ্য, সংযত। ঘরে ঢুকেই বেশ রুচির পরিচয় পেল। তাছাড়া ছায়াকে যে সে সত্যি ভালবাসে তা বুঝতে কষ্ট হয় নি আরতিদির। তানিজা ছায়াকে শেখায় নি পাঞ্জাবী কিন্তু নিজে বাংলা শিখেছে। বেশ ভাল বাংলা বলতে পারে তানিজা।

আরতিদি আসবে বলে তানিজা রান্না-বান্না আগেই করে রেখেছিল। গল্পগুজব করবে বলে কাজকর্ম শেষ করে রেখেছিল।

কিন্তু ওভারকোট খুলে বসতে না বসতেই ছায়া আরতিদিকে জিজ্ঞাসা করল, 'হোয়াট উইল ইউ হ্যাভ আরতি?'

'সরি ছায়া, আমি তো ড্রিংক করি না।'

'বাজে কথা ছেড়ে দে। বি রোম্যান ইন রোম।'

'ছায়া, এক্সকিউজ মী। তোরা খা, আমি গল্প করছি।'

তানিজা একটিবারের জন্যও পীড়াপীড়ি করল না। কিন্তু ছায়া যখন তিনটে গেলাস আর হুইস্কীর বোতল বের করল তখন তানিজা বল্লো, 'ডোণ্ট গিভ হার হুইস্কী।'

'তবে কি দেব?'

তানিজা বল্লো, 'কিছু না দেওয়াই ভাল। তবে দিতেই যদি হয় তাহলে হুইস্কী নয়।'

ছায়া আরতিদিকে ব্র্যাণ্ডি দিয়ে নিজেরা হুইস্কীর গেলাস দুটো তুলে ধরে বল্লো, 'টু ইওর হেলথ, আরতি!'

আরতিদি কোন উত্তর দিতে পারল না। চুপ করে বসে রইল। আশ্রয়-প্রার্থী আরতিদি ছায়াকে অসন্তুষ্ট করতে সাহস করল না। ধীরে ধীরে গেলাসটা তুলে নিল মুখে।

সেই শুরু। সেই অয়মারম্ভ। আরতিদি নতুন জীবন শুরু করল। ছায়ার অফিসেই আরতিদি একটা চাকরি পেল। হাজার হোক এম. এ. পাশ মেয়ে এ দেশে খুব বেশী নেই। সুতরাং আরতিদির চাকরিটা নেহাৎ মন্দ হলো না। উইকলি ষোল পাউণ্ড। সব কেটে-কুটে হাতে আসত প্রায় তেরো পাউণ্ড। বিদেশে এসে এত সহজে নিজের পায়ে দাঁড়াতে পারবে, আরতিদি তো কোনদিন কল্পনা করে নি। সহজে বেকারলু লাইনের কিলবার্ণ স্টেশনের কাছেই আরতিদি একটা ছোট্ট এ্যাপার্টমেণ্টে সংসার পাতল।

লণ্ডন আসার প্রায় এক মাস পর আরতিদি প্রথম একটু নিজের দিকে তাকাবার অবকাশ পেল। অফিস থেকে বেরিয়েই বেকার স্ট্রীটে ট্রেন ধরতে মন চাইত না। ঘুরে বেড়াত। সাতটা, আটটা, ন'টা অবধি ঘুরে বেড়াত। কোন কোনদিন ইণ্ডিয়া টি হাউসে গিয়ে গোটা কতক স্যাণ্ডউইচ খেয়ে রাত্রের ডিনারের পর্বটাও শেষ করে নিত। তারপর আবার ঘুরত। হয়ত মার্বেল আর্চের ধারে গিয়ে বসত কিছুক্ষণ। শেষে ক্লান্ত, শ্রান্ত হয়ে ফিরে আসত নিজের আস্তানায়। কোন মতে কাপড়-চোপড় ছেড়ে নাইটিটা পরে লুটিয়ে পড়ত বিছানায়। সোমবার থেকে বৃহস্পতিবার বেশ কেটে যায়। শুক্রবারের দিনের বেলাটাও কাটে, কিন্তু তারপর ? যখন সারা লণ্ডনের মানুষ উইক-এণ্ডের আনন্দে মেতে ওঠে, তখন ? আরতিদির মনটা বিষণ্ণে ভরে যায়। নিঃসঙ্গতার বেদনা বড় বিভ্রান্ত করে তোলে।

নিজের সংসার পাতার পর দুটো সপ্তাহ কেটে গেল। পরের সপ্তাহে আর আরতিদি নিজের ঐ ছোট্ট এ্যাপার্টমেণ্টে বন্দিনী থাকতে পারল না। বেরিয়ে পড়ল। উইণ্ডসর ক্যাসেল দেখতে বেরিয়ে পড়ল। কুইন মেরী'স ডলস্ হাউস আর স্টেট এ্যাপার্টমেণ্টস দেখে রাউণ্ড টাওয়ারে আসতেই পাশ থেকে হঠাৎ একজন প্রশ্ন করলো, 'এক্সকিউজ মী, আপনি ইণ্ডিয়ান ?'

আরতিদি ছোট্ট উত্তর দিল, 'হ্যাঁ।'

'বাঙ্গালী ?'

আরতিদি একটু হাসি মুখেই উত্তর দিলেন, 'হ্যাঁ।'

'চমৎকার! লণ্ডনে আসার পর আর কোন বাঙ্গালীর সঙ্গে আলাপ হয় নি।'

'তাই নাকি ? তাহলে আমি খুব লাকী বলুন ?'

'আপনি কেন ? আমিই।'

নর্ম্যান গেট দিয়ে নর্থ টেরেসের দিকে বেরুতে বেরুতে আলাপ হলো দুজনের।

'আমার নাম পবিত্র মুখার্জী। ব্যারিষ্টার হবার চেষ্টা করব বলে আপনাদের লণ্ডনে এসেছি।'

আরতিদি হাসতে হাসতে বল্লো, 'লণ্ডনের প্রতি আমার অধিকারের চাইতে আপনার অধিকার বিন্দুমাত্র কম নয়।'

এইভাবেই আলাপের শুরু। ব্রেবোর্ণ রোডের বিখ্যাত মুখার্জী এ্যাণ্ড

কোম্পানীর একমাত্র মালিকের পুত্র পবিত্রর সঙ্গে আরতিদির এইভাবেই আলাপ হলো। আলালের ঘরের দুলাল হয়েও পবিত্র এম. এ. পাশ করেছিল এবং নিতান্তই স্বাভাবিক ভাবে পরবর্তী ধাপে বিলেতে এসেছে। কৃপণ পিতার জন্য কলকাতায় পবিত্র নিজের কোন ইচ্ছাই চরিতার্থ করতে পারে নি। মনের মধ্যে অনেক আশা-আকাঙ্ক্ষা কামনা-বাসনা চাপা পড়ে ছিল। লণ্ডনে এসে পবিত্র জীবনে প্রথম স্বাধীনতার স্বাদ পেল।

স্বাধীন পবিত্র মুখার্জীর জীবনে প্রথম নারী হলেন আরতিদি। বয়সে দু'এক বছরের বড় হলেও নিঃসঙ্গতার বেদনাহত আরতিদি পবিত্রকে অনেকটা কাছে টেনে নিলেন।

বেকার স্ট্রীট টিউব ষ্টেশনের সামনে পবিত্র অপেক্ষা করত আরতিদির জন্য।

'কতক্ষণ এসেছ ?'

পবিত্র হাতের ঘড়িটা এক নজর দেখে নিয়ে বলে, 'মিনিট পাঁচেক।'

আশেপাশের কোন একটা ইতালীয়ান রেস্তোরাঁ থেকে দুজনে কিছু খেয়ে ঘুরতে বেরোয়। উদ্দেশ্যহীন হয়ে ঘুরে বেড়ায়। কোনদিন আবার সিনেমা দেখতে ঢুকে পড়ে এ্যাষ্টোরিয়া বা কার্লটন বা প্লাজা বা ষ্টুডিও ওয়ান'এ। ট্রাই-এক্স ফিল্ম দেখতে গিয়ে পবিত্র একটু চঞ্চল হয়। আরতিদিও বোধহয় একটু উতলা হয়। মনের মধ্যে একটু জোয়ারের জল ঢুকে পড়ে। কিন্তু প্রকাশ করে না কেউই।

পবিত্র গ্রেস্ ইন্'-এ ফিস্ জমা দিয়েছে। লেকচার শোনার পালা শুরু হতে এখনও অনেক দেরী। অফুরন্ত অবসর আর উচ্ছ্বাস নিয়ে পবিত্র দিন কাটায়।

উচ্ছ্বাস, উজ্জ্বল, উদ্দাম, উদভ্রান্ত পবিত্রকে আরতির বেশ লাগে। নীল আকাশের কোলে এক ঝাঁক বলাকা যেমন নিশ্চিন্তে উড়ে বেড়ায়, পবিত্র ঠিক তেমনি নিশ্চিন্তে দিন কাটাত। এত সহজ, সরল, স্বাভাবিক হয়ে জীবনের মুখোমুখি হতে আরতিদিরও মন চায়।

দুজনে আরো একটু কাছে আসে।

সেদিন শুক্রবার। অফিস থেকে বেরিয়ে আরতিদি পবিত্রর দেখা পেল না। বেশ কিছুক্ষণ অপেক্ষা করেও দেখা হলো না। শেষে বেশ একটু নিরাশ হয়েই ফিরে গেল নিজের আস্তানায়। সবে কোটটা আর জুতোটা খুলে রেখে একটু বিছানায় শুয়েছে এমন সময় দরজায় কে যেন নক্ করল। আরতিদি ভেবেছিল পাশের এ্যাপার্টমেণ্টের মিসেস চেরিল। বল্লো, প্লিজ কাম ইন।

একটা বিরাট প্যাকেট হাতে করে পবিত্র ঢুকতেই আরতিদি অবাক হলো। 'কোথায় ছিলে আজকে ?'

পবিত্র সে কথার জবাব না দিয়ে বল্লে, 'একটু উঠে দাঁড়াও।'

'কেন ?'

'উঠে দাঁড়াও না !'

আরতিদি উঠে দাঁড়াল। পবিত্রর মুখোমুখি দাঁড়াল।

পবিত্র বল্লো, 'ওদিকে ঘুরে দাঁড়াও !'

আরতিদি ঘুরে দাঁড়াল। পবিত্র প্যাকেটটা খুলে আরতিদিকে একটা নতুন কোট পরিয়ে দিল।

আরতিদি বিস্মিত হয়ে বল্লো, 'কোট কিনলে কেন ?'

'সেলফ্রিজে ঘুরতে ঘুরতে পছন্দ হলো। মনে হলো তোমাকে ভীষণ মানাবে। তাই নিয়ে এলাম।'

পবিত্র কোটের বোতামগুলো আটকাতে আটকাতে প্রশ্ন করল, 'তোমার পছন্দ হয় নি ?'

'ভাল জিনিস পছন্দ হবে না কেন ? কিন্তু তাই বলে, এত দামী কোট কিনলে কেন ?'

হাসতে হাসতে পবিত্র উত্তর দেয়, 'বাবার প্রচুর ব্ল্যাক-মানি আছে। কিছু যদি তোমার জন্য ব্যয় করি তাহলে বাবার উপকারই করা হবে, অপকার নয়।'

পবিত্র দু'হাত দিয়ে আরতিদির দুটো হাত চেপে ধরে বল্লো, 'তোমাকে সত্যি ভারী সুন্দর দেখাচ্ছে।'

আরতিদি দুটো হাত দিয়ে পবিত্রর হাত দুটো চেপে ধরল। কিন্তু ওর মুখের দিকে তাকাতে পারল না। জিভ দিয়ে ঠোঁটটা ভিজিয়ে নিয়ে দৃষ্টিটা ঘুরিয়ে নিল পাশে।

পবিত্র একটু বিস্ময়ে, একটু মুগ্ধ হয়ে চেয়ে থাকে আরতিদির দিকে। আরো একটু সামনে এগিয়ে আসে, আরো একটু নিবিড় হয়। আরতিদি কিছু বলে না, দৃষ্টিটা ঘুরিয়ে চুপ করে দাঁড়িয়ে থাকে। মুহূর্তের জন্য পবিত্রও থমকে দাঁড়ায়, কিন্তু সে ঐ মুহূর্তের জন্যেই। দু'হাত দিয়ে আরতিদিকে কাছে টেনে নেয়। অনেক কাছে। একেবারে বুকের মধ্যে। আরতিদির ঠোঁটে নিজের ভালবাসার প্রথম স্মৃতিচিহ্ন এঁকে দেয়।

অনেক, অনেক দিন পরে আরতিদির সারা দেহ-মন টলমল করে উঠল। সেই অতীত দিনের হারিয়ে যাওয়া বুধবারের দুপুরবেলার মত কিসের যেন প্রত্যাশায় রক্তটা একটু দৌড়াদৌড়ি শুরু করল, নিঃশ্বাসটা ঘন হলো।

নিজের ঠোঁটে পবিত্রর ভালবাসার প্রথম স্পর্শ পেয়ে মনের মধ্যে ক্ষণেকের জন্য অতীত স্মৃতির ঝড় উঠেছিল বৈকি। কিন্তু তবুও নিঃসঙ্গ জীবনের দরদী বন্ধু পবিত্রকে বাধা দিতে পারে নি, শাসন করতে পারে নি। কেমন যেন অসহায় আত্মসমর্পণ করল পবিত্রর দুটি বাহুর মধ্যে।

পবিত্র আর স্থির থাকতে পারে নি। বাংলাদেশ থেকে বহু দূরে, অক্টোপাশে বাঁধা সমাজ জীবনকে পিছনে রেখে, লণ্ডনের এই ছোট্ট এ্যাপার্টমেণ্টে আত্মসমর্পিত আরতিদিকে পেয়ে পবিত্র ভুলে গেল সবকিছু। আরতিদির ভালবাসার মহাসাগরে ডুব দিয়ে মাতাল হলো পবিত্র মুখার্জী।

আরতিদির ভাল লেগেছিল বৈকি। যে জীবন হারিয়ে গিয়েছিল, যে জীবন ফিরে আসবে বলে কোনদিন সে ভাবে নি, সে অতীতের স্বাদ নিশ্চয়ই ভাল লেগেছিল। সংস্কার মনকে একটু খোঁচা দিয়েছিল, কিন্তু পবিত্রর ভালবাসায়

আর নিজের মনের তৃপ্তিতে সে সংস্কার মুছে গিয়েছিল।

অনেকক্ষণ দু'জনে দু'জনের দিকে তাকাতে পারে নি। ঐ ছোট্ট ঘরের মধ্যে ঘোরাফেরা করেছে কিন্তু মুখোমুখি হতে পারে নি দু'জনে। অনেক পরে পবিত্র বল্লো, 'চলো, বাইরে গিয়ে খেয়ে আসি।'

'না, আমি রান্না করছি।'

মিটার-বক্সে ছ' পেনি ঢুকিয়ে দিয়ে গ্যাস জেবলে ভাত আর ডিমের তরকারী রাঁধল আরতিদি।

খাওয়া-দাওয়া সারতে সারতে অনেক রাত হয়ে গেল। বৃষ্টিটাও বেশ জোরে শুরু হয়েছিল। নতুন জীবনের নতুন নায়ককে এই আবহাওয়ায় বিদায় জানাতে আরতিদির মনে একটু কষ্ট হয়েছিল। সঙ্গে সঙ্গে দ্বিধাও এসেছিল মনের মধ্যে। তবুও বলেছিল, 'এত রাতে এই বৃষ্টির মধ্যে কেন আর যাচ্ছ? থেকে যাও।'

ছোট্ট এ্যাপার্টমেন্ট। একজনেরই শোবার জায়গা আছে। বাংলা দেশ নয় যে মেঝেতে অতিথির বিছানা হবে। অতিথিকেও অতিথি-সৎকারকের শয্যায় আশ্রয় নিতে হবে। সব জেনে শুনেও পবিত্র জিজ্ঞাসা করল, 'শোব কোথায়?'

'কেন, ঐ সোফাটায়!'

পবিত্র থেকে গেল। সোফায় নয়, আরতিদির উষ্ণ সান্নিধ্যেই রাত কাটাল। লণ্ডনের শীতে দু'টো লেপের তলায় আরতিদিকে নিয়ে ঐ ছোট্ট বিছানায় শুতে পবিত্রর খুব বেশি কষ্ট হয় নি। বরং নতুন মর্যাদায়, নতুন পাওয়ার আনন্দে সে মশগুল হয়েছিল। আরতিদি? সেই বুধবারের দুপুরবেলা ফিরে পেয়েছিল। পবিত্রর উচ্ছ্বাস, পাগলামি, মাতলামি বড় মিষ্টি, বড় ভাল লেগেছিল।

একেবারে শেষ রাতের দিকে ঝড় থেমে গেল। ক্লান্ত পবিত্র, ক্লান্ত আরতিদি ঘুমিয়ে পড়ল।

উইক-এণ্ডের প্রথম রাতের ঘুম ভেঙ্গেছিল অনেক বেলায়। প্রায় সাড়ে ন'টা নাগাদ। দিনের আলোয় অত নিবিড়ভাবে পবিত্রকে নিজের বুকের মধ্যে দেখে আরতিদি একটু লজ্জিত হয়েছিল। কিন্তু তন্দ্রাভরা চোখে পবিত্র জড়িয়ে ধরলে আরতিদিও ওকে আদর না করে থাকতে পারে নি।

পবিত্রকে পাশে নিয়ে আরতিদির নতুন জীবন শুরু হলো।

পবিত্র ব্যারিষ্টারী পড়া শুরু করেছে। আরতিদিও চাকরি করছে। কিন্তু সে তো দিনের বেলা। সন্ধ্যার পর দু'জনের দেখা হয়, কথা হয়, গল্প হয়, আদর করে, ভালবাসে। দিনের পরিশ্রমের সব গ্লানি মুছে ফেলে দু'জনে।

উইক-এণ্ডে? শুক্রবার বিকেল থেকে সোমবার সকাল পর্যন্ত পবিত্র আরতিদির ঐ ছোট্ট এ্যাপার্টমেন্টেই থেকে যায়। কোন উইক-এণ্ডে আরতিদি পবিত্রর এ্যাপার্টমেণ্টে গিয়ে আর ফিরে আসে না। থেকে যায়। সদ্য প্রস্ফুটিত রক্তগোলাপের মত চব্বিশ পঁচিশ বছরের পবিত্রকে বড় প্রিয়, বড় আকর্ষণীয় মনে হলো ছাব্বিশ সাতাশ বছরের আরতিদির। পবিত্র যখন কাছে

এসেছে, যৌবনের উষ্ণ প্রস্রবণে অবগাহন করেছে, তখন স্বামীর স্মৃতি মনে এসেছে বৈকি। ক্ষণিকের জন্য বিমনা হয়েছে। ন্যায়-অন্যায়, ভাল-মন্দের প্রশ্ন এসেছে মনে, কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে প্রশ্ন এসেছে, কেন তার জীবনটা ওলট-পালট হয়ে গেল? কি অন্যায়, কি অপরাধের জন্য বিধাতা তাকে এই শাস্তি দিলেন? আনন্দ উপভোগের, হাসি-খেলার শুরুতেই কেন সবকিছু থেমে গেল? কেন? কেন? কেন?

রক্ত-মাংসের মানুষ আরতিদি। সে মানুষ। তার দাবী আছে, প্রয়োজন আছে, ধর্ম আছে। সব কিছু সে ভুলে যাবে? তার দাবী, প্রয়োজন? না না, তা পারে না।

পবিত্র যত কাছে এগিয়ে এসেছে, আরতিদির মন তত বিদ্রোহ করেছে। ভগবানের স্বেচ্ছাচারিতার বিরুদ্ধে তার দেহ মন বিদ্রোহ করেছে। নিজে দু'হাত দিয়ে পবিত্রকে আরো কাছে টেনে নিয়েছে। স্বেচ্ছায় আনন্দে তার ঐশ্বর্যপুরীর সিংহদ্বার উন্মুক্ত করে আমন্ত্রণ করেছে পবিত্রকে। জগতের সর্বত্র ভগবান আনন্দ উপভোগের মেলা বসিয়েছেন। আরতিদি কেন বঞ্চিত থাকবে? না, সে বঞ্চিত থাকে নি, থাকতে চায় নি, থাকতে পারে নি।

ছায়ার মত মদ খেয়ে, বিকৃত যৌবন নিয়ে আরতিদি পবিত্রকে কাছে টেনে রাখে নি। জীবনের সব অভিজ্ঞতা, সব ভালবাসা, সব ঐশ্বর্য দিয়ে পবিত্রকে অভিষেক করে প্রতিষ্ঠা করেছিল নিজের জীবনে।

যৌবনের প্রারম্ভে লণ্ডনে এসেই আরতিদির মত একটা স্বপ্নকে হাতের মুঠোয় পেয়ে পবিত্রও পাগল হয়ে উঠেছিল। মাঝে মাঝে পড়াশুনা কাজকর্ম অগ্রাহ্য করেও আরতিদির কোলে শুয়ে থাকত। আরতিদি ভালবাসা দিয়ে শাসন করেছে, পবিত্রর পাগলামি বন্ধ করেছে। তাকে অনুপ্রাণিত করেছে। বলেছে, পবিত্র, তুমি বড় হও, মানুষ হও, ব্যারিণ্টার হও। গর্বে-আনন্দে যেন আমি মাথা উঁচু করে সবার সামনে দাঁড়াতে পারি।

নিজের বুকের মধ্যে দু'হাত দিয়ে পবিত্রকে টেনে নিয়ে চাপা দীর্ঘনিঃশ্বাস ছেড়ে বলেছে, তুমি কোর্টে যাবে, আমি তোমাকে সাজিয়ে দেব। তুমি সুপ্রীম কোর্টে ফুল বেঞ্চের সামনে প্লিড করবে, দূরে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে দেখব। তারপর বার লাইব্রেরীতে ফিরে এলে আমি তোমার গাউন খুলে দেব।

পবিত্র থমকে দাঁড়িয়েছে। পাগলামি বন্ধ করেছে।

দেখতে দেখতে পবিত্র সত্যি সত্যিই একদিন ব্যারিণ্টার হলো। দি টাইমস্ আর ডেইলী টেলিগ্রাফের পাতায় পবিত্রর নাম ছাপা হলো। আরতিদি লক্ষবার কাগজের পাতায় পড়েছিল ঐ একটি নাম, মিষ্টার মুখার্জী পবিত্র।

উৎসব-আনন্দে মুখরিত হয়েছিল ঐ অনন্য দিনটি। আরতিদি কত কি রান্না করেছিল। পায়েস পর্যন্ত। সে দিন সারারাত ঘুমুতে পারে নি, দু'জনে হাসি-খেলায় গল্পে-আনন্দে পাড়ি দিয়েছিল রাতের অন্ধকারে।

পাশ করার খবর পেয়ে অভিনন্দন আর আশীর্বাদ জানিয়ে বাবা-মা'র কাছ থেকে টেলিগ্রাম পেল পবিত্র। দিন কয়েক পর মা'র চিঠি এলো, খোকা, বাবা,

ফিরে আয়। কতদিন তোকে দেখি না।

যাওয়া বল্লেই কি যাওয়া ?

পবিত্র লিখল, কিছুদিন এখানেই একজন ভাল ব্যারিষ্টারের জুনিয়ার হয়ে কাজ করব। নয়ত কলকাতা ফিরে প্র্যাকটিশ করা খুব মুস্কিল হবে।

চিঠিপত্রের আদান-প্রদান চললো অনেকদিন। বাবা ডাকলেন, মা ডাকলেন। পবিত্র বার বার জানাল, এখন ফিরে যাওয়া অসম্ভব।

ইতিমধ্যে পবিত্রর দু'চারজন বন্ধুবান্ধব কলকাতা ফিরে গেল। আরতিদির কথা সবার কানে পেঁৗছল। অনেক রংচং লেগে পেঁৗছল বাবা-মা'র কাছে। লণ্ডনে বসে পবিত্র বা আরতিদি কিছুই জানল না।

মাস ছয়েক পরে পবিত্র অকস্মাৎ টেলিগ্রাম পেল, মাদার ডাইং কাম সার্প ষ্টপ প্যাসেজ বুকড কনটাক্ট এয়ার ইণ্ডিয়া ষ্টপ ফাদার।

মৃত্যুপথযাত্রী মা'র কাছে একমাত্র পুত্রকে ফিরে যেতে আরতিদি বাধা দিতে পারে নি। নিজে হাতে সবকিছু গোছগাছ করে দিল।

দু'দিন পর সকাল বেলায় এয়ারপোর্ট গিয়ে পবিত্রকে বিদায় জানাল আরতিদি। চোখের জল মুছতে মুছতে শুধু বলেছিল, মা'কে সুস্থ করেই ফিরে এস। আমি কিন্তু তোমার পথ চেয়েই বসে থাকব।

পবিত্রর গলা দিয়ে একটি শব্দও বেরোয়নি। শুধু মাথা নেড়ে বলেছিল, নিশ্চয়ই।

মালতীবৌদির কাছে আরতিদির কাহিনী শুনতে শুনতে মুগ্ধ হয়েছিলাম, না বিস্মিত হয়েছিলাম, তা মনে নেই। তবে সারা মন প্রাণ দিয়ে শুনেছিলাম অনন্যা আরতিদির কাহিনী।

আরতিদি উন্মুখ হয়ে বসেছিলেন পবিত্রর পথ চেয়ে। কিন্তু সে আর ফিরল না, ফিরতে পারল না। ক্ষমা প্রার্থনা করে আরতিদির কাছে সে চিঠি লিখেছিল কয়েক মাস পরে। কিন্তু কি ক্ষমা করবে ? কাকে ক্ষমা করবে ? কিসের জন্য ক্ষমা করবে ? এ ক্ষমা চাইবার কি প্রয়োজন ? কি মূল্য ?

কদিন অফিস কামাই করল। কদিন কাঁদল। কোনদিন খাওয়া-দাওয়া করল, কোনদিন করল না।

শেষে একদিন আহত বাঘিনীর মত হিংসা, রাগ, বিদ্বেষে দাউ দাউ করে জ্বলে উঠল। বসন্তের স্নিগ্ধতা বিদায় নিয়ে গ্রীষ্মের রুক্ষতা, উদ্দামতা, অস্থিরতা এলো আরতিদির চরিত্রে। আরতিদি পাল্টে গেল, একেবারে পাল্টে গেল। অতীতকে ভুলে গেল, মুছে ফেললো। অতীতের আরতিদির মৃত্যু হলো। নতুন আরতিদির জন্ম হলো।

আরতিদির রূপ-যৌবনের জলসাঘরে রসিকদের আগমন শুরু হলো ধীরে ধীরে। ডানদিকে তাকাল না, বাঁদিকে তাকাল না, সামনে দেখল না, পিছনে দেখল না, আরতিদি জলপ্রপাতের জলের মত ঝড়ের বেগে নীচে নামতে লাগল। নিঃসঙ্গ নিরালা জীবন কোথায় হারিয়ে গেল। কোনমতে অফিসে যাতায়াত করত ঠিকই, কিন্তু তারপর ? রসিক মৌমাছিদের সঙ্গে নেশায় মাতোয়ারা হয়ে

উঠত আরতিদি। বিয়ার ? জিন উইথ লাইম-কর্ডিয়াল ? না না, ওসব না। ঢক্ ঢক্ করে দু'পেগ হুইস্কী খেয়ে নিজেকে তৈরি করে নিত সে।

বেশি দিন নয়, বছর খানেকের মধ্যেই আরতিদির যশ আর খ্যাতি ইংলণ্ড-প্রবাসী ভারতীয় মহলে ছড়িয়ে পড়ল। কিংস্টনেও পেঁৗছল, ডাক্তারও জানতে পেল।

সেদিন শনিবার। বেলা তখন প্রায় সাড়ে এগারটা-বারোটা হবে। ঘরে 'বাজার' বাজতেই আরতিদির ঘুম ভেঙে গেল। নাইলনের নাইটি পরেই দরজার লক্ খুলে ডাক দিল, 'কাম ইন।'

ডাক্তার ধীর পদক্ষেপে ঘরে ঢুকেই থমকে দাঁড়াল। শুক্রবার রাত্রে ঝড় থামতে নিশ্চয়ই দেরী হয়েছিল, কিন্তু তাই বলে এত বেলা অবধি ঘুমুবে ? ঐ পাতলা ফিনফিনে নাইলনের নাইটি পরে অজানা আগন্তুককে আমন্ত্রণ জানাল আরতি ? ডাক্তার অবাক বিস্ময়ে স্তব্ধ হয়ে দাঁড়ায়।

আরতিদিও অবাক হয়ে যায়। মুহূর্তের জন্য সেও স্তব্ধ হয়ে গেল। এতদিন পর সেই ডাঃ অরবিন্দু সরকার! জলসাঘরের নায়িকা যেন লজ্জা পায়। একটু পরে নিজেকে একটু সামলে নিয়ে বল্লো, 'বসুন।' জলসাঘরের নায়িকাকে এক ঝলক দেখে নিয়ে ডাক্তার বল্লো, 'বসব ?'

আরতিদি এবার একটু সহজ-স্বাভাবিক হয়ে হাসি হাসি মুখে বল্লেন, 'নিশ্চয়ই।'

ডাক্তার একবার ভাবল বলে, আমি বাইরে অপেক্ষা করছি। আপনি কাপড়-চোপড় পরে ডাক দেবেন। তারপর ভাবল, না না, বেহায়াপনার সীমাটা দেখি।

ডাক্তার পাশের সোফাটায় বসল। আরতিদি ডাক্তারের মুখোমুখি বিছানায় বসল। নির্বিবাদে, নির্বিচারে ঐ নাইলনের নাইটি পরেই বসল। ডাক্তার স্তব্ধ হয়ে আর একবার দেখে নিল ভূমধ্যসাগর পাড়ি দেবার সময়ে সেই সঙ্গিনী আরতি রায়কে। সেই জাহাজের শান্ত, স্নিগ্ধ, আত্মভোলা আরতি রায়কে।

'বসুন, চা করি।'

'আমি চা খেয়েছি, আর খাব না।'

আরতিদির রক্তটা একটু চঞ্চল হয়, শেষ রাত্রের নেশাটা বোধহয় আর একবার উঁকি মারে মনের মধ্যে। একটু বেহিসাবী দুষ্টুমি করে। বলে, 'মাই গড! হোয়াট এ গুড বয়।'

ডাক্তারের মাথায় যেন খুন চড়ে যায়। ঠাস করে আরতিদির গালে একটা চড় মারে ডাক্তার! বল্লো, 'বদমাইসীরও একটা মাত্রা আছে।'

ডাক্তার আর এক মুহূর্ত অপেক্ষা না করে ঝড়ের বেগে বেরিয়ে গেল।

আরতিদি হতবাক হয়ে গালে হাত দিয়ে বসে রইল। আকাশ-পাতাল ভাবল। ডাক্তার মারল ? কোন্ অধিকারে ? কিসের জন্য ? সেই সামান্য পরিচয়ের সূত্র ধরে শাসন করার সাহস পেল কেমন করে ? নিজেকে প্রশ্ন করে আরতিদি। কিন্তু কোন জবাব পেল না। চুপটি করে বসে রইল। এক পেয়ালা

চাও খেল না।

প্রায় একটা নাগাদ দাশগুপ্তের টেলিফোন এলো, কি হলো আরতি ? এখনও রওনা হওনি যে ?

মুখ দিয়ে হঠাৎ বেরিয়ে গেল, 'কলকাতা থেকে আমার এক আত্মীয় হঠাৎ এসে হাজির। আমি আজ আর যেতে পারছি না।'

'সে কি ?'

'হ্যাঁ, প্লিজ এক্সকিউজ মী।'

সন্ধ্যায় ? রাত্রিতে ? অরোরার কক্‌টেলে ? না, কোথাও না।

সারাদিন নিজের ঘরে স্বেচ্ছায় বন্দিনী হয়ে রইল আরতিদি। রাত্রে শুয়েও ডাক্তারের এই অস্বাভাবিক আচরণের কথা ভাবল। অবাক হলো, বিস্মিত হলো, কিন্তু ইচ্ছা করেও রাগ করতে পারল না তার ওপর।

রবিবার ভোরবেলায় ঘুম থেকে উঠে আর ধৈর্য রাখতে পারল না। সাতটা বাজতে না বাজতেই ওয়াটারলু স্টেশনে গিয়ে কিংস্টনের ট্রেনে চাপল।

ডাক্তার ঘুম থেকে উঠে সবে চায়ের জল চাপিয়েছে, এমন সময় 'বাজার' বাজল। ড্রেসিং গাউনটা জড়িয়ে নিয়ে দরজা খুলে আরতিদিকে দেখে ডাক্তার চমকে উঠল।

'আপনি ?'

আরতিদি মাথা নীচু করে দাঁড়িয়ে রইল।

ডাক্তার আবার প্রশ্ন করল, 'কি মনে করে ?'

মাথা নীচু করেই আরতিদি ছোট্ট উত্তর দিল, 'ভিতরে আসতে পারি ?'

ডাক্তার একটু মুচকি হেসে বলে, 'শাস্তি দিতে এলেন নাকি ?'

আরতিদিও একটু হাসল। 'বাইরে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে শাস্তি দেব কি করে ? আগে ভিতরে ঢুকতে দিন।'

আরতিদি ঘরের ভিতরে এসে একবার দৃষ্টিটা ঘুরিয়ে নিল চারপাশে। ছন্নছাড়া ব্যাচিলারের ঘর। পুরান বই-খাতা, ছেঁড়া জুতো, নোংরা জামা-কাপড়ের প্রদর্শনী যেন। পড়ার টেবিলের একপাশে একজন বিধবা মহিলার একটা ছবি। মা'র ছবি। চেয়ারের ওপর থেকে নোংরা জামা-কাপড়গুলো সরিয়ে নিয়ে ডাক্তার বল্লো, 'বসুন।'

আরতিদি বসলেন। ডাক্তার বসল বিছানায়। দুজনের কেউই অনেকক্ষণ কোন কথা বললো না। ডাক্তার ভীষণ অস্বস্তিবোধ করছিল। আগে কোন অনুশোচনা না এলেও আরতিদিকে সামনে দেখে মনটা বড় ব্যথিত হলো সেদিনের কথা মনে করে। চটপট মনে মনে একবার নিজেই নিজের বিচার করে নিল। রায় দিল ক্ষমা চাইতে হবে।

'আপনি আমাকে ক্ষমা করবেন।'

আরতিদি এবার মুখ তোলে। বলে, 'কেন বলুন তো ?'

'কোন ভদ্রলোক কোন মেয়ের গায়ে হাত তুলতে পারে না। আমি সেদিন সেই চরম অভদ্রের কাজ করেছি।'

যেন শাসন অমান্য করেই আরতিদির মুখে একটু দুষ্টু হাসি এসেই পালিয়ে গেল। 'কোন্ অধিকারে আমি আপনাকে শাসন করব বলুন? আমি আপনার কে?'

ডাক্তার একটু বিপদে পড়ে। একটু ভাবে, একটু চিন্তা করে। 'অধিকারের কি প্রশ্ন থাকতে পারে এখানে। অন্যায় করেছি, ক্ষমা চাইছি, ক্ষমা করুন।'

'তাই কি হয়? মনে মনে আপনি নিশ্চয়ই আমাকে শাসন করার কোন অধিকার অর্জন করেছেন এবং সেইজন্যই সেদিন শাসন করেছিলেন।' আরতিদি একটু থামে। নিজের অজ্ঞাতেই যেন একটু ব্যাকুল হয়ে ডাক্তারের দিকে তাকায়। একটা দীর্ঘনিঃশ্বাসও পড়ে। বলে, 'কিন্তু আমি কোন্ অধিকারে আপনার বিচার করব? সে অধিকার আমি অর্জন করেছি, না আপনি দিয়েছেন?'

কথাটা শুনে ডাক্তার একটু ঘাবড়ে যায়। কোন জবাব দেয় না, চুপ করে বসে থাকে।

'আপনি তো আচ্ছা লোক! রবিবার ভোরবেলায় আপনার কাছে ছুটে এলাম; অথচ এক কাপ চা দেবার পর্যন্ত নাম করছেন না।'

ডাক্তার ভীষণ লজ্জা পায়। 'সত্যি অন্যায় হয়ে গেছে। আপনার সঙ্গে ঝগড়া করতে গিয়ে নিজেও সকাল থেকে চা না খেয়ে বসে আছি।'

'সে কি?'

'রোজ সাতটার মধ্যে বেরুতে হয়। আজ তাই একটু বেলা পর্যন্ত ঘুমুচ্ছিলাম।'

ডাক্তার আর কথা বলে না, বসে থাকে না। চা তৈরী করতে যায়।

আরতিদিও আর বসে থাকে না। শাড়িটা একটু ঠিক করে উঠে যায়। 'খুব হয়েছে, বসুন। আপনার চা যদি খাওয়ার ইচ্ছা থাকত তাহলে অনেক আগেই উঠতেন। আপনি বসুন। আমি নিজেই চা করে খাচ্ছি।' ডাক্তারের দিকে তাকিয়ে একটু মুচকি হেসে বল্লো, 'আপনাকেও এক কাপ দেব।'

একবার নয়, দু'বার নয়, তিন তিন বার চা-কফি তৈরী করল আরতিদি। আরো পরে, বেলা প্রায় সাড়ে দশটা-এগারটা নাগাদ আরতিদি ব্রেকফাস্ট তৈরী করলেন। ব্রেকফাস্ট খাওয়া শেষ করে কফি খেতে খেতে আরতিদি বল্লেন, 'এবার চলে যাব, নাকি লাঞ্চ সেরে যাব?'

'কেন লজ্জা দিচ্ছেন? কেন চাঁদির জুতো মারছেন?'

'ছি ছি, আপনি আমাকে অত হীন ভাববেন না। আমার মনের কথা আপনি জানেন না। নিজের মনকে ফাঁকি দেবার জন্য আমি হয়ত নীচে নেমে গিয়েছিলাম। কিন্তু তাই বলে আমার মনটা নীচ নয়।'

ডাক্তার একবার দেখে নেয় আরতিদিকে। মনে হল চোখ দুটো ছলছল করছে। নিজেকে বড় অপরাধী মনে হলো ডাক্তারের। 'আমার এত বড় অপরাধ ভুলেও আপনি যখন সকালে এলেন, তখনই বুঝেছি নীচ আপনি নন, নীচ আমি।'

'ওকথা বলবেন না। আপনার মহত্ত্ব আপনি হয়ত বুঝতে পারেন নি বা জানেন না, কিন্তু আমি জেনেছি এবং শুধু মহত্ত্বের কাছে হাসিমুখে হার স্বীকার করার জন্যেই আমি এসেছি।'

ডাক্তার সে কথার সরাসরি জবাব না দিয়ে বলে, 'দয়া করে আমার মহত্ত্বের কথা জানিয়ে মাকে একটা চিঠি লিখে দেবেন?'

'নিশ্চয়ই। তবে আজ নয়, আর কদিন পরে।'

চমৎকার মাছের ঝোল আর ভাত রাঁধলেন আরতিদি। খেতে বসে ডাক্তার বল্লো, 'সেই কলকাতা ছাড়ার পর আর এমন রান্না খাই নি।'

'ঠাট্টা করছেন?'

'খাওয়া নিয়ে ঠাট্টা-তামাসা করার মত বোকা লোক নই।' একটু থেমে ডাক্তার জিজ্ঞাসা করল, 'আবার কবে খাওয়াবেন এমনি?'

'যেদিন বলবেন।'

'সত্যি?'

'নিশ্চয়ই।'

সন্ধ্যার পর অন্তর্দ্বন্দ্বে আহত আরতিদি প্রায় সুস্থ হয়ে ফিরে এলেন লণ্ডনে। তাছাড়া, শুধু ফিরে এলেন না, ফিরে পেলেন হারিয়ে যাওয়া নিজেকে, নিজের মনকে, নিজের সত্তাকে।

সেই হলো শুরু। উন্মত্ত কাল-বৈশাখীর দিন ফুরিয়ে গেল, পালিয়ে গেল, হারিয়ে গেল। নেমে এলো বর্ষা। অসংখ্য আর অশেষ সম্ভাবনার বর্ষা। মনের যে বীজ বৈশাখের আগুনে শুকিয়ে প্রায় প্রাণহীন হয়েছিল, বর্ষায় সে বীজ আবার অংকুরিত হলো। আরতিদি স্বপ্ন দেখল পল্লবিত বৃক্ষে ফুল ফলের। হয়ত বা ভবিষ্যত বীজেরও। কে জানে? স্বপ্ন তো শাসন মানে না!

ডাক্তার বড় অস্বস্তিবোধ করছিল। সেদিনকার ঘটনার প্রতি আরতিদির আশ্চর্য ঔদাসীন্য ডাক্তারের মনকে বড় খোঁচা দিচ্ছিল। নিজের কাছেই নিজেকে বড় ছোট মনে হলো। মন চাইছিল আরতিদির কাছে ছুটে গিয়ে ক্ষমা চাইতে, কিন্তু পারে নি। সংকোচ বোধ হলো। মনের আগুন মনকেই পোড়াতে লাগল।

মনে পড়ল সেই জাহাজের কথা। কদিনের মেলামেশায় আরতিদিকে নিশ্চয়ই ভাল লেগেছিল ডাক্তারের। স্নিগ্ধ, শান্ত, কল্যাণী আরতিদির ছাপ মন থেকে মুছে গেল না। তাইতো যখন বারবার সেই আরতিদির কুৎসা শুনতে লাগল লণ্ডনের ভারতীয় মহলে, ডাক্তার সহ্য করতে পারে নি। নীরবে, নিভৃতে, লুকিয়েও যে আরতিদিকে ভাল লেগেছে, মন-প্রাণ দিয়ে যার কল্যাণ কামনা করেছে, তার অধঃপতন? না না, ডাক্তার চুপ করে বসে থাকতে পারে নি। রাগে, দুঃখে আরতিদির গালে ঠাস করে একটা চড়ই মেরে দিয়েছিল। অনুশোচনা? হয়েছিল বৈকি। তবে পরমুহূর্তেই আবার ভেবেছে সে ছাড়া আরতিদিকে আর কে শাসন করবে? আর কার সে অধিকার আছে? কারুর না। আর অনুশোচনা করে নি ডাক্তার।

রবিবার সন্ধ্যায় আরতিদি বিদায় নেবার পর ডাক্তার প্রথম পরাজয়ের স্বাদ অনুভব করল। এতদিন পর এবার অনুশোচনা দেখা দিল ডাক্তারের মনে। ভাবল একবার আরতিদির ওখানে গিয়ে সব কথা বলবে আর ক্ষমা চাইবে।

কিন্তু ভাবতে ভাবতেই আর একটা সপ্তাহ পার হয়ে গেল। আবার শনিবার এলো। সাড়ে আটটা কি ন'টা বাজে। ডাক্তার এখনো লেপ মুড়ি দিয়ে শুয়ে আছে। ঘুমুচ্ছিল না, কিন্তু তখনও ঘোর তন্দ্রার রাজত্ব চলছে।

আরতিদি আবার এসে হাজির হলেন। আরতিদিকে অভ্যর্থনা করেই দিন শুরু করবে বলে হয়ত ডাক্তার অত বেলা অবধি শুয়েছিল।

টেবিলের ওপর হাতের ব্যাগটা নামিয়ে রাখতে রাখতে আরতিদি বল্লেন, 'আপনি এখনো ঘুমুচ্ছিলেন ?'

'ভাবছিলাম আপনার হাতের তৈরী এক কাপ চা খেয়েই উঠব, তাই শুয়েছিলাম।'

আরতিদি হাসতে হাসতে বল্লেন, 'বেশী কিছু করবার ক্ষমতা আমার নেই কিন্তু আপনার এই সামান্য ইচ্ছেটা নিশ্চয়ই মেটাতে পারব।'

ডাক্তার বিছানার ওপর চুপ করে বসে রইল। আরতিদি চা করে এগিয়ে দিলেন, 'এই নিন চা।' একটু থেমে, নিজের পেয়ালায় একটা চুমুক দিয়ে আবার বল্লেন, 'এবার হুকুম করুন।'

ডাক্তার হাসল। বল্লো, 'আমি কি অধিকারে হুকুম করব ?'

চটপট পাল্টা উত্তর বেরিয়ে এলো আরতিদির মুখ দিয়ে, 'যে অধিকারে আমার গালে চড় মেরে আমাকে শাসন করেছিলেন।'

কথাটা শোনবার সঙ্গে সঙ্গে ডাক্তার পাথরের মত নির্বাক নিশ্চল হয়ে গেল।

আরতিদি একবার দেখে নেয় ডাক্তারকে। বুঝল, আঘাতটা একটু বেশী লেগেছে। আরতিদিরও মনটা ভীষণ খারাপ লাগল। সকালবেলায় এসেই এমন আঘাত দেওয়াটা অন্যায় হয়েছে। এক মুহূর্ত অপেক্ষা করল সে। তারপর সহসা ডাক্তারের সামনে দাঁড়িয়ে দু'হাত দিয়ে মুখটা তুলে ধরে বল্লো, 'ভগবানের নামে শপথ করে বলছি আমি আপনাকে দুঃখ দিতে চাই নি। বিশ্বাস করুন, আপনার হাতের ঐ একটা চড় খেয়ে আমার যা উপকার হয়েছে, তা আর কেউ করবে কিনা জানি না।'

আরতিদি মুহূর্তের জন্য দৃষ্টিটাকে দূরের আকাশে ঘুরিয়ে নিয়ে এলেন। বল্লেন, 'যখনই মনে হবে আমি অন্যায় করছি, তখনই আমাকে শাসন করবেন। শাসন না করলেই বুঝবো আপনি আর আমাকে ভালবাসেন না।'

শেষের কথাটায় দু'জনেই যেন একটু চমকে উঠল। এতবড় সত্যি কথা এত সহজে এত তাড়াতাড়ি শোনা যাবে, হয়ত কেউই ভাবে নি।

ডাক্তার তক্ষুনি কিছু বলতে পারে নি। পরে বলছিল, 'আপনি ঠিকই বুঝেছেন। আপনার নিন্দা শুনতে শুনতে আমি প্রায় পাগল হয়ে উঠেছিলাম এবং সেইজন্যই সেদিন আর নিজেকে সংযত করে রাখতে পারি নি।'

'আপনি অসংযত না হলে আমি যে সংযত হতাম না।'

দু'জনের জীবনেই মোড় ঘুরে গেল। আশ্চর্য সংযত ও ছন্দবদ্ধ জীবনের পথে পা বাড়াল দু'জনেই।

ছন্নছাড়া ডাক্তারের সংসারের চেহারা পাল্টে গেল। একেবারেই পাল্টে গেল। সব ছিমছাম ফিটফাট করে সাজিয়ে গুছিয়ে দিলেন আরতিদি।

ডাক্তার বল্লো, 'এমন করে সাজিয়ে গুছিয়ে দিচ্ছেন যে লোক ভাববে আমি বিয়ে করেছি।'

'বলবেন ইন্টিরিয়ার ডেকরেটার আরতি রায় সাজিয়ে দিয়েছে।' আরতিদি বাঁকা চোখে ডাক্তারের দিকে তাকিয়ে বলে, 'একথা বলতে তো লজ্জা বা অপমান হবে না?'

ডাক্তার হাসতে হাসতে বলে, 'আপনার মাথায় তো বেশ রেডিমেড দুষ্টু বুদ্ধি জমা আছে?'

ইন্টিরিয়ার ডেকরেটার আরতিদি ডাক্তারের মনের মধ্যেও নতুন রূপসজ্জা করে দিল।

টেমস-এর জল আরো গড়িয়ে যায়। শুক্রবার অফিস থেকে বেরিয়ে আরতিদি মার্কেটিং করতে যান। দু'টি সংসারের যথাসর্বস্ব কেনেন। পরের দিন সকালে দু'টি হ্যাণ্ডব্যাগে জিনিসপত্র নিয়ে ডাক্তারের ওখানে হাজির হন। পর পর দু'কাপ চা খেয়ে আরতিদি লেগে পড়েন সংসারের কাজে, ঘর-দোর পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন করা, ময়লা জামা-কাপড় কাচা, জিনিসপত্র সাজিয়ে গুছিয়ে রাখা—সবকিছু করেন।

কাজকর্ম করতে করতেই আরতিদি বকবক করেন, 'কি আশ্চর্য! বালিশের তলায় দুটো ময়লা গেঞ্জি লুকিয়ে রেখেছেন।'

কখনও আবার, 'কি ব্যাপার বলুন তো? গত উইকের চিজ এখনও এতটা পড়ে আছে? আমি আজই আপনার মাকে চিঠি লিখব।'

'দোহাই আপনার। আমি এক্ষুনি চিজ খাচ্ছি কিন্তু আপনি মাকে চিঠি লিখবেন না। একমাত্র পুত্রের অনাহারের খবর পেলে মা হয়ত রোজই একাদশী করতে শুরু করবেন।'

নিজের জন্য আর কিছু ভাবে না ডাক্তার। সব ভাবনার বোঝা তুলে নিল আরতিদি।

আর আরতিদি? ডাক্তারের অনুমতি ছাড়া এক পা এদিক ওদিক করত না। একটা পেনি নষ্ট করত না। যখনই পেরেছে বোনেদের জন্য যথাসাধ্য করেছে। চিরকালই করেছে।

মালতীবৌদি এবার থামলেন। একবার হাসলেন, একবার গম্ভীর হলেন।

আরতিদির কথা শুনতে শুনতে অনেক রাত হয়েছিল। মালতীবৌদিকে ওর বাসায় নামিয়ে দিয়ে আমি ফিরে এলাম।

পরের দিন সকালেই মালতীবৌদি খবর পেলেন সদানন্দদা চণ্ডীগড় থেকে জলন্ধর ও অমৃতসর ঘুরে দিল্লী ফিরবেন। দু'তিন দিন তো লাগবেই।

মালতীবৌদি সকালবেলাতেই আমাকে টেলিফোন করে খবর দিলেন, অফিসে যাচ্ছি না। দুপুরে খেতে এসো।

আবার আরতিদির কথা শুনেছিলাম। শুনছিলাম যে, এক ও অভিন্ন হয়ে ডাক্তার আর আরতিদি এগিয়ে গিয়েছে ভবিষ্যতের দিকে।

আরতিদির মন মাঝে মাঝে বিদ্রোহ করেছে। মন চেয়েছে ডাক্তারকে আরো একান্ত করে পেতে, সমস্ত সত্তা দিয়ে পেতে। ডাক্তার? সেও হয়ত চাইত, কিন্তু একটি দিনের জন্যও সে অনধিকার চর্চা করে নি। বলেছে, আমি তো আপনারই। সিন্দুকের চাবিটাই আপনার কাছে। সুতরাং সেই সিন্দুক থেকে একটা দু'টো টাকা নেবার জন্য অত ব্যগ্র কেন?

আরতিদি একদিন বলেছিলেন, আপনি আমাকে তুমি বলে ডাকবেন না?

কি দরকার? আপনি কি আমার কম আপন? তুমি বলে ডাকলেই কি আরো আপন হবো? সে অধিকার যখন পাব তখন আপনার অনুমতির জন্য অপেক্ষা করব না!

টেমস্-এর জল আরো অনেক গড়িয়ে গেল। সামার, অটাম, স্প্রিং, উইণ্টারের চাকা বার বার কয়েকবার ঘুরে গেল।

অকস্মাৎ একদিন আরতিদি সিঁদুর পরে ডাক্তারের ওখানে হাজির হলো। ডাক্তার কিছু বলবার আগেই আরতিদি ডাক্তারকে প্রণাম করল।

ডাক্তার অবাক হয়ে বল্লো, কি ব্যাপার?

মুহূর্তের জন্য স্তব্ধ হয়ে দাঁড়িয়ে রইল আরতিদি। তারপর সমস্ত মুখে তৃপ্তির হাসি ফুটিয়ে বল্লেন, মনে মনে যে সত্য মেনে নিয়েছি, তার একটা সাইনবোর্ড লাগিয়েছি বলে অবাক হচ্ছেন কেন?

সেই সেদিন প্রথম ডাক্তার একবার আরতিদিকে বুকের মধ্যে টেনে নিয়েছিল। আর বলেছিল, ভগবান আপনাকে সুখী করুন।

আশ্চর্য মানুষ এই ডাক্তার। স্বেচ্ছায় হাসি মুখে আরতিদি সবকিছু অধিকার তুলে দিলেও সে তার কোন অপব্যবহার করে নি। ভবিষ্যতের জন্য গচ্ছিত রেখেছিল। আজও গচ্ছিত রয়েছে।

আরতিদির কাহিনী শোনা শেষ হলো! মালতীবৌদি কোথায় যেন তলিয়ে গেল। কেমন যেন বিমনা হয়ে গেল।

আমি জিজ্ঞাসা করলাম, কি হলো?

'কিচ্ছু না।'

'তবে কি ভাবছ?'

'কিচ্ছু না!'

একটু পরে মালতীবৌদি একবার আপন মনে বলে উঠল, তোমার দাদাকে লক্ষ্য করছ?

'দাদার আবার কি হলো?'

একটা দীর্ঘনিঃশ্বাস ছেড়ে বল্লো, না কিছু হয় নি। তবে আমার বা দিদির জীবনের মত তার জীবনেও তো কিছু হতে পারে।

॥ ছয় ॥

সে তো অনেক দিন আগের কথা। সেদিন সদানন্দদার অপারেশন হবার সময় মালতীবৌদির চোখে সারা দুনিয়াটা অন্ধকার মনে হয়েছিল। কিন্তু বেশীক্ষণ চোখের জল ফেলে নি। কোমরে কাপড় জড়িয়ে অদৃষ্টের বিরুদ্ধে লড়াই করেছিল। পঙ্গু স্বামীর কল্যাণের জন্য সর্বস্ব পণ করে লড়াই করেছিল। সেদিন ধ্রুবতারার মত শুধু স্বামীর কল্যাণই ছিল তার স্বপ্ন, সাধনা।

সদানন্দদা? প্রথম প্রথম নিজেকে ভীষণ অপরাধী মনে করত। মধ্যবিত্ত ঘরের অনভিজ্ঞা মালতীকে জীবনে সংগ্রামের সর্বনাশা যুদ্ধক্ষেত্রে ঠেলে দেওয়ায় নিজেকে অপরাধী মনে করেছিল। কিন্তু কি করবে? দুটো পা নিয়ে দৌড়াদৌড়ি করেই দু'বেলা দু'মুঠো জোগাড় করা প্রাণান্তকর ছিল। একটা পা নিয়ে তো দূরের কথা।

সেদিন অনেক কিছুই ছিল না, কিন্তু দু'জনের কারুরই হৃদয়-ঐশ্বর্যের অভাব হয় নি। ঘরে সেদিন অর্থ ছিল না সত্য কিন্তু তার জন্য মনে দৈন্য আসে নি কোনদিন।

সে সব দিন ফুরিয়ে গেছে, হারিয়ে গেছে। অতীতের অতল গহ্বরে চিরকালের জন্য চাপা পড়েছে। আজ অভাব নেই, অনটন নেই, জীবনধারণের সমস্যা নেই। আর নেই সেই অতীতের মন, হৃদয়, মনোভাব। হয়ত আরো অনেক কিছুই নেই। কর্মজীবনের চাপে মালতীবৌদিও আর সে মালতীবৌদি থাকতে পারে নি, থাকা সম্ভব হয় নি।

সকাল আটটায় ডিউটি থাকলে তো কথাই নেই। হীরা সিং চা নিয়ে দরজায় নক করার আগেই উঠে পড়ে। চা খেয়েই বাথরুমে। সাড়ে ছ'টায় মধ্যে স্নান সারা। সরকারী অফিসের কেরাণীর চাকরি নয়, ইণ্টারন্যাশনাল এয়ারলাইন্সের চাকরি। সাজগোজ প্রসাধন করতেই হয়। এসব শেষ করে রেডি হতে হতে সাতটা বাজে।

সদানন্দদা তখনও ঘুমিয়ে। মালতীবৌদি আস্তে মাথায়-গায় হাত দিতে দিতে ডাকেন, শুনছ। উঠবে না?

বেশ কয়েকবার ডাকাডাকি করার পর চোখ খোলেন সদানন্দদা।

বলেন, তুমি রেডি? ক'টা বাজে?

'সওয়া সাতটা।'

সদানন্দদা উঠে পড়েন। চোখ মুখে একটু জল দিয়ে এলেই মালতীবৌদি চায়ের পেয়ালা এগিয়ে ধরেন। ঐ বেডরুমে সদানন্দদার পাশে বসেই মালতী-বৌদিও সামান্য কিছু ব্রেকফাষ্ট খেয়ে নেন।

আলমারী থেকে হ্যাণ্ডব্যাগটা বের করে, ড্রেসিং টেবিলের সামনে দাঁড়িয়ে নিজেকে এক ঝলক দেখতে দেখতেই ডান হাতে ঘড়িটা পরে।

সদানন্দদার বেশ লাগে। বেশ ভাল লাগে। টিপাইয়ের ওপর চায়ের পেয়ালা নামিয়ে রাখতে রাখতে মিট মিট করে হাসে। আয়নার মধ্যে মালতী-বৌদির কাছে সে হাসি ধরা পড়ে। নিজের মুখেও একটু হাসির রেখা ফুটে ওঠে। শাড়ির আঁচলটা টানতে টানতে বলে, অমন করে হাসছ কেন ?

সদানন্দদা কোন জবাব দেয় না, শুধু মুখ টিপে টিপে হাসে।

'কি আশ্চর্য ! হাসছ কেন ?'

সদানন্দদা তবুও নিরুত্তর। মালতীবৌদির হাতের ঘড়ি রেসের ঘোড়ার মত দৌড়াচ্ছে। সদানন্দদার গাল টিপে ধরে বলে, খালি অসভ্যতা।

'মুগ্ধ হয়ে তোমার রূপ দেখছি, তাতে অসভ্যতার কি হলো ?'

'বাজে বকো না। ঠিক মত খাওয়াদাওয়া করে যেও। আর হ্যাঁ, তোমার ঐ প্রিয় প্যাণ্ট আর বুশ সার্টটা আর পরো না। আমি বাথরুমে তোমার জামা কাপড় সবকিছু রেখে গেলাম।'

সিঁড়ি দিয়ে দৌড়ে দৌড়ে নামতে নামতে মালতীবৌদি প্রায় চিৎকার করে, বেশী রাত করো না কিন্তু।

যথেষ্ট ভালবাসা ছিল দু'জনের মধ্যে। যথেষ্ট সংগ্রাম করেছে দু'জনে। স্বামীকে বাঁচাবার জন্য, নতুন জীবনে প্রতিষ্ঠিত করবার জন্য মালতীবৌদি কি না করেছে। সদানন্দদা নিশ্চয়ই সেজন্য কৃতজ্ঞ। পঙ্গু স্বামীকে সমাজের সম্ভাব্য সমস্ত অবমাননার হাত থেকে রক্ষা যে করেছে, সে এই মালতী।

ল্যাটাদার থিয়েটার পার্টির চাইতে ইণ্টারন্যাশনাল এয়ারলাইন্সের চাকরি অনেক ভাল। সব দিক দিয়ে ভাল। অর্থও বেশি, পরিবেশও অনেক ভদ্র। নোংরা মেকআপম্যানরা নিজের ঠোঁট দিয়ে মালতীবৌদির ঠোঁটের রং আর মুছে নিতে পারে না। পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন সভ্য পরিবেশ। তবে হ্যাঁ, ডিউটি পাল্টায়। কখনো সকালে, কখনো বিকেলে, কখনও বা সারারাত। তাহোক, তবুও অনেক ভাল। স্বামীর দৌলতে নয়, ল্যাটাদার থিয়েটার পার্টির কৃপায় রাত জাগার অভ্যাস আছে। তাছাড়া একটানা রাত জাগতে হয় না। রেষ্টরুমে বিশ্রাম নেবার ব্যবস্থা আছে। মালতীবৌদি মোটেও দূরে সরে যায় নি, বরং আরো অনেক কাছে এসেছিল। কিন্তু—যাক, সেকথা পরে হবে।

সদানন্দদা ? যতদিন সে পঙ্গু হয়ে ঘরের মধ্যে বন্দী ছিল, ততদিন সে মালতীর চোখে মুখে একটা ব্যগ্রতা, স্বামীর জন্য ব্যগ্রতা, লক্ষ্য করেছে। সব সময়ের জন্য সে ব্যগ্রতা দেখা যেত। সারাদিন সংসার-ধর্ম করে প্রায় রোজ সন্ধ্যার দিকেই রিহার্সাল দিতে যেত। ফিরতে রাত দশটা এগারটা, হয়ত বা বারোটাও বাজত। কিন্তু তাহোক, সদানন্দদা লক্ষ্য করত মালতীবৌদি ছুটতে ছুটতে বাড়ী ফিরত। স্বামীর চিন্তার ব্যগ্রতা নিয়ে বাড়ী ফিরত। থিয়েটার থাকলে প্রায় রাত কাবার করেই ফিরত। দিল্লীর বাইরে গেলে তো সে রাত্রে ফেরার কোন প্রশ্নই ছিল না। তার জন্য কোনদিনই মনের মধ্যে কোন প্রশ্ন জাগে নি। কোন সঙ্কোচ, দ্বিধা বা সন্দেহ তো দূরের কথা। মালতীকে যখনই কাছে পেয়েছে, তখনই সদানন্দদার মনটা ভরে উঠেছে। আনন্দে, তৃপ্তিতে,

ভালবাসায় ভরে উঠেছে। মাঝে মাঝে গর্বেও বুকটা ভরে উঠত। গর্বে? হ্যাঁ, হ্যাঁ, গর্বে। পতিব্রতা স্ত্রীর গর্বে। স্ত্রীর ভালবাসার গর্বে। স্বামীর জন্য স্ত্রীর আত্মত্যাগের গর্বে।

সদানন্দদা স্বামীর কর্তব্য করতে পারে নি। কোন কর্তব্যই করতে পারে নি। স্ত্রীর পেটের ক্ষিদে, মনের ক্ষিদে মেটাবার ক্ষমতা তার ছিল না। শুধু কি তাই? মালতীবৌদির দেহের দাবীও সে মেটাতে পারত না। সারা রাত প্রেমের অভিনয় করে এসে শেষ রাতে সদানন্দদাকে বুকের মধ্যে টেনে নিয়ে মালতীবৌদি দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলেছে। স্বামীকে টেনে ছিঁড়ে শেষ করে দিয়েছে কোন কোন দিন। সব স্বামীর মত সদানন্দদাও সব কিছু বুঝত। নিজেও দাউ দাউ করে জ্বলে উঠেছে কোন কোন দুর্বল মুহূর্তে। কিন্তু তারপরই পিছিয়ে গেছে। দুজনেই পিছিয়ে গেছে।

তবুও সদানন্দদা মনে মনে তৃপ্তি পেয়েছে, শান্তি পেয়েছে এই কথা ভেবে, উপলব্ধি করে যে, মালতী তার। একান্ত, নিতান্ত শুধু তারই।

বর্ষার কালো মেঘ যখন কেটে গেল, সরে গেল, শরতের নীল আকাশ হাসতে হাসতে আত্মপ্রকাশ করল, যখন সদানন্দদা আর মালতীবৌদি দুজনেই আবার মাথা উঁচু করে দাঁড়াল, তখন যেন কি হলো! মালতীবৌদি আশা করেছিলেন মন প্রাণ দিয়ে স্বামী তাকে সুখী করবে। অতীত দিনের সব দুঃখের, সব অভাবের, সব না পাওয়ার বেদনা মুছে ফেলবে সর্বস্ব দিয়ে। কিন্তু কেন যেন সদানন্দদা এক পা এগিয়ে দু'পা পিছিয়ে গেছেন। কর্মক্লান্ত দিনর শেষে মালতীবৌদিকে দু'হাতে টেনে নিয়েছেন কাছে কিন্তু তারপর আর পারেন নি। হয়ত স্বামীর দাবী মিটিয়েছেন, কর্তব্য পালন করেছেন, কিন্তু প্রাণ ভরে ভালবাসা দিতে গিয়ে থমকে দাঁড়িয়েছেন। অনেকটা এগিয়েও পিছিয়ে গেছেন।

বাবা ভাল চাকরি করলেও বাঙ্গালী গেরস্ত ঘরের মেয়ে মালতীবৌদি। দেহে যখন প্রথম বসন্ত দেখা দিল, কখনও কখনও কোকিলের ডাক কানে এসেছে বৈকি। মনে রঙ লেগেছে, চোখের দৃষ্টিটা পাল্টে গেছে, কিন্তু তার বেশি আর কিছু না। আর এগুতে পারেন নি। সংস্কারের ভয়ে সংযম রক্ষা হয়েছে। কোকিলের ডাক কানে এসেছে কিন্তু ফিরে তাকায় নি। বাঙ্গালী মধ্যবিত্ত গেরস্ত ঘরের অধিকাংশ মেয়ের জীবনে যা ঘটে আর কি। বাথরুমে স্নান করতে গিয়ে, একলা ঘরে ড্রেসিং টেবিলের সামনে দাঁড়িয়ে শাড়ি পরবার সময় বা একটু প্রসাধন করবার সময় নিজেরই নিজেকে ভাল লেগেছে। কখনও কখনও অসতর্ক মুহূর্তে জোয়ারের জল মন-প্রাণের কানায় কানায় ভরে গেছে। মন চেয়েছে, দেহ চেয়েছে স্বামী তাকে নিয়ে খেলা করুক, বিরক্ত করুক। সারারাত ধরে বিরক্ত করুক। তারপর স্বামীর ভালবাসা অনুভব করবে, সমস্ত মন-প্রাণ দিয়ে অনুভব করবে শিরায় শিরায়, প্রতি রক্তবিন্দুতে।

কিন্তু তা হয় নি। সদানন্দদা এক পা এগিয়ে দু'পা পিছিয়ে গেছে। মালতীবৌদিকে একটু আদর করেছে, একটু মাথায় মুখে হাত বুলিয়ে দিয়ে

বলেছে, নাও এখন ঘুমিয়ে পড়। তোমার তো আবার ভোরে উঠতে হবে।

মালতীবৌদি একটা চাপা দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলে পাশ ফিরে শুয়েছে কিন্তু ঘুমুতে পারে নি। অনেক রাত অবধি ঘুমুতে পারে নি।

একদিন নয়, দু'দিন নয় দিনের পর দিন, মাসের পর মাস মালতীবৌদি পাশের জানালা দিয়ে শূন্য মনটাকে নিয়ে বিরাট আকাশের কোলে ঘুরে বেড়িয়েছে। মন চেয়েছে একটু আশ্রয়। একটু নিবিড় ভালবাসার কোলে বিশ্রাম নিতে। পায় নি। কোনদিনই পায় নি।

মালতীবৌদি সত্যি পাল্টে গিয়েছিল। না পাল্টে উপায় ছিল না। ইণ্টারন্যাশনাল এয়ারলাইন্সের চাকরি। পোষাক-পরিচ্ছদ থেকে শুরু করে কথাবার্তায় পর্যন্ত একটা অভিনবত্ব প্রয়োজন। মার্জিত রুচির সঙ্গে আধুনিকতার কক্‌টেল আর কি! তবে নিজের বা অন্যের মনোরঞ্জনের জন্য নয়, চাকরির প্রয়োজনে, পারিপার্শ্বিকতার প্রয়োজনে। পোষাক পাল্টে ছিল, হয়ত বা কথাবার্তা—আচরণও পাল্টে ছিল। মোটকথা বাইরে থেকে মালতীবৌদি সত্যি পাল্টে ছিল।

ল্যাটাদার থিয়েটার পার্টির সমরেশবাবু প্রায় চিরস্থায়ী রোমাণ্টিক নায়ক ছিলেন। মালতীবৌদি ছিলেন নায়িকা। থিয়েটারের লোকজনের ভাষায় ষ্টেজ-ওয়াইফ। দিল্লীতে অসংখ্য থিয়েটার পার্টির অসংখ্য নায়ক আছেন। নিঃসন্দেহে সমরেশবাবু তাদের মধ্যে অন্যতম শ্রেষ্ঠ। ভারী সুন্দর চেহারা। লম্বা, চওড়া, ফর্সা। ঘন কালো কোঁকড়ান চুল।

তার চাইতেও বড় কথা সমরেশবাবু ব্যাচিলার ও ভাল চাকুরে।

সমরেশবাবুর সঙ্গে অভিনয় করতে মালতীবৌদির ভালই লাগত। সংযত, সংহত অভিনয় হলেও যথেষ্ট প্রাণবন্ত ও সাবলীল হতো তার অভিনয়; দুজনের মধ্যে বেশ সহজ সরল সম্পর্ক গড়ে উঠেছিল। কতদিন সমরেশবাবুর স্কুটারের পিছনে বসে মালতীবৌদি রিহার্সাল দিতে গিয়েছেন, ফিরেছেন।

রিহার্সাল সব সময় করোলবাগের ক্লাব ঘরেই হতো না। রিহার্সাল করানোরও ঝামেলা অনেক, খরচও বেশ। চা কফি বা পান বিড়ি সিগারেট কি কম লাগে? তাছাড়া প্রায় রোজই একটা করে ভেজিটেবল চপ বা দুটো করে সিঙ্গাড়াও দিতে হতো। তাইতো সুযোগ সুবিধা মতন ল্যাটাদা রিহার্সালের দায়িত্ব অন্যদের ঘাড়ে চাপিয়ে দিতেন। ক্যাণ্টনমেণ্টের এয়ারফোর্স অফিসার্স ক্লাব বা চাণক্যপুরীর অফিসারদের উদ্যোগে থিয়েটার হলে ল্যাটাদা রিহার্সালের ব্যবস্থা করতেন।

রাত ন'টা সাড়ে ন'টা দশটা পর্যন্ত রিহার্সাল চলত। মালতীবৌদি বাড়ি ফেরার জন্য ছটফট করতেন। তাই তো তাকে তাড়াতাড়ি বাড়ি পৌঁছে দেবার দায়িত্ব সমরেশবাবু প্রায় পাকাপাকিভাবে পেয়েছিলেন। হয়ত সমরেশবাবুর ভালই লাগত। স্কুটারের পিছনে বসে মালতীবৌদিকে হাতটা সমরেশবাবুর কাঁধের উপর রাখতেই হতো। রাস্তার ঝাঁকুনিতে বা হঠাৎ ব্রেক করার জন্য মালতীবৌদিকে একটু সামনে ঝুঁকে পড়তেই হতো। মালতীবৌদির

উন্নত, প্রশান্ত, কোমল হৃদয়-স্পর্শ ব্যাচিলার অভিনেতা সমরেশবাবুর নিশ্চয়ই ভাল লাগত। জানি না মালতীবৌদির ভাল লাগত কিনা। তবে সমরেশবাবুর স্কুটারে চড়তে কোনদিন আপত্তি করেননি।

মাঝে মাঝে অভিনয় শেষ করে অনেক রাত্রে ট্যাক্সি বা গাড়ী করে ফিরতেন। ছয়, সাত, আটজন পর্যন্ত চেপেছেন এক গাড়ীতে। মালতীবৌদি এক কোণায় বসতেন। হিরোইনের পাশে গা ঘেঁষাঘেঁষি করে বসতে সমরেশবাবু ছাড়া আর কেউ সাহস পেতেন না। অত ঠাসাঠাসি করে বসবার জন্য ইচ্ছা থাকলেও, চেষ্টা করেও ভদ্রতা বা শালীনতা রক্ষা করা নিতান্তই অসম্ভব হতো। সমরেশবাবুর হাতটা তো মালতীবৌদির কোলের ওপর থাকতো, কনুইটা তো বুকের ওপর চেপে থাকতো।

সেদিন সদানন্দদা পঙ্গু ছিলেন। মালতীবৌদির অতৃপ্ত মন হয়ত সমরেশবাবুর অভিনয় আর একটু ঘন নিবিড় স্পর্শতেই শান্তি খুঁজত, তৃপ্তি খুঁজত। যাই হোক অত খবরে কি দরকার ? মোটকথা সমরেশবাবুর সঙ্গে মালতীবৌদির বেশ একটা সহজ সরল মধুর সম্পর্ক ছিল।

আজকাল ?

আজকাল সেই সমরেশবাবুও দূরে থেকে মালতীবৌদিকে দেখেন। লাইট ব্লু কালারের সিল্কের শাড়ি-ব্লাউজ পরে হাতে কালো ব্যাগটা নিয়ে মালতীবৌদি আজকাল খান মার্কেটের মোড়ে এসে স্কুটার বা ফোর-সিটার ফটফটিয়ার জন্য অপেক্ষা করেন। সরু চেনের সঙ্গে ঝোলান ঐ বিরাট লকেটটা সমরেশবাবুর দৃষ্টিটাকে আটকে ধরে। হয়ত অতীত দিনের নায়িকাকে দেখে কোন ইচ্ছা, কোন স্বপ্ন উঁকি দেয় মনে। কিন্তু সাহস করে স্কুটার নিয়ে পাশে গিয়ে দাঁড়াতে পারেন না। বলতে পারেন না, অফিসে যাবেন ? চলুন নামিয়ে দিচ্ছি।

মালতীবৌদিকে দেখে সমরেশবাবুর ডান হাতটা কখন যেন ঘুরে যায়, স্কুটারের স্পীড কমে যায়, ব্রেকের ওপর পা চলে যায়, দৃষ্টিটা ঐ লকেটের কাছে গিয়ে থমকে যায়, কিন্তু তবুও পারেন না থামতে, মালতীবৌদির সঙ্গে কথা বলতে।

মালতীবৌদি কিন্তু সমরেশবাবুকে ঠিকই দেখতেন। সবকিছুই লক্ষ্য করতেন। হয়ত সমরেশবাবুর মনের ভাবও উপলব্ধি করতেন।

একদিন কফি হাউসে দু'জনের দেখা। সমরেশবাবু আগেই এসেছিলেন। মালতীবৌদি ঢুকে চারধারে চোখ বুলিয়ে নিতেই সমরেশবাবুকে দেখে তার টেবিলের কাছে গেলেন। সমরেশবাবু যেন একটু চমকে উঠলেন। কেমন যেন বিস্ময়ের ভাব ফুটে উঠল তার চোখে মুখে। মালতীবৌদি অত্যন্ত স্বাভাবিকভাবে চাপা গলায় জিজ্ঞাসা করলেন, বসতে পারি ?

'নিশ্চয়ই।'

মালতীবৌদি হাতের ব্যাগটা টেবিলের একপাশে রাখতে রাখতে বল্লেন, 'তারপর, কেমন আছেন ?'

'ভালই।'

'আপনাকে দেখলেই বোঝা যায় আপনি বেশ ভাল আছেন।'

'তাই নাকি ?'

এবার একটু হাসি হাসি মুখে মালতীবৌদি জানতে চায়, 'স্কুটার কেমন চলছে ?'

'ভালই।'

বেয়ারা এসে দাঁড়াল। সমরেশবাবু জিজ্ঞাসা করলেন, 'কি খাবেন বলুন।'

'আপনি বলুন কি খাবেন ?'

'না না, আপনি বলুন কি খাবেন ?'

মালতীবৌদি দু'টো মাটন কাটলেট আর দু'টো হট্ কফি'র অর্ডার দিলেন।

এতক্ষণে সমরেশবাবু যেন একটু সাহস সঞ্চয় করেছেন, 'আপনার নতুন চাকরি কেমন চলছে ?'

'চাকরিটা সত্যি ভাল।'

'সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই। তাছাড়া আপনার নিশ্চয়ই আরো উন্নতি হবে।'

'কি করে জানলেন ?'

'জানি না তবে আমার বিশ্বাস।'

'বিশ্বাসের তো একটা ভিত্তি থাকবে।'

'আছে বৈকি। আপনার সঙ্গে মেশবার যেটুকু সুযোগ হয়েছে তাতে আমি বেশ বুঝেছি যে, আপনার মধ্যে অনেক গুণ আছে।'

'তাই নাকি ?'

বেয়ারা এসে কাটলেট আর কফি দিয়ে গেল। খেতে খেতে আরো অনেক কথা হলো।

মালতীবৌদি বল্লেন, 'আজকাল খান মার্কেটের মোড়ে প্রায়ই আপনাকে যেতে দেখি, কিন্তু একদিনের জন্যও থামেন না কেন ?'

সমরেশবাবু একটু দ্বিধাগ্রস্ত হন। কী বলবেন, ভেবে পান না।

মালতীবৌদি তাই আবার প্রশ্ন করেন, 'কী, আপনার স্কুটার চড়তে চাইব এই ভয়ে ?'

সমরেশবাবু মনে মনে ভাবেন, সে সৌভাগ্য কি আমার হবে ? তুমি কি আর কোনদিন আমার স্কুটারে বসে কাঁধে হাত দিয়ে ব্রীজের ওপর দিয়ে…

হঠাৎ একটা দীর্ঘনিঃশ্বাস পড়ল সমরেশবাবুর।

মনে মনে বললেন, তুমি তো আজ আর আমাদের ক্লাবের একজন সাধারণ মামুলী এ্যাকট্রেস নও। আজ তুমি অতবড় বিখ্যাত ইণ্টারন্যাশনাল এয়ার-লাইন্সে প্রায় হাজার টাকা মাইনের চাকরি করছ। তাছাড়া তুমি কত পাল্টে গেছ। কী একটা অদ্ভুত গাম্ভীর্য তোমার চারপাশে ঘিরে রয়েছে। তোমার সঙ্গে কথা বলতেই তো ভয় না করলেও সঙ্কোচবোধ হয় যথেষ্ট। কিন্তু এসব কথা কি বলা যায় ? না বলা উচিত ?

সমরেশবাবু শুধু বল্লেন, 'অফিসে যাবার সময় আপনি ব্যস্ত থাকেন, তাই

আপনাকে বিরক্ত করি না।'

'বাঃ! এতে বিরক্তির কি আছে? আসল কথা বলুন না লিফট চাইব, এই ভয়ে থামেন না।' মালতীবৌদি মুচকি হাসতে হাসতে কফির পেয়ালা নামিয়ে রাখলেন।

সমরেশবাবু একটু সাহস পান। 'একটু স্কুটারে চড়বেন, এতে আর ভয়ের কি আছে?'

কফি হাউস থেকে বেরিয়েই সমরেশবাবু এগিয়ে চলেছিলেন।

মালতীবৌদি বললেন, 'কি আশ্চর্য! একটা পান খাওয়াবেন না?'

মালতীবৌদির সহজ সরল ব্যবহারে সমরেশবাবু সত্যি লজ্জা পান। তাড়াতাড়ি পান খাওয়ান।

তারপর?

তারপর মালতীবৌদি সত্যি সমরেশবাবুর স্কুটারের পিছনে বসে বাড়ি ফিরেছিলেন।

এই হচ্ছে মালতীবৌদি। এমন একটা বিচিত্র ব্যক্তিত্ব ছিল যে খুব কাছের মানুষও একটু সমীহ না করে পারত না। এমন কি সদানন্দদাও। বাইরে একটা ব্যক্তিত্বের বেড়াজাল থাকলেও, ভিতরের মন? সে তো নারী, স্ত্রী, প্রেমিকা ছিল। সেখানে তো কোন ভেজাল ছিল না। সে চাইত স্বামীকে, স্বামীর আদর ভালবাসা, সোহাগ।

সদানন্দদা থমকে দাঁড়িয়েছিলেন। যাকে আগে অত্যন্ত সাধারণ মনে হয়েছিল, নিজের দুর্ঘটনার পর তাকে অনন্যা মনে হয়েছে। বাংলা দেশের মধ্যবিত্ত ঘরের একটা মেয়ে হলেও দিল্লীতে মালতীবৌদি যে ভাবে নিজেকে প্রতিষ্ঠা করেছে, তাতে সদানন্দদা স্তম্ভিত না হয়ে পারে নি।

দেখতে দেখতে মালতীবৌদির মাইনে প্রায় হাজারের কাছাকাছি হলো। চাকরিতে প্রমোশন হলো। এখন আর কাউণ্টারে বসে দিল্লী, করাচী, বেইরুট, ইস্তাম্বুল, আথেন্স, বেলগ্রেড, জেনেভা, প্যারিস, লণ্ডনের মাইলেজ হিসাব করে টিকিট ইস্যু করতে হয় না! যারা ও কাজ করে, তাদের তদারকী করে সে।

মালতীবৌদির পোশাক-পরিচ্ছদে, দেহে ও রূপ পরিচর্যায় পরিবর্তন এলো বৈকি। কত সুন্দর লাগত দেখতে। সদানন্দদা মালতীবৌদিকে দেখে অসম্ভব তৃপ্তি পেত কিন্তু সাহস করে নিজের দাবী নিয়ে এগিয়ে যেতে সঙ্কোচ বোধ করত।

সেদিন মালতীবৌদির ছুটি। সদানন্দদার প্রেসে কিছু জরুরি কাজ ছিল, বেরিয়ে গেলেন। সিঁড়ির নিচে এসে মালতীবৌদি বল্লেন, 'যেভাবে হোক লাঞ্চের আগেই ফিরে এসো। তারপর কিন্তু আর বেরুতে পারবে না।'

'আচ্ছা।'

মালতীবৌদি স্নান করে একটা লাল ব্লাউজ, লাল পেড়ে শাড়ি আর বিরাট সিঁদুরের টিপ পরে রান্নাঘরে ঢুকলেন। চাকরটাকে কিছু ছুঁতে দিলেন না। বারোটা সওয়া-বারোটার মধ্যে রান্না শেষ করে চাকরটাকে খাইয়ে দিলেন।

'যা তুই আজকে একটু সিনেমা-টিনেমা দেখে আয়।' হাতে দুটো টাকা দিয়ে চাকরটাকে বিদায় করে দিলেন মালতীবৌদি।

সদানন্দদা সাড়ে বারোটা বাজতে-না-বাজতেই ফিরে এলেন। মালতীবৌদিকে দেখে থমকে দাঁড়ালেন কিছুক্ষণ।

'আমি কি পরস্ত্রী যে অমন হাঁ করে গিলে গিলে দেখছ?'

'আজ তোমাকে এত সুন্দর দেখাচ্ছে যে পরস্ত্রী হলেও তোমার আজ মুক্তি পাওয়া অসম্ভব।' সদানন্দদা দু'হাত দিয়ে মালতীবৌদিকে কাছে টেনে নেয়। আনন্দে তৃপ্তিতে মালতীবৌদির মুখ পূর্ণিমার চাঁদের মত উজ্জ্বল ভাস্বর হয়ে ওঠে।

কিন্তু মুখে বললো, আঃ! কী করছ!

সদানন্দদার হুঁশ এলো বাড়িতে একটা চাকর আছে। 'ঐ হতচ্ছাড়াটাকে এক প্যাকেট সিগারেট আনতে বাইরে পাঠিয়ে দাও তো?'

'হতচ্ছাড়াটাকে আমি ছুটি দিয়েছি।' মুচকি হাসি লুকোতে লুকোতে মালতীবৌদি জবাব দেয়।

'থ্যাংক ইউ ভেরী মাচ' বলেই সদানন্দদা মালতীবৌদিকে কোলে তুলে নিয়ে সোজা বেডরুমে চলে গেল।

মুখে মালতীবৌদি অনেক কিছুই বলেছিলেন, 'ছি ছি, এই দুপুরবেলায়। নতুন বিয়ের পরও কেউ এমন পাগলামি করে না।'

মনে মনে কিন্তু মালতীবৌদি অসম্ভব সুখী হয়েছিলেন। কোন্ মেয়ে আছে যে চাইবে না স্বামী তাকে নিয়ে পাগলামি করুক? আর যে-ই হোক, অন্তত মালতীবৌদি নয়। সদানন্দদা তাকে নিয়ে পাগলামি করে না, এই ত মালতীবৌদির দুঃখ।

সেদিন দুপুরে যা হয়েছিল তা নিতান্তই ব্যতিক্রম। দ্বিধাগ্রস্ত সদানন্দদা পারে না, কিছুতেই পারে না সহজ, সরল, স্বাভাবিক হয়ে স্বামীর অধিকার আর ভালবাসার দাবী নিয়ে মালতীবৌদির কাছে যেতে। ধীরে ধীরে সদানন্দদা ভেসে যেতে লাগল দূরে, আরো দূরে। নিজের কাজের মধ্যে ডুবে গেল। দিন রাত্তির ঐ ছোট্ট ছাপাখানা নিয়ে পড়ে রইল। রাত্রে, অনেক রাত্রে বাড়িতে ফিরে শুধু ক্লান্ত দেহটা লুটিয়ে দিত মালতীবৌদির পাশে। কিন্তু মন? সে যেন কোন্ সুদূর দিগন্তে হাহাকার করে ঘুরে বেড়াত।

পথের শেষে

কৈশোরে, যৌবনে সবাই স্বপ্ন দেখে। আমিও দেখেছি। পক্ষীরাজ ঘোড়ায় চড়ে রাজকন্যাকে নিয়ে অচিন দেশে যাবার স্বপ্ন না দেখলেও মনে মনে অনেক আশা ছিল। স্কুল-কলেজ শেষ করে ইউনিভার্সিটিতে ঢোকার পর কফি হাউসের আড্ডাখানায় সুমিত্রার সঙ্গে একটু ঘনিষ্ঠতা হবার পর মাঝে-মাথে পাশাপাশি বসে মেট্রো-লাইট হাউসে সিনেমা দেখেছি কিন্তু তার বেশী কিছু নয়। তারপর একদিন বিদ্যাসাগরের প্রাণহীন পাথরের মূর্তিকে সাক্ষী রেখে কলেজ স্কোয়ারের জলে কৈশোর-যৌবনের সমস্ত স্বপ্ন বিসর্জন দিয়ে আমি রেলের অফিসে কেরানী হলাম।

আর কিছু না হোক নিদেনপক্ষে কোন মফঃস্বল কলেজে বাংলার লেকচারার হবার স্বপ্ন নিশ্চয়ই দেখেছিলাম। তাই রেলের অফিসের কেরানী হবার পর কিছুকাল কিছুতেই মানিয়ে নিতে পারছিলাম না। মোটা মোটা নোংরা ফাইলগুলো হাতে নিয়ে বড়বাবুর টেবিলের সামনে দাঁড়াবার সময় নিজেকেই নিজে ঘেন্না করতাম। জানতাম কেরানীকে সবাই ঘেন্না করে, কিন্তু নিজে কেরানী হবার পর জানলাম কেরানীরাও কেরানীদের ঘেন্না করে।

কোট প্যান্টুলুন পরা সাহেবসুবোরা নিজের খুপরীর মধ্যে লুকিয়ে লুকিয়ে মুড়ি-শশা খেলেও সেটা হয় লাঞ্চ আর কেরানীরা ক্যান্টিনে মোগলাই পরটা-চিকেন-কারী খেলেও তার নাম টিফিন। একদিন এ হেন টিফিনের ছুটিতে ঘর থেকে বেরুতে গিয়েই ছোট সাহেবের বেয়ারা এসে খবর দিল, ঘোষ সাহেব আপনাকে ডাকছেন।

আমাকে? আমি অবাক হয়ে প্রশ্ন করি।

হ্যাঁ, আপনাকে।

না না, আমাকে কেন ডাকবেন? বোধহয়…

আমাকে কথাটা শেষ করতে না দিয়েই ও বললো, ঘোষ সাহেব আর বড়বাবু দুজনেই আপনাকে ডাকছেন।

মুহূর্তের জন্য মনে হলো, হয়ত কোন গণ্ডগোল করে ফেলেছি বলেই ওরা ডাকছেন কিন্তু ঘোষ সাহেবের ঘরে গিয়ে জানলাম, না, কোন গণ্ডগোলের জন্য নয়, চ্যাটার্জী সাহেব বদলী হচ্ছেন বলে তাঁর বিদায় সম্বর্ধনার মানপত্র লিখতে হবে।

এম-এ পড়েছিলাম অধ্যাপক হবার আশায়। ভেবেছিলাম ক্লাসের ছেলেমেয়েদের হেম-নবীন-বঙ্কিম-রবীন্দ্রনাথ-মাইকেল-শরৎচন্দ্র পড়াবার, কিন্তু

সেসব কিছুই হলো না। শেষ পর্যন্ত চ্যাটার্জী সাহেবের মানপত্র।

নিজের গালে নিজেরই থাপ্পড় মারতে ইচ্ছে করল কিন্তু অনেক ব্যর্থতার মত এ কাজও আমার দ্বারা হলো না। বরং একটু আত্মপ্রসাদের হাসি হেসে বললাম, নিশ্চয়ই লিখে দেব।

রেলের অধিকাংশ ছোট-খাট অফিসারদের মত চ্যাটার্জী সাহেবও বিশেষ সুবিধের নয়। চেহারা দেখলেই মনে হয়, অম্ল-অজীর্ণের রুগী। পরণে প্যাণ্ট-হাফ সার্ট। গলায় মেট্রোর সামনে থেকে কেনা দু-আড়াই টাকার টাই। কথাবার্তা আলাপ-ব্যবহারে বেশ বোঝা যায়, দু-একবার হোঁচট খেয়েই বঙ্গবাসী কলেজ ত্যাগ করেছেন। হেড কনস্টেবলদের মত ধারাল জিহ্বা। কথা বললেই মনে হয়, তেড়ে আসছেন। তাহোক। মানপত্রে সব ভাল ভাল কথা লিখতে হবে। আমাদের দেশে মানপত্রে ও শোকসভায় শুধু ভাল ভাল কথা বলতে হয়। মহা কৃপণকেও উদার মহৎ বলতেই হবে, ঘুষখোর 'লম্পট' বদমাইসকেও সবিশেষ বিশেষণে ভূষিত করতে হয়।

তাই করলাম। হে দরদী বন্ধু, প্রাণপ্রিয় অগ্রজ, হে নিরলস কর্মী, হে সত্যসাধক ইত্যাদি ইত্যাদি দিয়ে শুরু করে পাঁচ-সাত প্যারার দীর্ঘ মানপত্র লিখলাম। শেষে ? শেষে লিখলাম, প্রাণের মন্দিরের চিরজাগ্রত বিগ্রহকে আসন্ন বিদায়বেলায় আমাদের অন্তরের সশ্রদ্ধ সপ্রণত ভালবাসা ও শুভ কামনা জানাই।

ব্যস। এই এক মানপত্র লিখেই আমার খ্যাতি-যশ তুঙ্গে উঠল। বড়বাবু মাঝে মাঝেই ঘোষ সাহেবের কাছে পাঠান। আমি ফাইল নিয়ে ওঁর ঘরে হাজির হলেই উনি হাসি মুখে জিজ্ঞাসা করেন, কি খবর চৌধুরী ?

স্যার, বড়বাবু বললেন, এই মেসেজটা এখুনি দানাপুরে পাঠাতে হবে।

উদাসীনভাবে ফাইলটা হাতে নিয়ে ঘোষ সাহেব বললেন, এই মেসেজ দুদিন পরে গেলেও রেলের চাকা ঠিকই ঘুরবে। আপনার খবর বলুন।

আমার আর কি খবর স্যার।

কোন কলেজ-টলেজে চেষ্টা করছেন নাকি সারা জীবনই রেল কোম্পানীর কেরানী হয়ে জীবন কাটাবেন ?

না স্যার, আমার আর কলেজে চাকরি হবে না।

কেন ? আপনি কি আমাদের মত সাধারণ গ্রাজুয়েট।

ঘোষ সাহেবের ঘর থেকে ফিরতে দেরি হলেই বড়বাবু পান-জর্দা খাওয়া কালো কালো দাঁত বার করে জিজ্ঞাসা করেন, চা খাচ্ছিলে বুঝি ?

না, চা খাইনি।

ঘোষ সাহেব প্রায়ই তোমার কথা বলেন।

কেন ?

হাজার হোক তুমি এম-এ পাস।

তাতে কি হলো ? আরো কত ছেলে মেয়ে এম-এ পাস করে কেরানীগিরি করছে, তার ঠিকঠিকানা আছে ?

তা করছে ঠিকই কিন্তু তুমি আর ভারতী ছাড়া আর কোন এম-এ পাশ ছেলেমেয়ে আমাদের সেকসনে কাজ করেনি। আমি কিছু বলার আগেই বড়বাবু হাঁ করে মুখের মধ্যে মুস্কিপাতি জর্দা ফেলে দিয়ে বললেন, তাও ভারতী ছ-মাসের মধ্যে প্রফেসার হয়ে চলে গেল।

হঠাৎ বলে ফেললাম, প্রফেসার না, লেকচারার।

ঐ একই ব্যাপার। হাজার হোক কলেজে পড়াচ্ছে।

তা ত বটেই।

তুমি ত ভারতীকে দেখেছ ?

হ্যাঁ, আমি আসার মাসখানেক পর উনি যান।

বড়বাবু শ্যামবাজার এ. ভি স্কুল থেকে থার্ড ডিভিশনে ম্যাট্রিক পাশ করলেও বহু মাদ্রাজী পাঞ্জাবী অফিসারের সংস্পর্শে এসে মাঝে মাঝেই ইংরেজি বলা অভ্যাস হয়েছে তাই উনি বললেন, সী ইজ এ লাভলি গার্ল।

ভারতীকে আমি দেখেছি। কাজকর্মের ব্যাপারে ওর সঙ্গে আমার কোন যোগাযোগ না থাকলেও দু-একদিন টিফিনের সময় ওর সঙ্গে সামান্য কথাবার্তা বলেছি। সত্যি ভাল মেয়ে কিন্তু আমার পক্ষে ওকে কোন সার্টিফিকেট দেওয়া সম্ভব বা উচিত নয় বলে শুধু মাথা নেড়ে সম্মতি জানালাম।

যাইহোক দিনগুলো মোটামুটি বেশ কাটছে। রোজই কেউ না কেউ আমাকে মনে করিয়ে দেন আমি বাংলায় এম-এ।

প্রিয়বাবু আমার টেবিলের উপর দু কনুই রেখে আমার মুখের সামনে মুখ নিয়ে বললেন, ভাই, একটা কাজ করে দিতে হবে।

বলুন কি কাজ।

আমার বড় মেয়ের বিয়ে। তোমাকে খুব সুন্দর করে একটা নেমন্তন্নের চিঠি লিখে দিতে হবে।

আমি হেসে বলি, বিয়ের নেমন্তন্ন চিঠি ত চিরাচরিত সনাতন ধারায় লেখা হয়।

না না, ও ধরনের চিঠি নয়। বেশ ভাষা-টাষা দিয়ে মডার্ন নেমন্তন্ন চিঠি ছাপাব বলেই ত তোমাকে বলছি। প্রিয়বাবু একটু মুচকি হেসে বললেন, হাজার হোক তুমি বাংলায় এম-এ।

দিন পনের পরের কথা। প্রিয়বাবু অফিসের সবাইকে নেমন্তন্নর চিঠি দিতেই মিত্তিরদা চিৎকার করে বড়বাবুকে বললেন, বড়দা, এ ত দেখছি চৌধুরীর মেয়ের বিয়ে। প্রেস ভুল করে প্রিয়র নাম ছেপেছে।

বড়বাবু দন্ত বিকশিত করে বীভৎস হাসি হাসতে হাসতে বললেন, ভাষা দেখে তাই মনে হচ্ছে।

প্রিয়বাবু হাসতে হাসতে বললেন, হাজার হোক চৌধুরী আমার মেয়ের কাকা।…

মিত্তিরদা সঙ্গে সঙ্গে ক্ষেপে ওঠেন, শালা, ভাইঝিকে রোজ স্কুলে পৌঁছে দেবার নাম করে মাস্টারনীর সঙ্গে প্রেম করে বিয়ে করলি।…

ওকে কথাটা শেষ করতে না দিয়ে প্রিয়বাবু বড়বাবুকে বলেন, দেখেছ বড়দা, আমার বউ সুন্দরী বলে মিত্তিরের কি হিংসে। এবার মিত্তিরদার মুখের দিকে ফিরে বলেন, নগদ টাকার লোভে ক্লেমস ইনস্‌পেকটরের কালো-কুচছিত মেয়েকে বিয়ে করার বিশ বছর পর কান্নাকাটি করে ত লাভ নেই।

বড়বাবু, প্রিয়বাবু আর মিত্তিরদা কুড়ি-বাইশ বছর এক সঙ্গে এই সেকসনে কাজ করছেন। তিনজনের মধ্যেই গভীর বন্ধুত্ব। আমরা ওদের কথা শুনে হাসি।

মিত্তিরদা ওর কথা হেসেই উড়িয়ে দিলেন। বললেন, আমার বউয়ের ফিগার দেখে তোর মাথা ঘুরে যায় বলেই ত আমি বাড়ি না থাকলেই ছুঁচোর মত আমার বউয়ের চারপাশে ঘোরাঘুরি করিস।

টাকা ধার নিয়ে শোধ না করলেই বাড়িতে গিয়ে তাগাদা করতে হবে।

এবার মিত্তিরদা আমার দিকে তাকিয়ে জিজ্ঞাসা করলেন, কোন টাকার তাগাদা দিতে যায় জানো?

আমি মাথা নেড়ে বললাম, না।

আমার বউয়ের পাশে বসে সিনেমা দেখবে বলে আঠার বছর আগে পাঁচ সিকের তিনটে টিকিট কেটেছিল। ঐ তিন টাকা বারো আনা আদার করার জন্য···

আমরা সবাই হো হো করে হাসি।

বড়বাবুও কম রসিক না। তিনি গম্ভীর হয়ে জিজ্ঞাসা করলেন, হ্যাঁরে প্রিয়, এখনও সে টাকা পাস নি।

না।

আগের মতই গম্ভীর হয়ে বড়বাবু বললেন, মিত্তির, প্রিয়র মেয়ের বিয়ে! এখন ওর টাকার খুবই দরকার। এবার ওর টাকাটা ফেরৎ দে।

মিত্তিরদা একটা চাপা দীর্ঘশ্বাস ফেলে বললেন, বড়দা, তুমিও যখন বলছ তখন টাকাটা দিয়েই দেব।

মিত্তিরদা আত্মসমর্পণ করলেও প্রিয়বাবু চুপ করে থাকেন না। বলেন, যে লোক রোজ বউয়ের কাছ থেকে আট আনা পকেট খরচ পায়, সে আবার আমার ধার শোধ করবে।

দেখিস, এবার মাইনে পেয়েই তোর ধার শোধ করব।

বিয়ে-পৈতে-অন্নপ্রাশনের নেমন্তন্নের চিঠি ও মানপত্র লেখা ছাড়াও এই ধরনের হাসি-ঠাট্টা-রসিকতায় দিনগুলো বেশ কেটে যাচ্ছে। দেখতে দেখতে দুটো বছর পার হয়ে গেল।

তারপর হঠাৎ একদিন জানতে পারলাম, আমার অনেক ছুটি পাওনা। পরের মাসে মাইনে নেবার পরদিনই আমি কালকা মেলে চড়লাম।

অনার্স নিয়ে বি-এ পাশ করার পর বড় মামা আমাকে একটা সার্কুলার টিকিট কিনে দিয়েছিলেন। দিদি-জামাইবাবু, ছোট মামা আর বাবার কাছ থেকে নগদ প্রাপ্তিযোগ হয়েছিল শ'পাঁচেক টাকা। তারপর একদিন বেরিয়ে

পড়েছিলাম দেশ ভ্রমণে। গোটা ভারতবর্ষকে একটা চক্কর দিয়ে ফিরেছিলাম মাস দুই পরে।

সে দু মাসের স্মৃতি কোনদিন ভুলব না। সত্যি সত্যিই আমাদের দেশটা যে এত বিচিত্র, তা আগে জানতাম না। এ দেশে মানুষ অনাহারে দিন কাটায়, তা জানতাম, রাজা-মহারাজা-কোটিপতিও এদেশে আছে কিন্তু আগে ভাবতাম কলকাতার ফুটপাতের বস্তিবাড়ির মানুষ গরীব আর সন্ধ্যায় পার্ক ষ্ট্রীট যারা মনোরম করে তোলেন, তাঁরাই পরম সৌভাগ্যবান। সারা দেশ ঘুরে দেখলাম, আমার ধারণা ভুল। দারিদ্র্য যে কত নির্মম হতে পারে, তা বিহার-উত্তরপ্রদেশ-মধ্যপ্রদেশ-রাজস্থান ও অন্ধ্র-উড়িষ্যা না দেখলে বিশ্বাস করা কঠিন। দেশে যে এত বড়লোক আছে, তা বোম্বে-ব্যাঙ্গালোর দেখার আগে কল্পনাও করিনি।

ছোটবেলা থেকেই জেনেছি শিখেরা দাড়ি রাখেন কিন্তু পাঞ্জাব ঘুরে জেনেছি, পাতিয়ালার শিখেরা দাড়ি বাঁধেন ঊর্ধ্বমুখী ও অন্য সব শিখেদের দাড়ি নিম্নমুখী করে বাঁধা হয়। আগে রাজস্থানের সব পুরুষই একই ধরনের পাগড়ী বাঁধেন বলে জানতাম কিন্তু রাজস্থানের মানুষদের সঙ্গে মেলামেশা করে জেনেছি, না তা নয়। মেওয়াড়ী ও মাড়বাড়ী পাগড়ী আলাদা। আর গুজ্জড়রা দড়ির মত পাকান কাপড়ের পাগড়ী মাথায় বাঁধে। পাঞ্জাব আর রাজস্থান ছাড়া সব জায়গার মেয়েরাই শাড়ি পরে কিন্তু প্রত্যেক অঞ্চলের মেয়েদের শাড়ি পরার নিয়ম আলাদা। ক্যাথলিক মেয়েদের কানের মাকড়ি পরা দেখেই জানা যায়, কে কেরলের আর কে বোম্বে-পুণার।

মজার শেষ নেই এ দেশে। বৃষ্টির জন্য চেরাপুঞ্জি যেমন বিখ্যাত, তেমনি লাডাকে এক ফোঁটা বৃষ্টি হয় না। প্রতি বছর শীতের সময় উত্তরভারতে বেশ কিছু হতভাগ্য মানুষ মারা গেলেও সে সময় মাদ্রাজে দিন-রাত্তিরের তাপমাত্রার কোন পার্থক্য হয় না।

বাঙ্গালী হিন্দু মেয়েরা বিয়ের পর শাঁখা সিঁদুর পরেন। উত্তরপ্রদেশের মেয়েরা বিয়ের পর পায়ের মাঝের আঙ্গুলে রুপোর আংটি আর দাক্ষিণাত্যের মেয়েরা গলায় মঙ্গলসূত্রম্ পরেন কিন্তু অঞ্চল ভেদে এই মঙ্গলসূত্রম ছোট-বড় হয়।

নদীমাতৃক বাংলাদেশে ঝড়ের সময় নদীতে খুব জোরে ঢেউ উঠলে বলি তুফান আর মরুভূমি রাজস্থানে বালির ঝড়কে বলা হয় তুফান। আমরা বাঙ্গালীরা রাজনৈতিক চেতনাসম্পন্ন ও প্রগতিবাদী হয়েও চাষীদের চাষা বলি, ঘেন্না করি, পাঞ্জাবে চাষীর ঘরে মেয়ের বিয়ে দিলে সমাজে মর্যাদা বেড়ে যায়। কলকাতায় বুড়ো ধাড়ী পুরুষদেরও লুকিয়ে-চুরিয়ে বার-এ গিয়ে মদ খেতে হয় আর কেরালায় ছেলেছোকরাদের কৃপায় একটু বেলায় গিয়ে 'টডি' পাওয়া যায় না।

ভারতবর্ষের মানুষ বেঁটে হয়, লম্বা হয়, কালো হয়, ফর্সা হয়। কারুর নাক ভোঁতা, কারুর নাক লম্বা, তবে সবার চোখ ও চুল কালো।

এত বৈচিত্র্য থাকা সত্ত্বেও এটা যে একই দেশ, তা বুঝতে কষ্ট হয় না।

সেবার সারা দেশ ঘুরে আসার পর আমি যেন একটু নেশাগ্রস্ত হয়ে পড়েছিলাম। ভেবেছিলাম সুযোগ এলে আবার ঘুরতে বেরুব। বার বার বেরুব।

এম-এ পাশ করে রেলের কেরানী হবার পর মন খারাপ হয়েছিল ঠিকই কিন্তু মনে মনে শুধু এইটুকুই সান্ত্বনা পেয়েছিলাম যে প্রাণ ভরে সারা দেশ ঘুরব।

সেবার কিছুটা অনভিজ্ঞতার জন্য আর কিছুটা বন্ধুদের কাছে বাহাদুরী পাবার লোভে ঝড়ের বেগে সারা দেশ ঘুরেছিলাম। পরে বুঝেছিলাম, দেশকে জানতে হলে, চিনতে হলে অত হুড়োহুড়ি করে ঘুরে বেড়ান ঠিক নয়। তাই এবার ঠিক করেছিলমে আসা-যাওয়ার পথে দিন চারেক দিল্লীতে কাটান ছাড়া বাকি দিনগুলো রাজস্থানে ঘুরব।

অসৎ ও লোভী ব্যবসায়ী হিসেবে মাড়োয়াড়ীরা বাংলাদেশে সর্বজন নিন্দিত। ওরা নাকি সবাই লোটা-কম্বল সম্বল করে দেশ থেকে এসেছিলেন। তারপর অসৎ উপায়ে লক্ষ কোটি টাকা আয় করে ধনী হয়েছেন। শতাধিক বছর ধরে মাড়োয়াড়ীরা বাংলাদেশে বাস করছেন কিন্তু আজ পর্যন্ত শিক্ষা-দীক্ষা আদর্শে-তিতিক্ষায় একজন মাড়োয়াড়ীও বাঙ্গালী চিত্ত জয় করতে পারেন নি। তাহোক। রাজস্থান বাঙ্গালীর বড় প্রিয়। চিতোরগড়ের নাম শুনেই বাঙ্গালী মনে মনে স্বপ্ন দেখে। লক্ষ লক্ষ মাড়োয়াড়ীর শতবর্ষের অপকীর্তি রাণা প্রতাপ, মীরাবাঈ, ধাত্রী-পান্না. পদ্মিনীর স্মৃতি ম্লান করতে পারে নি বাঙ্গালীর মনে। শুধু কি এরা? সামান্য একটা ঘোড়া চৈতক ইতিহাসের পাতায় অমর হয়ে আছে।

প্রথমে ভেবেছিলাম দিল্লী থেকে জয়পুর যাব। তারপর আজমীর, চিতোর, উদয়পুর। দিল্লীতে এসে টুরিস্ট অফিস থেকে রাজস্থানের নানা শহরের লিফলেট নিয়ে পড়তে পড়তে ঠিক করলাম, না, আগে জয়পুর যাব না। হাজার হোক অম্বর রাজাদের বেইমানী ইতিহাসের পাতায় পাতায় লেখা আছে। এরা কোনদিনই শৌর্যবীর্যের পরিচয় দিতে পারেন নি, মোগল সম্রাটদের পদলেহন করেই এরা নিজের রাজত্ব বাঁচিয়েছেন। শুধু তাই নয়, মোগল সম্রাটকে খুশী করার জন্য রাজকন্যার সঙ্গে তার বিয়ে দিয়েছেন। ছি, ছি! ভাবলেও ঘেন্নায় মুখ তেতো হয়ে যায়। সবার শেষে জয়পুর।

আমেদাবাদ মেল-এ রিজার্ভেশন পেলাম না। পরের দিন সকালে এক্সপ্রেসে রওনা হলাম। রাত নটা নাগাদ আজমীর পৌঁছলাম। কিন্তু পৌঁছলাম ঘণ্টা দেড়েক পরে। ভেবেছিলাম রেলের রিটায়ারিং রুমে থাকব কিন্তু ট্রেনের এক ভদ্রলোকের পরামর্শ মত সপ্তম এডওয়ার্ড মেমোরিয়্যাল বিল্ডিং-এ চলে গেলাম। স্টেশনের বেশ কাছেই। বিরাট বাড়ি। রেল গাড়ির মত এখানেও ঘরের শ্রেণীবিন্যাস আছে! দৈনিক তিন টাকা ভাড়ায় সেকেণ্ড ক্লাশ ঘরে একটা সীট পেলাম।

ভেবেছিলাম সকালে উঠেই উদয়পুর রওনা হবো। তারপর ফেরার পথে

চিতোর হয়ে আজমীর আসব কিন্তু পরের দিন সকালে ঘুম ভাঙল বেশ বেলায়। তাছাড়া প্যাসেঞ্জার ট্রেনে আবার দশবারো ঘণ্টা কাটাতে ইচ্ছা করল না। ঠিক করলাম, দু-একদিন আজমীরেই থাকব।

একটু বেলা হয়েছিল ঠিকই তবু পুষ্করের বাসে জায়গা পেতেই চড়লাম।

আনা সাগর ছাড়িয়ে কিছুদূর যাবার পর পাহাড় শুরু হলো। দুটো-একটা পাহাড় ছাড়াবার পরই ড্রাইভার বললো, এই হচ্ছে নাগ পাহাড়।

নাগ পাহাড়। নাম শুনেই চমকে উঠলাম। এখানেই ত অগস্ত্য মুনির আশ্রম ছিল! এই আশ্রমের পটভূমিকাতেই ত মহাকবি কালিদাসের শকুন্তলা লেখা হয়েছিল। বাসের কোন যাত্রীকেই বিশেষ আগ্রহের সঙ্গে নাগ পাহাড় দেখতে দেখলাম না। তাদের কি দোষ? শিক্ষিত লোকেরা সমস্ত ইংরেজ সেকসপিয়রের নাম জানলেও মহাকবি কালিদাসের নাম আমাদের অনেকেই জানেন না।

পুষ্কর হিন্দুদের অন্যতম প্রাচীন তীর্থক্ষেত্র। পৌরাণিক কাহিনী বলে স্বয়ং ব্রহ্মার হাত থেকে হঠাৎ একটা পদ্ম পড়েই পুষ্কর হ্রদের সৃষ্টি হয়। শোনা যায় রামচন্দ্র পুষ্কর এসেছিলেন।

ষোলশ বছর আগে চীনা পরিব্রাজক ফা হিয়ান পুষ্করকে অন্যতম প্রাচীন তীর্থক্ষেত্র বলেছেন। এককালে এই মন্দিরের চারপাশে বহু মন্দির ছিল কিন্তু ঔরঙ্গজেব সব ভেঙে চুরমার করে দেন।

বাড়িঘর দোকান-এর মাঝে মাঝে শ্মশানের ঘাটগুলো বেশ লাগলো। তবে ব্রহ্মার মন্দির দেখে বিশেষ খুশী বা শান্তিলাভ করতে পারি না। কিছু কোটিপতি শিল্পপতিও অনেক মন্দির তৈরী করেছেন কিন্তু আর কোন মন্দিরেই গেলাম না। কিছুক্ষণ বাজারে ঘোরাঘুরি করে আবার বাসে চড়লাম। আজমীর ফিরলাম দুটোর পর। খেয়েদেয়েই সপ্তম এডওয়ার্ডের স্মৃতি ভবনে ফিরলাম। ভেবেছিলাম ঘণ্টাখানেক বিশ্রাম করেই শহর দেখতে বেরুব কিন্তু কখন যে ঘুমিয়ে পড়েছি, তা নিজেও টের পাইনি।

হঠাৎ একটু কলগুঞ্জন শুনে কাঁচা ঘুমটা ভেঙে গেল। তারপর ঘুমের ভাবটা পুরোপুরি কাটতেই বুঝলাম কয়েকজন বাঙ্গালী মেয়ে-পুরুষের কথা শুনছি। উঠে বসতেই দেখি, আমার সেকেণ্ড ক্লাস ঘরের দরজার সামনে পাঁচ ছ জন মেয়ে ও একজন বয়স্ক ভদ্রলোক।

আমাকে উঠে বসতে দেখেই ভদ্রলোক জিজ্ঞাসা করলেন, আপনি কী এক্ষুনি চলে যাবেন?

কেন বলুন ত?

এই অসময়ে ঘুমুচ্ছেন দেখে ভাবলাম বোধহয় রাত্তিরের ট্রেনেই চলে যাবেন।······

আর কিছু?

ভদ্রলোক একটু মুচকি হসে বললেন, আমরা মোটে পাঁচটা ঘর পেয়েছি। কিন্তু আরো একখানা ঘর না হলে আমাদের কিছুতেই চলবে না।

এবার আমিও একটু হাসি। বলি দু-একদিন থাকব বলে আমি আজই এসেছি। তবে আপনি যদি বলেন আজই চলে যাব।

দরজার পাশ থেকে দু-তিনটে মেয়ে একসঙ্গে বললেন, না না, আপনি কেন যাবেন।

বললাম, আমি মধ্যবিত্ত ভদ্র ঘরের ছেলে। ইচ্ছা করলে আপনারা দু-তিনজন এ ঘরে থাকতে পারেন। মনে হয় না আমার দ্বারা আপনাদের কোন ক্ষতি হবে।

এবার ভদ্রলোক ছত্রিশ পাটি দাঁত বের করে বললেন, একি কথা বলছেন আপনি? আপনি বাঙ্গালী বলেই ফ্রাংকলি কথা বললাম।

আপনারা দু-তিনজন পুরুষ আমার এই ঘরে এলেও কি সমস্যার সমাধান হবে না?

আমি একাই বাইশটি মেয়েকে নিয়ে ঘুরতে বেরিয়েছি।...

ওর কথা শুনেই আমি হাসি। কোন মতে হাসি চেপে বললাম, তাহলে আপনিই আমার ঘরে থাকুন।

আমি এখানে থাকছি না। আমি রেলওয়ে কলোনীতে আমার মামাতো ভাইয়ের কাছে থাকব।

ইতিমধ্যে একটি মেয়ে আমার হাতে এক কাপ চা দুটি গ্লাকসো বিস্কুট দিয়ে বললেন, নিন দাদা, চা খান।

অশেষ ধন্যবাদ।

অন্য একটি মেয়ে ঐ ভদ্রলোককে চা-বিস্কুট দিয়ে বললেন, নিন বড়দা।

চায়ের কাপে এক চুমুক দিয়ে ওকে জিজ্ঞাসা করলাম, সব বোনেদের নিয়ে বেড়াতে বেরিয়েছেন বুঝি?

উনি একটা বিস্কুট মুখের মধ্যে পুরে দিয়ে একটু চিবিয়ে নেবার পর বললেন, এরা আমার বোন বটে, আর কলিগসও।

এক অফিসে কাজ করেন?

আমরা সবাই ক্যালকাটা টেলিফোনস্-এ কাজ করি। তবে আমি না হলে নাকি এদের দেশ দেখা হয় না।

হাজার হোক এটা ভারতবর্ষ। একটা দাদা না হলে কি মেয়েরা বেরুতে পারে?

ইতিমধ্যে দু-তিনজন বর্ষীয়সী বিবাহিতা ও অবিবাহিতা মহিলা আমার ঘরে এসে চারপাশ তাকিয়ে দেখার পর একজন বললেন, ভাই, আপনার ঘরে আমরা দু-তিনজন থাকব। আপনার কোন আপত্তি নেই ত?

আমি পাল্টা প্রশ্ন করলাম, বড়দার অনুমতি নিয়েছেন?

ছোড়দার ঘরে থাকবার জন্য বড়দার অনুমতির দরকার হয় না।

হঠাৎ ঘড়ির দিকে নজর পড়তেই দেখি প্রায় পাঁচটা বাজে। আমি তাড়াতাড়ি উঠে বললাম, একটু ঘুরে আসি। আপনারা ততক্ষণে ঘরদোর গুছিয়ে নিন।

এক দিদি বললেন, বাইরে থেকে খেয়ে আসবেন না। আপনি আমাদের সঙ্গেই খাবেন।

না না, ওসব ঝামেলা……

দিদি বললেন, কিচ্ছু ঝামেলা না। আপনি আমাদের সঙ্গেই খাবেন।

বড়দা বললেন, হাঁ হাঁ, আপনি এদের সঙ্গেই খাবেন।

আমি বললাম, কিন্তু আমি কখন ফিরব তার কিছু ঠিক নেই। তাই…

দিদি বললেন, আমাদেরও খেতে খেতে রাত হবে। আপনি যান। ঘুরে আসুন।

দিদির হাতে ঘরের তালা-চাবি দিয়ে আমি বেরিয়ে পড়লাম।

ভেবেছিলাম আনা সাগর লেক আর সম্রাট আকবরের প্রাসাদে মিউজিয়াম দেখব কিন্তু এতক্ষণে মিউজিয়াম বন্ধ হয়ে গেছে বলে ওদিকে গেলাম না। হাঁটতে হাঁটতে গ্রামের মার্কেটের সামনে গিয়ে একটা সাইকেল রিক্শায় চড়ে বললাম মেয়ো কলেজ।

আজমীরের অন্যান্য দ্রষ্টব্য স্থানের মধ্যে মেয়ো কলেজ অন্যতম। কৃতি ছাত্র-ছাত্রী ও যশস্বী অধ্যাপকদের জন্যই কলেজ খ্যাতি অর্জন করে, কিন্তু ছাত্র বা অধ্যাপকদের জন্য মেয়ো কলেজের খ্যাতি সর্বভারতীয় নয়। প্রাক্ স্বাধীনতা যুগে নানা দেশীয় রাজাদের আদুরে দুলালরাই এখানে পড়াশুনা করতেন শুধু তাই নয়। এই রাজনন্দনরা কোন হোস্টেলে থাকতেন না, থাকতেন নিজস্ব ছোট ছোট প্রাসাদে। প্রতি রাজনন্দনের সঙ্গে থাকত শত খানেক চাকর-বাকর ও কর্মচারী। আর নিজস্ব ইংরেজ গৃহ-শিক্ষক। কলেজের মধ্যেই প্লেন ল্যাণ্ড করার রানওয়ে। জয়পুর বা যোধপুরের মত কোন কোন রাজ্যের মহারাজ-কুমারেরা নিজেদের প্লেনেই আসা-যাওয়া করতেন। এ হেন কলেজ নিশ্চয়ই দ্রষ্টব্য বস্তু।

কলেজের মেন গেটের কাছেই রিক্শা থেকে নেমে পড়লাম। এদিক-ওদিক দেখতে দেখতে সামনের দিকে এগুচ্ছি। একটু এগুবার পরই হঠাৎ একটা সাইকেল রিক্সা আমার সামনে এসে ব্রেক করতেই একটু অপ্রস্তুত হয়ে পাশে সরে গেলাম।

অজয়বাবু, আপনি!

ভূত দেখার মত চমকে উঠলাম। সামনে তাকিয়ে দেখি ভারতী রায়। এক গাল হাসি হেসে জিজ্ঞাসা করলাম, আপনি কী এখানেই লেকচারার হয়েছেন?

ভারতী রিক্শা থেকে নেমে বললেন, না না, আমি এখানে থাকি না, আমি উদয়পুরে আছি।

এখানে কী বেড়াতে এসেছেন?

না, এদের ইংলিশ সোসাইটির একটা সেমিনারে এসেছি। এবার আমার দিকে সোজাসুজি তাকিয়ে জিজ্ঞাসা করল, আপনি নিশ্চয়ই বেড়াতে বেরিয়েছেন?

রেলের কেরাণী হয়ে এইটুকুই ত লাভ।

আমিও ত আপনার মত কেরাণী ছিলাম।

এখন ত নেই।

ওসব কথা ছাড়ুন। কোথায় যাচ্ছেন ?

এই ত মেয়ো কলেজ দেখতে এসেছি।

খাজা সাহেবের দরগা দেখেছেন ?

না, কিন্তু ওখানে কি হিন্দুদের ঢুকতে দেয় ?

ওখানে সবাই যেতে পারেন। চলুন, খাজা সাহেবের দরগা ঘুরে আসি।

চলুন।

রিক্‌শায় উঠে ভারতীর পাশে বসতেই বললাম, আপনার সঙ্গে এমনভাবে দেখা হবে, তা কল্পনাও করি নি।

আমি ত প্রথমে নিজের চোখকেই বিশ্বাস করতে পারি নি।

কেন ?

ভাবছিলাম, হয়ত আপনার মত দেখতেই অন্য কেউ হবেন।

কেন ? আমি কী আজমীরে আসতে পারি না ?

নিশ্চয় পারেন কিন্তু হঠাৎ এখানে এভাবে দেখব, তা ত আশা করি নি।

তারপর বলুন কেমন আছেন ?

মোটামুটি ভালই আছি তবে বড্ড লোনলি লাগে।

কেন ? কোন বন্ধুবান্ধব নেই ?

আমাদের কলেজে আমি ছাড়া আর কোন বাঙ্গালী নেই। তাছাড়া প্রায় সব লেকচারারই বেশ বয়স্ক। এবার ভারতী আমার দিকে হাসতে হাসতে বললো, আর দু-এক জন অল্পবয়স্ক পুরুষ লেকচারার যেন একটু বেশী উৎসাহী। তাই···

এবার আমি হাসতে হাসতে বললাম, সেটা ত খুবই স্বাভাবিক।

স্বাভাবিক কেন ?

একে সুন্দরী, তার উপর অবিবাহিতা···

তারপর একা থাকি।

লাভলি।

লাভলি বললেন কেন ?

এর পরেও যদি ছেলেছোকরা লেকচারাররা চুপ করে বসে থাকে তাহলে তা'দের কলেজ থেকে তাড়িয়ে দেওয়া উচিত।

ভারতী মুখ টিপে টিপে হাসতে হাসতে বললো, আপনাকেও ত খুব সুবিধের লোক বলে মনে হচ্ছে না।

সুন্দরী মেয়েদের নিয়ে এই ঝামেলা।

এই ঝামেলা মানে ?

সুন্দরী মেয়েরা সব সময় সব পুরুষদের সন্দেহের চোখে দেখেন।

কিন্তু আমি ত সুন্দরী না।

আপনার ঘরের আয়নাটা নিশ্চয়ই ভেঙে গেছে, তাই নিজেকে ভাল করে

দেখতে পারেন না।

আস্তে আস্তে রিক্সা এগুচ্ছে। ভারতী বললেন, ওসব কথা বাদ দিন। এবার বলুন কোথায় কোথায় ঘুরলেন!

দিল্লীতে দুদিন কাটিয়ে কাল রাত্রে এখানে এসেছি।

জয়পুর যান নি?

না। ভেবেছি উদয়পুর-চিতোর দেখে ফেরার পথে জয়পুর যাব।

আপনি উদয়পুর যাবেন?

সেই ভেবেই ত বেরিয়েছি।

কবে যাবেন?

ভাবছি কাল যাব?

কাল না গিয়ে পরশু চলুন। একসঙ্গে যাওয়া যাবে।

তা যেতে পারি।

একটা দুঃশ্চিন্তা দূর হলো।

কিসের দুঃশ্চিন্তা।

এই এখান থেকে উদয়পুর যাওয়া।

কেন? খুব কষ্টকর নাকি?

এখান থেকে ট্রেনে যেতে হলে সকাল সাড়ে সাতটায় রওনা হয়ে দেড়টা নাগাদ চিতোর, তারপর সেখান থেকে চারটের ট্রেন ধরে রাত সাড়ে দশটায় উদয়পুর।

বলেন কি?

এখানে যাতায়াত করা বড় কষ্টকর।

বাস সার্ভিস ত বেশ ভাল।

এত লং জার্নি বাসে যাওয়া কষ্টকর।

তা ঠিক।

রিকসা বড় রাস্তা ছেড়ে একটু সরু রাস্তায় ঢুকল। দুপাশে শুধু দোকান।

আমি জিজ্ঞাসা করলাম, আপনি এখানে কবে এসেছেন?

পরশু।

কোথায় আছেন?

ঐ কলেজের একটা হস্টেলে। এবার আমার দিকে ফিরে জিজ্ঞাসা করলেন, আপনি কোথায় উঠেছেন?

কিং এডওয়ার্ড দ্য সেভেনথ্…

বুঝেছি। স্টেশনের খুব কাছেই ত?

হ্যাঁ।

ওখানকার ব্যবস্থা কেমন?

মোটামুটি ভালই। তবে কলকাতা টেলিফোনের একদল মেয়ে এসেছেন বলে…

তাই নাকি ?

হ্যাঁ। ওদের মধ্যে দু-তিনজন আমার ঘরেই থাকবেন।

ভারতী চমকে উঠে বললেন, কী বললেন ?

চমকে ওঠার কোন কারণ নেই, কারণ আমার ঘরে যাঁরা থাকবেন তাঁরা আমার মা-মাসীর সমবয়সী।

উনি এ বিষয়ে আর কোন মন্তব্য না করে সামনের দিকে হাত দিয়ে বললেন, ঐ যে খাজা সাহেবের দরগা।

এটা বুঝি মুসলমানদের খুব বড় তীর্থস্থান।

ভারতবর্ষের মধ্যে মুসলমানদের সব চাইতে বড় তীর্থস্থান।

তাই নাকি ?

হ্যাঁ। তাছাড়া হিন্দুরাও খাজা সাহেবকে খুব মানেন।

বলেন কি ?

দু-চার দিন গেলেই দেখতে পাবেন কত হিন্দু, শিখ, বৌদ্ধ, জৈন আসছেন, তার ঠিক-ঠিকানা নেই।

ওরা কি শুধু দরগা দেখতে আসেন ?

না না, খাজা সাহেবের দরগায় কেউ বেড়াতে যান না। প্রায় সবাই বিশ্বাস করেন, খাজা সাহেবকে ভালভাবে বললে মনের সব ইচ্ছা পূর্ণ হবেই।

বলেন কি ?

ভারতী একটু হেসে বললেন, আপনি গেলেই দেখবেন মনটা অন্য রকম হয়ে গেছে।

সাইকেল রিক্সা হঠাৎ ব্রেক করতেই সামনে তাকিয়ে দেখি খাজা মইনুদ্দীন চিস্তি সাহেবের দরগা।

সিঁড়ি দিয়ে ওঠার আগেই পাশের একটা লোকের কাছে দুজনে জুতো রেখে একটা টিকিট নিলাম। গেটগুলো পার হতেই দু পাশে ফুলের দোকান। আরো এগিয়ে গেলাম। অসংখ্য গরীব-দুঃখী মানুষ চারিদিকে ছড়িয়ে রয়েছেন। আরো খানিকটা এগিয়ে মজারের সামনে পোঁছতেই ভারতী বললেন, একটু দাঁড়ান। কাজীসাহেবকে ডেকে আনি।

কোন কাজীসাহেব ?

যিনি আমাদের ভিতরে নিয়ে যাবেন।

আমি আর কোন প্রশ্ন না করে চুপ করে দাঁড়িয়ে রইলাম। এদিক-ওদিক তাকিয়ে দেখি, কত শত মেয়ে-পুরুষ আপন মনে প্রার্থনা করছেন বা কোরান পড়ছেন। চারপাশের স্নিগ্ধ শান্ত পরিবেশ দেখে বোধহয় একটু বিভোর হয়েই পড়েছিলাম।

হঠাৎ ভারতী বললেন, আসুন।

তাকিয়ে দেখি ভারতী আর কাজীসাহেব। ভদ্রলোক বেশ বয়স্ক। কাঁচা-পাকা চুল-দাড়ি। চোখ দুটো খুব স্বচ্ছ। দেখেই মনে হয়, খুব স্নেহপ্রবণ ও ধার্মিক।

কাজীসাহেব আমাকে বললেন, ভাইসাব, রুমালটা মাথায় দিন। ভারতীকে বললেন, মাথায় ঘোমটা দিন।

ভারতী মাথায় ঘোমটা দিলেন। আমি মাথায় রুমাল দিলাম।

কাজীসাহেব বললেন, আসুন।

ওর পিছন পিছন আমরা দুজনে খাজা সাহেবের মজারের সামনে হাজির হয়েই আমি থমকে দাঁড়ালাম। কবরের চারপাশে রুপোর রেলিঙ। সেই রেলিঙ ধরে একজন বর্ষীয়সী হিন্দু মহিলা বাচ্চা ছেলের মত কাঁদছেন। দেখেই মনটা খারাপ হয়ে গেল।

কাজীসাহেব ইসারায় আমাদের এগুতে বললেন।

আমি দু-এক পা এগিয়ে খুব চাপা গলায় কাজীসাহেবকে জিজ্ঞাসা করলাম, উনি কাঁদছেন কেন?

নিশ্চয়ই কোন দুঃখ আছে। তাই বাবার কাছে দোয়া চাইছেন।

মুহূর্তের জন্য দৃষ্টিটা একবার চারপাশে ঘুরিয়ে নিতেই দেখি, আরো অনেক মেয়ে-পুরুষ ছেলে-বুড়ো রেলিঙের উপর মাথা রেখে আপন মনে কত কি কথা বলছেন শুন্যপ্রাণ খাজা সাহেবের দরবারে। কেউ কেউ ঘরের কোণায় কোণায় চোখ বন্ধ করে বসে আছেন। এদের মধ্যে কেউ বা লক্ষকোটিপতি, কেউ বা পথের ভিখারী।

কাজীসাহেব আমার কানে কানে ফিস ফিস করে বললেন, কুদরত নে উসকো রোনাই শিখায়া। ছোট বাচ্চার ক্ষিদে পেলে, ব্যথা লাগলে সে শুধু কাঁদে। সেই কান্না শুনেই ত মা ছুটে আসেন, তাই না?

আমি মাথা নাড়লাম।

আমরা সবাই বাবার সন্তান। তাই দুঃখ পেলে, কষ্ট হলে, আমরা এখানে ছাড়া কোথায় কাঁদব?

রুপোর রেলিঙ দিয়ে দিয়ে ঘেরা খাজা সাহেবের কবর সুন্দর জরির কাজ করা ভেলভেটের চাদরে ঢাকা। তার উপর অসংখ্য গোলাপের পাপড়ি। চন্দন, আতর, ফুল আর লোবানের গন্ধ মিলে-মিশে এমন পবিত্র পরিবেশ সৃষ্টি করেছে যে মনটা কেমন যেন বদলে গেল।

ভারতী খুব চাপা গলায় জিজ্ঞাসা করলেন, ভাল লাগছে না।

সত্যি খুব ভাল লাগছে।

কাজীসাহেব রেলিঙের ভিতরে গিয়ে আমাদের ডাক দিলেন। আমরা দুজনে রেলিঙের ধারে দাঁড়াতেই উনি কবরের উপরের ভেলভেটের চাদরের এক কোণা দিয়ে আমাদের দুজনের মাথা ঢেকে আপন মনে প্রার্থনা শুরু করলেন—আল্লা কে মেহবুব কী তুরবত কা তসদ্দুক শায়না সোওদা কী আজমত কা তসদ্দুক আপনে দরওয়াজা সে নেয়ামত বকস দিজিয়ে। এই বিশ্ব সংসারের পালনকর্তা আল্লার তুমি পরম প্রিয় সন্তান। আল্লা তোমার কথা শোনেন। তাই আজ এই সন্ধ্যেবেলায় তোমার দুটি অবোধ সন্তান তোমার দরবারে হাজির হয়েছে বাবা, তুমি এদের বিদ্যা দাও, অর্থ-যশ খ্যাতি-প্রতিপত্তি দাও।

কাজীসাহেব থামেন না। জলপ্রপাতের ধারার মত অনর্গল বলে যান—এই মিয়া-বিবির সংসারে যেন নিত্য শান্তি বিরাজ করে। শোকে-দুঃখে এদের কাতর করো না। তোমার অপার করুণা ধারার মত এদের জীবনে যেন প্রেম-প্রীতি অনন্তকালের জন্য অটুট থাকে। বাবা আমার। খাজা সাহেব আমার, অন্ধের যষ্টির মত তুমিই এদের একমাত্র ভরসা। তুমিই এদের অন্ধকারের আলো, সব বিপদের একমাত্র সহায়। এদের সন্তান-সন্ততি যেন তোমার আশীর্বাদধন্য হয়।

আমি মাথা নীচু করে চোখ বন্ধ করে কাজীসাহেবের কাতর প্রার্থনা শুনতে শুনতে কোথায় যেন হারিয়ে গেছি।

মনে হলো কাজীসাহেব একটু হাসলেন। বললেন, তুমি দুনিয়ার বাদশা, গরীবের একমাত্র পালনকর্তা। তোমার নামে ডুবে যাওয়া মানুষ ভেসে ওঠে, অন্ধকার দুঃখের মহাসাগর হাসতে হাসতে পার হয়। আমি জানি তুমি তোমার এই অবোধ ছেলে আর তার প্রাণপ্রিয় প্রেয়সীকে তুমি নিত্য আশীর্বাদ করবেই।

কাজীসাহেব আমাদের মাথার উপর থেকে পবিত্র ভেলভেটের চাদর সরিয়ে নিয়ে মুখের সামনে ধরে বললেন, এই চাদরে চুমু খান।

স্বপ্নাবিষ্টের মত দুজনেই চাদরে চুমু খেলাম।

কাজীসাহেব স্নিগ্ধ শান্ত হাসি হেসে বললেন, কোন ভয় নেই, কোন চিন্তা নেই, বাবা আপনাদের সুখী করবেনই। বাবা বড় স্নেহপরায়ণ। যে ছেলেমেয়েরা এখানে ছুটে আসে, বাবা তাদের কোন দুঃখ কষ্ট সহ্য করতে পারেন না।

নিঃশব্দে বাইরে বেরিয়ে এলাম।

কাজীসাহেব জিজ্ঞাসা করলেন, কাল আবার আসবেন?

ভারতী বললেন, আসব।

আসবেন। বাবা খুব খুশী হবেন।

দরজার বাইরে এসে ভারতী ব্যাগ থেকে একটা কুড়ি টাকার নোট বের করে কাজীসাহেবের হাতে দিতেই উনি বললেন, না মা, এসব কিছু দিতে হবে না।

না না, এটা থাক।

বাবা আপনাদের মঙ্গল করুন।

আমি মন্ত্রমুগ্ধের মত চুপ করে দাঁড়িয়ে রইলাম।

॥ দুই ॥

অনেকক্ষণ চুপচাপ দুজনে পাশাপাশি হাঁটছিলাম। নয়া বাজার, ত্রিপোলিয়া গেট পিছনে ফেলে অনেক দূরে এগিয়ে গেলাম। আস্তে আস্তে দোকান-বাজার লোকজনের ভীড় পাতলা হয়ে এলো।

ভারতী আস্তে আস্তে বললেন, অজয়বাবু।

বলুন।

কি এত ভাবছেন ?

অনেক কিছু।

বলা যায় না ?

তা যায় কিন্তু কী ?

কিন্তু কী ?

ভাবছি কিভাবে বলব।

যেভাবে ইচ্ছা বলুন।

আমি হঠাৎ থমকে দাঁড়িয়ে ওর দিকে তাকিয়ে বললাম, খাজা সাহেবের দরগায় কি যেন ঘটে গেল, তাই না ?

আবছা আলোয় উনি একবার মুগ্ধ দৃষ্টিতে মুহূর্তের জন্য আমার দিকে তাকিয়েই মুখ নীচু করে বললেন, অত চিন্তা করার কোন কারণ নেই।

কিছুক্ষণ পরে ভারতী আমাকে জিজ্ঞাসা করলেন, উদয়পুরে ক'দিন থাকবেন ?

দু-তিন দিন।

আবার দুজনে পাশাপাশি হাঁটছি।

আমি জিজ্ঞাসা করলাম, কাল আবার খাজা সাহেবের দরগায় যাবেন ?

কাজীসাহেবকে যখন বলেছি তখন যাওয়া উচিত। একটু থেমে ভারতী আমার দিকে তাকিয়ে জিজ্ঞাসা করলেন, আপনি যাবেন ?

এবার একটু হেসে বললাম, শুধু খাজা সাহেবের দরগায় কেন, এবার থেকে সারা জীবনই ত আপনার সঙ্গে সঙ্গে ঘুরতে হবে।

কেন ঠাট্টা করছেন ?

না না, ঠাট্টা করছি না, তবে একবার যখন কেরানীর অদৃষ্টে শিকে ছিঁড়েছে···

কেরানী, কেরানী বলবেন না ত।

বলব না ?

না।

আচ্ছা বলব না।

হাঁটতে হাঁটতে আনা সাগরের কাছে এসে গেছি। বললাম, একটু বসবেন ?

চলুন একটু বসি। হাঁটতে হাঁটতে পা ব্যথা হয়ে গেছে।

আনা সাগরের ধারে দুজনে পাশাপাশি বসলাম। দু-পাঁচ মিনিট কেউই কোন কথা বললাম না। এদিক-ওদিক দেখলাম।

ভারতীই প্রথম কথা বললেন, কলকাতার অফিসের সবাই কেমন আছেন?

ভালই।

বড়দা কী রিটায়ার করেছেন?

না, এখনও বছর দুই দেরী আছে।

প্রিয়দা-মিত্তিরদার ঝগড়া এখনও হয়?

একটু হেসে বললাম, হ্যাঁ।

প্রিয়দার মেয়ের বিয়েতে নিশ্চয়ই গিয়েছিলেন?

আমি ওর প্রশ্নের জবাব না দিয়ে পাল্টা প্রশ্ন করলাম, প্রিয়দার মেয়ের বিয়ের খবর আপনি পেলেন কি করে?

প্রিয়দা ত আমাকে নেমন্তন্নর চিঠি পাঠিয়েছিলেন।

তাই নাকি?

হ্যাঁ। ভারতী একটু হেসে বললেন, ঐ বিয়ের নেমন্তন্নর চিঠি ত আপনি লিখেছিলেন?

সে খবর কে দিলেন?

আপনাদের সব খবর রাখি।

যাক তাহলে আমাদের ভুলে যান নি।

দু-এক মাস অন্তর বড়দার একটা পোস্টকার্ড আসবেই।

তাই নাকি?

হ্যাঁ।

আপনি বড়দাকে চিঠি দেন?

আমি শুধু বড়দা কেন, প্রিয়দা-মিত্তিরদাকেও মাঝে মাঝে চিঠি লিখি।

আমাকে লেখেন না কেন?

এবার লিখব।

সত্যি।

বলছি ত লিখব।

পোস্টকার্ডে লিখবেন নাকি?

তাহলে কিসে লিখব?

খামে।

খামে?

হ্যাঁ খামে।

কেন?

মিয়া-বিবিরা খামেই চিঠি লেখে।

অজয়বাবু।

খাজা সাহেবের দরগা ঘুরে আসার পরেও আমি অজয়বাবু আছি?

তবে কী ?

একটু চুপ করে থাকার পর আমি জিজ্ঞাসা করলাম, একটা প্রশ্ন করব ?

নিশ্চয়ই।

কলকাতায় ত আমার সঙ্গে বিশেষ কথাবার্তা বলতেন না কিন্তু আজ আমাকে এভাবে খাজা সাহেবের দরগায় নিয়ে গেলেন কেন ?

কোন বিশেষ কারণ নেই। আমি যাচ্ছিলাম বলেই আপনাকে যেতে বললাম। এবার আমার দিকে তাকিয়ে জিজ্ঞাসা করলেন, খাজা সাহেবের দরগায় গিয়ে কি আপনার ভাল লাগে নি।

সত্যি খুব ভাল লেগেছে।

কালকে আবার যাবেন ?

নিশ্চয়ই যাব।

যাক শুনে খুব খুশী হলাম।

শুধু খুশী কেন, আপনাকে সুখী করাও ত আমার কাজ।

আমার একটা কথা বিশ্বাস করবেন ?

করব।

আমি কাজীসাহেবকে আপনার বিষয়ে কিছুই বলি নি। উনি নিজের মনেই ঐভাবে প্রার্থনা করলেন।

আমি হেসে বললাম, আমি বলছি না আপনি চক্রান্ত করে আমাকে ওখানে নিয়ে গেছেন।

আচ্ছা, এবার সত্যি করে বলুন ত দরগা থেকে বেরিয়ে অত কী ভাবছিলেন ?

বলব ?

বলুন।

ভাবছিলাম আমার এই ব্যর্থ জীবনে এই রকম একটা অঘটন ঘটলে মন্দ হয় না।

আপনার জীবনটা ব্যর্থ হলো কিসে ?

কোন মতে বাংলায় এম-এ পাশ করে কেরানীগিরি করছি, এটা কী খুব সাফল্যের লক্ষণ ?

ম্যাট্রিক পাশ করে কেরানী হলে বোধহয় খুব সাফল্য লাভ করতেন ?

একশ বার। তাহলে অন্তত মনে মনে রাজা হবার স্বপ্ন দেখতাম না।

আপনি বোধহয় বাবা-মার খুব আদুরে, তাই না ?

কেন বলুন ত ?

তা না হলে কেউ এত সহজে সাফল্য চায় ?

আবছা আলোয় হাতের ঘড়ি দেখে বললাম, প্রায় আটটা বাজে, উঠবেন না ?

কেন ? টেলিফোনের বান্ধবীদের জন্য মন কেমন করছে ?

দেখছি আপনি আমার মনের সব খবর জেনে গেছেন।

আচ্ছা চলুন ওঠা যাক।

আবার দুজন পাশাপাশি হাঁটছি।

কিছুক্ষণ পরে ভারতী আবার আমাকে জিজ্ঞাসা করলেন, উদয়পুরে কদিন থাকবেন ?

দু-তিন দিন।

তারপর চিতোর যাবেন ?

তাই ত ভেবেছি।

আর কোথায় যাবেন ?

ফেরার পথে জয়পুরে একদিন থাকব।

মাত্র একদিন ?

হ্যাঁ। এর আগেও আমি একবার জয়পুর এসেছি।

চিতোর-উদয়পুরেও কি আগে এসেছেন ?

না।

আবার একটু চুপচাপ।

তারপর আমি জিজ্ঞাসা করলাম, আপনার বাবা-মা ভাইবোন কি কলকাতায় আছেন ?

আমার মা অনেক আগেই মারা গিয়েছেন। তাছাড়া আমার আর কোন ভাইবোনও নেই।

আপনার বাবা কোথায় ?

বাবা ডুয়ার্সের এক টি-গার্ডেনের ম্যানেজার।

তাহলে কলকাতায় কার কাছে থাকতেন ?

আমি বরাবরই হস্টেলে থেকেছি।

টি-গার্ডেনে যাঁরা চাকরি করেন তাঁদের ছেলেমেয়েদের হস্টেলে না রাখলে পড়াশুনাই হয় না।

আমার কথায় উনি কোন মন্তব্য করলেন না। আমিই আবার জিজ্ঞাসা করলাম, তাহলে শুধু ছুটির সময় বাবার কাছে যান ?

হ্যাঁ যেতে হয়। তবে না গেলেই ভাল হয়।

কথাটা শুনে একটু খটকা লাগলেও আমি আর কোন প্রশ্ন করলাম না।

পাশ দিয়ে দুটো খালি সাইকেল রিক্সা চলে গেল কিন্তু দুজনের কেউই থামালাম না।

ভারতী বললেন, এবার আপনাদের বাড়ীর খবর বলুন।

তেমন উল্লেখযোগ্য কিছু না। বাবা-মা দুজনেই জীবিত। একমাত্র দিদির বিয়ে হোয়ে গেছে। বাবা আলিপুর কোর্টের সাধারণ উকিল, জামাইবাবু ইণ্ডিয়ান অয়েলের অফিসার। আর আমার খবর ত জানেনই।

ভারতী হাসতে হাসতে জিজ্ঞাসা করলেন, বাবা-মা তাঁদের একমাত্র ছেলের বিয়ে দেন নি কেন ?

বিয়ে করব না বলে।

কেন ?

যে চাকরি করছি তাতে আর বিয়ে করে না।

আপনি কি বলতে চান যাঁরা সাধারণ চাকরি করবে, তারা বিয়ে করবে না ?

যার ইচ্ছে সে বিয়ে করুক কিন্তু আমি করব না।

আপনি নিজেকে খুব ছোট মনে করেন, তাই না ?

বিরাট কিছু মনে করার ত কোন কারণ নেই।

শুধু একটা চাকরির উপরেই বুঝি সবকিছু নির্ভর করে ?

বর্তমান যুগে কর্মজীবনের সাফল্য-ব্যর্থতার উপরই সবকিছু নির্ভর করে।

পাশ দিয়ে একটা খালি রিক্সা যেতেই উনি থামালেন। দুজনে উঠলাম।

রিক্সাওয়ালাকে বললাম, মেয়ো কলেজ।

ভারতী বললেন, আমি বরং আপনাকে নামিয়ে দিয়ে যাই।

তাতে কিছু হবে না।

এবার উনি জিজ্ঞাসা করলেন, কাল আপনার কী প্রোগ্রাম ?

ভোজনং যত্রতত্র শয়নং হট্ট মন্দিরে।

ভারতী একটু হেসে বললেন, আপনার সঙ্গে কথা বলে আনন্দ আছে।

তাই নাকি ?

সত্যি আপনার জন্য বিকেল সন্ধ্যেটা বেশ কাটল।

আমি এ বিষয়ে কিছু না বলে জিজ্ঞাসা করলাম, কাল আপনার কী প্রোগ্রাম ?

ন'টা থেকে বারোটা পর্যন্ত সেমিনার। তারপর ছুটি।

তাহলে কাল দুপুরে একসঙ্গে খাওয়া যাবে।

না, দুপুরে আমাকে ওখানেই খেতে হবে, বরং কাল রাত্রে একসঙ্গে খাওয়া যাবে।

কোন আপত্তি নেই।

কাল আড়াইটে-তিনটে নাগাদ আপনি আমার হস্টেলে চলে আসবেন।

আমি আপনার ওখানে এলে ত আপনার প্রৌঢ়-বৃদ্ধ অধ্যাপকদের মন খারাপ হয়ে যাবে।

ভারতী হাসতে হাসতে বললেন, আপনার কী ধারণা আমার প্রতি ওদের সবারই দুর্বলতা আছে ?

সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই।

আপনার সঙ্গে তর্ক করে লাভ নেই।

সেই ভাল।

মোটকথা তিনটের মধ্যে আসবেন।

ওখানে গিয়ে কী বলব ?

বলবেন আমাকে ডেকে দিতে।

যদি কোন বুড়ো অধ্যাপক জিজ্ঞাসা করেন, আমি কে ?

কেউ কিছু জিজ্ঞাসা করবেন না।

কিন্তু যদি কেউ জিজ্ঞাসা করেন তাহলে কি বলব ?

বলবেন, আপনি আমার বন্ধু।

এদেশে কী ছেলেমেয়েদের বন্ধুত্ব হতে পারে ?

ভারতী আবার হাসেন। বলেন, এবার আপনি আমার কাছে বকুনি খাবেন।

সে শুভদিন কী আমার জীবনে কোনদিন আসবে ?

এবার আপনাকে এক ধাক্কা দিয়ে ফেলে দেব।

সঙ্গে সঙ্গে আমি হিন্দী গান শুরু করব।

আর কোন কথা হলো না। একটু পরে সাইকেল রিক্সা মেয়ো কলেজে ঢুকল। খানিকটা ভিতরে হস্টেল। টেলিফোন বান্ধবীদের সঙ্গে বেশী মাতামাতি করবেন না। যান। কাল ঠিক সময় আসবেন।

সিঁড়ি দিয়ে উপরে উঠতে উঠতেই শুনতে পেলাম, মনিদি ছোড়দা আসছেন। একটু হাসলাম। তারপর আমার ঘরের দরজায় পেঁছুতেই আমার দুই দিদি প্রায় একসঙ্গেই বললেন, ঠিক সময় এসেছেন।

জিজ্ঞাসা করলাম ঠিক সময় মানে ?

এক দিদি হাসতে হাসতে বললেন, ফাইভ ষ্টার হোটেলে থাকার ত মুরোদ নেই, তাই নিজেরাই একটু গান-বাজনা করার পর খাওয়া-দাওয়ার পরিকল্পনা হচ্ছিল।

আমি বললাম, সে ত উত্তম প্রস্তাব।

তাহলে চলুন পাশের ঘরে যাওয়া যাক।

আপনারা যান। আমি জামা কাপড় পাল্টে আসছি।

আমি হাত মুখ ধুয়ে জামা-কাপড় পাল্টে পাশের ঘরে যেতেই দেখি আসর সরগরম। একটা হারমোনিয়াম ঘিরে তিন-চারজন মেয়ে বই খাতা ওল্টাচ্ছেন। আর সবাই ঘরের মেঝেতে বিছান নানা বিছানায় বসে। এক ইঞ্চি জায়গা খালি নেই। ঘরের দরজায় দাঁড়িয়ে একটু ইতস্ততঃ করছি দেখেই এক দিদি বললেন, কিছু চিন্তার প্রয়োজন নেই। ভিতরে চলে আসুন।

সঙ্গে সঙ্গে কয়েকজন মেয়ে এদিক-ওদিক একটু নড়ে-চড়ে বসে আমাকে বসবার জায়গা করে দিতেই বসলাম। আমার ঘরের দ্বিতীয় দিদি মেয়েদের স্কুলের হেড-মিস্ট্রেসের মত গম্ভীর গলায় বললেন, ইনি অজয় চৌধুরী।

আমি বসে বসেই হাত জোড় করে নমস্কার করলাম।

এবার মেয়েদের দেখিয়ে আমাকে বললেন, এতগুলো মেয়ের নাম নিশ্চয়ই আপনার মনে থাকবে না। তাই আলাদা আলাদা করে পরিচয় করিয়ে দিচ্ছি না।

আমার পিছন দিকে একজন বললেন, তাছাড়া কাল সকালেই ত চলে যাচ্ছি। আমরা চলে যাবার সঙ্গে সঙ্গেই ছোড়দা আমাদের ভুলে যাবেন।

আমি পাশ ফিরে একটি মেয়েকে জিজ্ঞাসা করলাম, আপনারা কালই চলে যাচ্ছেন ?

হ্যাঁ, আমরা কাল সকালেই জয়পুরে যাব।

এখানে কিছু দেখবেন না ?

কাল সকালে পুষ্কর দেখেই জয়পুর রওনা হবো।

আর কিছু দেখবেন না ?

দ্বারকা আর মাউণ্ট আবুতে একদিন করে বেশী থাকার জন্য আর দেরী করতে পারছি না। ওদিকে দিল্লী থেকে কলকাতা ফেরার রিজার্ভেশন করা আছে।

নীরব হারমোনিয়াম সরব হয়ে উঠল। শুরু হলো গান—অরূপ-বীণা রূপের আড়ালে লুকিয়ে বাজে, সে বীণা আজি উঠিল বাজি হৃদয় মাঝে।

অপূর্ব লাগল কিন্তু প্রশংসা করতে দ্বিধা হলো। পাশের যে মেয়েটির সঙ্গে আগে কথা বলছিলাম, শুধু তাকেই বললাম, চমৎকার গাইলেন।

মণিকা সত্যি ভাল গায়।

উনিও কী আপনাদের টেলিফোনেই কাজ করেন ?

হ্যাঁ।

হঠাৎ আবার শুরু হলো—এদিন আজি কোন্ ঘরে গো খুলে দিল দ্বার ? আজি প্রাতে সূর্য ওঠা সফল হল কার।

ওটা শেষ হবার সঙ্গে সঙ্গে আবার শুরু করলেন—আমি জ্বালব না মোর বাতায়নে প্রদীপ আনি, আমি শুনব বসে আঁধার-ভরা গভীর-বাণী।

গান শেষ হতেই আমি আপন মনে বললাম, অপূর্ব !

এবার পাশের মেয়েটি আমাকে জিজ্ঞাসা করলেন, আপনি নিশ্চয়ই ভাল গাইতে পারেন ?

না তবে আমার দিদি গান শিখতেন বলে আমারও একটু গানের কান আছে।

আরেক জন প্রশ্ন করলেন, আপনিও কি কলকাতায় থাকেন ?

হ্যাঁ।

কোথায় কাজ করেন ?

রেলে।

কয়লাঘাটায় ? নাকি ফেয়ারলিতে ?

কয়লাঘাটায়।

লেখাপড়াও কি কলকাতায় ?

হ্যাঁ।

এবার আগের মেয়েটি জিজ্ঞাসা করলে, আপনি কোন কলেজে পড়তেন ?

আশুতোষ থেকে বি-এ পাশ করেছি।

তারপর ?

এম-এ পড়েছি।

কোন সাবজেক্ট নিয়ে পড়েছেন ?

বাংলা নিয়ে না পড়লে কেউ কেরাণী হয় ?

ও কথা বলবেন না।

"সখী বহে গেল বেলা, শুধু হাসিখেলা এ কি আর ভাল লাগে। আকুল তিয়াস, প্রেমের পিয়াস, প্রাণে কেন নাহি জাগে।"

পিছন দিক থেকে একটি মেয়ে হঠাৎ বেশ জোরেই বললেন, আর দুঃখ করিস না মণিকা। এবার ঠিকই জাগবে।

সবাই একসঙ্গে হেসে উঠলেন।

মণিকার পর আরও দুজনে দুটি গান গাইলেন। তারপর আসর ভাঙ্গল।

সবাই উঠে দাঁড়ালেন। আমিও। এক দিদি আমাকে জিজ্ঞাসা করলেন, কেমন লাগল ?

খুব ভাল।

দিদি সঙ্গে সঙ্গে একটু জোরেই বললেন, মণিকা এদিকে আয়।

উনি আমাদের সামনে এসে দিদিকে বললেন, কি বলছ রাণীদি ?

তোর গান আমাদের ছোড়দার খুব ভাল লেগেছে।

মণিকা একটু সলজ্জ হাসি হেসে বললেন, খুব ভাল লাগার মত আমি গাই না।

আমি বললাম, না না, সত্যি খুব ভাল লাগল।

ধন্যবাদ !

আবার কবে গান শোনাবেন ?

আবার যদি কখনও দেখা হয়, তাহলে নিশ্চয়ই শোনাব।

রাণীদি আমাকে জিজ্ঞাসা করলেন, আপনি কি কলকাতায় থাকেন ?

আমি জবাব দেবার আগেই পাশ থেকে একজন বললেন, ছোড়দার অফিস আমাদের অফিসের খুব কাছে।

রাণীদি জিজ্ঞাসা করলেন, আপনি কোন্ অফিসে আছেন ?

কয়লাঘাটা রেলের অফিসে !

তাহলে ত কলকাতাতেই দেখা হবে।

আমরা কথা বলতে বলতেই খাবার ডাক এলো।

আমরা পাঁচ ছজনে আরেকটা ঘরে যেতেই দেখি, শালপাতায় ভাত-তরকারি দেওয়া হয়ে গেছে। আমি আর রাণীদি পাশাপাশি বসলাম।

মণিকা জিজ্ঞাসা করলেন, কিরে বনানী, আজও কি মাছ নেই ?

না। কাল জয়পুরে মাংস খাওয়াবো।

মণিকা আবার একটু জোরেই ডাক দিলেন, এই বেলাদি।

ঘরের ঐ কোণা থেকে বেলাদি বললেন, কি বলছিস ?

মণিকা সঙ্গে সঙ্গে হাত নেড়ে শুরু করলেন—কত কাল রবে বল ভারত রে, শুধু ডাল ভাত জল পথ্য করে !

সঙ্গে সঙ্গে সবাই হো হো করে হেসে উঠলেন।

হাসি থামার সঙ্গে সঙ্গে আমাদের ডান দিকের কোণা থেকে আরেক জন গেয়ে উঠলেন—তোমার মনের একটি কথা আমায় বলো, তোমার নয়ন কেন এমন ছলোছলো।

মণিকাও জবাব দিতে দেরি করেন না। গানেই জবাব দেন—আমায় থাকতে দে-না আপন-মনে।

আমি পাশ ফিরে রাণীদিকে বললাম, আপনারা বেশ আনন্দেই ঘুরে বেড়ান।

সারা বছর টেলিফোনের সাব্‌স্ক্রাইবারদের কাছ থেকে গালাগালি শুনে শুনে আমরা এমন টায়ার্ড হয়ে যাই যে সুযোগ পেলেই আমরা এই রকম দল বেঁধে বেরিয়ে পড়ি।

ভালই করেন।

তাছাড়া ভাই আমরা সবাই অত্যন্ত সাধারণ মধ্যবিত্ত ঘরের মেয়ে। রোজগার না করলে আমাদের কারুরই সংসার চলবে না।

আমাদের সবারই এই অবস্থা।

তবে মেয়েদের পক্ষে ঘর-সংসারের দায়-দায়িত্ব সামলে চাকরি করা সত্যি বেশ কষ্টকর।

তা ঠিক।

খাওয়া-দাওয়ার পর শুয়ে শুয়ে দিদিদের সঙ্গে অনেক গল্প হলো। ওরা দুজনেই বাড়ীর ঠিকানা আর অফিসের টেলিফোন নম্বর দিলেন। আমিও দিলাম। রাণীদি আমার ঠিকানা দেখেই বললেন, আপনি সদানন্দ রোডে থাকেন?

হ্যাঁ।

আমার আর মণিকার বাড়ীর প্রায় মাঝামাঝি।

তাই নাকি?

হ্যাঁ। আমি থাকি কালীঘাট রোডে আর মণিকা থাকে টালিগঞ্জ ব্রিজের ঠিক পাশে।

তাহলে ত মাঝে মাঝে দেখা হবে।

নিশ্চয়ই, যখন ইচ্ছে চলে আসবেন।

পরের দিন নটা বাজতে না বাজতেই ওরা রওনা হলেন। রওনা হবার আগে রাণীদি বললেন, কলকাতায় ফিরেই দিদির বাড়ী না এলে ভীষণ রাগ করব।

আমি হেসে বললাম, আসব।

পাশ থেকে একজন বললেন, কি ছোড়দা, আমাদের সঙ্গে দেখা হবে না?

যখন রাণীদির শিষ্য হয়েছি তখন নিশ্চয়ই দেখা হবে।

আমার কথায় ওঁরা সবাই হাসলেন।

একটু দূরেই মণিকা দাঁড়িয়েছিলেন। আমি দু-এক পা এগিয়ে ওঁর সামনে গিয়ে বললাম, কলকাতায় গিয়ে গান শোনাবার কথা ভুলে যাবেন না।

উনি একটু সলজ্জ হাসি হেসে বললেন, না না, ভুলব না।

ওরা চলে গেলেন। আমি ঘরে ফিরে এসেই কেমন একটা শূন্যতা অনুভব করলাম মনে মনে। কিছুক্ষণ চুপচাপ বসে থাকার পর শুয়ে পড়লাম। মনে

হল, আজমীরে এসে যেন সবকিছু এলোমেলো হয়ে গেল। আজমীর আসার পর একে একে প্রতিটি মুহূর্তের কথা মনে হল। কি অপ্রত্যাশিতভাবে ভারতীর সঙ্গে দেখা হল। তারপর খাজা সাহেবের দরগায় কাজীসাহেবের ঐ প্রার্থনা। আচ্ছা, সত্যিই যদি···

নিজের মনেই নিজে হাসি। হঠাৎ কাজীসাহেব ঐভাবে প্রার্থনা করলেন বলেই কি ভারতীকে পেতে পারি ?

অসম্ভব। কোন লেকচারার কি কেরানী স্বামী চাইতে পারে ?

রেলের চাকরি পাবার পর প্রথম দিন অফিসে যাবার কথা মনে পড়ল। আমাদের সেক্‌সনে ঢুকেই ভারতীর দিকে আমার প্রথম নজর পড়েছিল। ভারতীও আমার দিকে তাকিয়েছিলেন। মুহূর্তের মধ্যেই দুজনে দৃষ্টি গুটিয়ে নিয়েছিলাম। আজ বেশ মনে পড়ছে সেদিন ওঁকে দেখে ভালই লেগেছিল। ইচ্ছা হয়েছিল ভালভাবে আলাপ করার, কিন্তু সম্ভব হয় নি।

আকাশ পাতাল ভাবতে ভাবতে ঘড়ির দিকে তাকাবার কথা মনে পড়ে নি। হঠাৎ বেশ ক্ষিদে পেতেই ঘড়ির দিকে তাকিয়ে দেখি প্রায় একটা বাজে। তাড়াতাড়ি উঠে গেলাম। ফিরলাম প্রায় দুটো নাগাদ। ভাবলাম, একটু বিশ্রাম করেই বেরুব কিন্তু বিশ্রাম করতে গিয়েই ঘুমিয়ে পড়লাম।

হঠাৎ কার ডাকাডাকিতে যেন ঘুমটা ভেঙ্গে গেল কিন্তু এমনই ঘুমের ঘোর যে চোখ মেলে তাকাতে পারলাম না।

কী অদ্ভুত লোক আপনি ! আমি হাঁ করে আপনার পথ চেয়ে বসে আছি আর আপনি মহানন্দে ঘুমুচ্ছেন।

আমি চোখ মেলে দেখি ভারতী। মহা বিস্ময়ের সঙ্গে বললাম, আপনি !

আমি উঠে বসতেই উনি বললেন, এইভাবে দরজা খুলে কেউ ঘুমোয় ?

বেশ লজ্জিত হয়ে বললাম, একটু বিশ্রাম করতে গিয়ে ঘুমিয়ে পড়েছি।

খুব ভাল করেছেন। ওদিকে আমি হাঁ করে আপনার পথের দিকে তাকিয়ে বসে আছি আর এখানে আপনি দরজা খুলে ঘুমোচ্ছেন।

এখন কটা বাজে ?

প্রায় পাঁচটা।

পাঁচটা ?

আজ্ঞে হ্যাঁ।

এ ঘরে কোন চেয়ার টেবিল নেই। সামনের খালি তক্তাপোষ দেখিয়ে বললাম, বসুন।

যাক তবুও বসতে বললেন।

আপনি কতক্ষণ এসেছেন ?

মিনিট কুড়িক।

এতক্ষণ ডাকেন নি কেন ?

প্রথমে আপনার ঘরে ঢুকেই ত আমি ঘাবড়ে গিয়েছিলাম।

কেন ?

মুখ টিপে হাসতে হাসতে উনি জিজ্ঞাসা করলেন, মণিকা কে ?

ওঁর মুখে মণিকার নাম শুনেই যেন আমার হৃৎপিণ্ডের স্পন্দন থমকে দাঁড়াল। কোনমতে জিজ্ঞাসা করলাম, কেন বলুন তো ?

আগে আমার কথার জবাব দিন।

আমি ওঁর মুখের দিকে চেয়ে আছি কিন্তু মুখে কিছু বলছি না দেখে ভারতী বললেন, আপনি ঘুমিয়ে ঘুমিয়ে অনর্গল কথা বলে যান।

কি বলছিলাম ?

অত কথা বলা যায় না।

একটু শুনি।

মণিকা নিশ্চয়ই আপনার টেলিফোন-বান্ধবী ?

বান্ধবী নয়, পরিচিতা।

উনি খুব ভাল গান করেন ?

হ্যাঁ।

আর রাণীদি কে ?

উনিও টেলিফোনের। রাণীদি আর আরেক দিদি আমার এই ঘরেই ছিলেন।

ওরা কখন চলে গেলেন ?

আজ সকালে। একটু চুপ করে থাকার পর জিজ্ঞাসা করলাম, আর কার কথা বলছিলাম ?

বলব না।

সেটা অন্যায়।

অন্যায় কেন ?

আপনি আমার ঘরে এসে আমার কথা শুনেও আমাকেই বললেন না ?

না।

কিন্তু কেন ?

বলার অসুবিধে আছে।

কী অসুবিধে ?

ব্যক্তিগত।

কেন ? আমি কি আপনাকে নিয়ে কিছু বলছিলাম ?

কেন, আপনি কি আমার কথা ভাবছিলেন ?

ভাবছিলাম কী অদ্ভুতভাবে আমাদের দেখা হল।

আর ?

এবার আমি হাসতে হাসতে বললাম, ব্যক্তিগত অসুবিধা আছে।

আমার কথায় উনিও হাসলেন।

এবার আমি বললাম, একটু বসুন। দুটো চায়ের ব্যবস্থা করি।

চলুন, বেরিয়ে চা খাওয়া যাবে।

একটু পরে বেরুব। ব্যস্ত কী ? আমি নিজেই নীচে গিয়ে দুটো চা আর

কিছু খাবারের অর্ডার দিয়ে এলাম।

আমি বিছানায় উঠে কনুইয়ের তলায় বালিশ দিয়ে কাত হয়ে বসতেই ভারতী বললেন, আপনি বেড়াতে এসেছেন নাকি আড্ডা দিতে এসেছেন ?

কেন ? একটু গল্প-গুজব করতে কি আপনার আপত্তি আছে ?

আমি একলা একলা থাকি বলে গল্প-গুজব করতে ভালই লাগে কিন্তু আপনার ত···

আচ্ছা আপনি এত দূরে চাকরি নিলেন কেন ?

প্রায় একই সঙ্গে তেজপুরের একটা কলেজে আর এখানে চাকরি পেলাম। মনে হল এটাই ভাল।

উদয়পুরে নিশ্চয় আপনার কোন বন্ধু-বান্ধব নেই ?

না।

তাহলে সারাদিন কাটান কিভাবে ?

ভারতী একটু ম্লান হেসে বললেন, কোন মতে কাটিয়ে দিই।

ওখানে কোন বাঙ্গালী পরিবারের সঙ্গে আলাপ হয় নি ?

মেডিক্যাল কলেজের এক ডাক্তার আর তাঁর স্ত্রীর সঙ্গে আলাপ হয়েছে কিন্তু ওঁরা অনেক দূরে থাকেন।

তাহলে বিয়ে করুন।

উনি হাসতে হাসতে বললেন, আমিও তাই ভাবছি।

চা আর সামান্য কিছু নোনতা খাবার এলো। চা আর খাবার খেতে খেতে জিজ্ঞাসা করলাম, আমার দেরি দেখে আপনি কী ভাবলেন ?

ভাবলাম, হয়ত কালকের কোন ব্যাপারে রাগ করেছেন বলে আসছেন না।

আর কিছু ভাবতে পারলেন না ?

আরো অনেক কিছু ভাবছিলাম।

তাহলে এখানে এলেন কেন ?

ভাবলাম, একবার দেখেই যাই।

যাক আপনি এসেছেন বলে আমি খুব খুশী।

কেন ?

এক অফিসে চাকরী করেও যাঁর সঙ্গে পাঁচ মিনিট কথা বলার সুযোগ পাই নি···

আমি ত কথা বলতে বারণ করি নি।

তা ঠিক কিন্তু অসুবিধা ছিল নিশ্চয়ই।

বেরুবেন না ?

কোথায় যাবেন ?

আগে বেরিয়ে পড়ি তারপর দেখা যাবে।

খাজা সাহেবের দরগায় যাবেন না ?

আপনার আপত্তি না থাকলেই যাব।

অত বড় একটা তীর্থক্ষেত্রে যেতে আমার আপত্তি হবে কেন ?

তাহলে নিশ্চয় যাব।

জানেন তো, খাজা সাহেবের কাছে মনপ্রাণ দিয়ে কিছু চাইলে কেউ ব্যর্থ হয় না।

সত্যি ?

হ্যাঁ সত্যি। আমি নিজেই তার প্রমাণ পেয়েছি।

আপনি নিজে প্রমাণ পেয়েছেন ?

পেয়েছি।

কী চেয়েছিলেন আর কী পেয়েছেন ?

তা বলব না।

কেন, আপত্তি আছে ?

ভারতী একটু হেসে বললেন, ঠিক আপত্তি নেই, তবে এখন বলা ঠিক হবে না।

আর বিশেষ কথাবার্তা না বলে দুজনেই বেরিয়ে পড়লাম। কিছুদূর এগিয়েই একটা দোকানের সামনে গিয়ে ভারতী বললেন, দাঁড়ান। লস্যি খাওয়া যাক।

একটু পরেই দোকানের একটি ছেলে আমাদের দুজনের হাতে দু-গেলাস লস্যি দিয়ে গেল। লস্যির গেলাসে প্রথম চুমুক দিয়েই ভারতী মুখের মধ্যে কয়েক টুকরো বরফ নিয়ে খেতে শুরু করলেন।

আমি বললাম, এইসব বরফ খাবেন না।

কেন ?

কোল্ড-ষ্টোরেজের বরফ অত্যন্ত নোংরা হয়।

কিন্তু কাঁচা বরফ কামড়ে কামড়ে খেতে আমার খুব ভাল লাগে।

ভাল লাগলেও খাবেন না।

উনি আর কোন কথা না বলে টুকরোগুলো মুখ থেকে ফেলে দিলেন।

আমি খুশী হয়ে বললাম, এত সহজে আমার কথা মেনে নিলেন ?

আপনি ত আমার শত্রু নন। আপনার কথা শুনব না কেন ?

কিন্তু আমি আপনার শুভাকাঙ্ক্ষী ?

তাই ত মনে হয়।

এবার দুজনেই একটা সাইকেল রিকশায় উঠলাম। ভারতী রিক্‌শা-ওয়ালকে বললেন, আড়াই দিন কা ঝোপড়ী।

আমি জিজ্ঞাসা করলাম, ওটা কোথায় ?

খাজা সাহেবের দরগার একটু আগে।

ওটা ত মসজিদ ?

হ্যাঁ।

তবে ওর নাম ওরকম কেন ?

আগে ওটা সংস্কৃত কলেজ ও মন্দির ছিল। তারপর মহম্মদ ঘোরী আড়াই দিনের মধ্যে ওটাকে মসজিদ করে ফেলেন বলে ওর নাম আড়াই দিন কা ঝোপড়ী।

আপনি দেখছি এদিককার বেশ খবর রাখেন।

এর আগে একবার এসেছিলাম বলেই জানি।

এর আগেও কি সেমিনারেই এসেছিলেন ?

না। সেবার বেড়াতেই এসেছিলাম।

কাজীসাহেবের সঙ্গে কি সেবারই পরিচয় হয় ?

হ্যাঁ।

কাজীসাহেব লোকটি বেশ ভাল।

আমার তো খুব ভাল লাগে। একটু থেমেই ভারতী বললেন, আজমীর আসা সম্পর্কে কাজীসাহেব কি বলেন জানেন ?

কি ?

বলেন—ইরাদে রোজ বনতে হে
টুট যাহে হে
ওহি আজমীর আতা হ্যায়
যিসসে খাজা বুলাতে হ্যায়।

আমি একটু অবাক হয়ে বললাম, খাজা সাহেব না ডাকলে আজমীর আসা হয় না ?

না। ভারতী কি যেন একটু ভাবলেন। তারপর বললেন, বোধহয় কথাটা ঠিক।

সাইকেল রিক্‌শা দিল্লী গেট আর দরগা বাজার ছাড়িয়ে লাখন কোটরীর সামনে দিয়ে খাজা সাহেবের দরগার সামনে পেঁাছেই ডান দিকে ঘুরল। একটু এগিয়েই আড়াই দিন কা ঝোপড়ী।

রিক্‌শার ভাড়া দিয়ে উঁচু উঁচু অনেকগুলো সিঁড়ি ভেঙ্গে উপরে উঠলাম। টুরিষ্ট লিটারেচারের পাতায় এই আড়াই দিন কা ঝোপড়ী নিয়ে অনেক কিছু লেখা থাকলেও দর্শনার্থীর ভিড় চোখে পড়ল না। একদল ছোট ছোট ছেলে-মেয়ে খেলাধুলা করছে। জুতা খুলে মসজিদে ঢুকলাম। সামনের ফটকে আরবিতে কোরানের অংশ বিশেষ খোদাই করা থাকলেও ভিতরের কাজকর্ম দেখে বুঝতে কষ্ট হয় না, এটা এককালে মন্দির ও সংস্কৃত চর্চার পীঠস্থান ছিল। বহু দেবদেবীর মূর্তি ছাড়াও সর্বত্রই পদ্ম খোদাই করা।

বাইরে বেরিয়ে আসার সময় সিঁড়ি দিয়ে দু-এক ধাপ নীচে নামতেই একজন ভিখারী হাত বাড়িয়ে ভিক্ষা চাইল। আমি ভিক্ষা না দিয়ে বাংলায় জিজ্ঞাসা করলাম, আপনি কি বাঙ্গালী ?

উনি হেসে বললেন, হ্যাঁ।

দেশ কোথায় ?

কলকাতায়।

কথা শুনে মনে হয় পূর্ববঙ্গের বাসিন্দা।

ঠিক ধরেছেন। তবে পালিয়ে এসেছি। কিছুকাল কলকাতায় কাটিয়ে এখন এখানেই থাকি।

এইভাবে ভিক্ষা করে কী দিন চলে ?

খাজা সাহেবের দরগায় দুবেলা দু' মুঠো অন্ন পাই। তাছাড়া আপনাদের মতো লোকজনের কাছ থেকে যা পাই তা দিয়ে বেশ চলে যাচ্ছে।

আমি পার্স থেকে দু টাকার একটা নোট বের করে ওর হাতে দিয়ে বললাম, চলি। আবার দেখা হবে।

একটা অদ্ভুত আনন্দে, খুশীতে এই দীন-দরিদ্র ভিখারীর ম্লান মুখখানা হঠাৎ ভোরের সূর্যের মতো উজ্জ্বল হয়ে উঠল। চোখ দুটো ছল ছল করে উঠল। আমি একবার ওর চোখের দিকে তাকিয়েই দৃষ্টি গুটিয়ে সিঁড়ি দিয়ে নীচে নামতে শুরু করলাম। বোধহয় মুহূর্তের জন্য আনমনা হয়ে পড়েছিলাম। হঠাৎ কানে এল, খাজা সাহেব আপনাকে আর ভাবীকে নিশ্চয়ই সুখী করবেন।

মনে হল একবার পিছন ফিরে তাকাই কিন্তু পারলাম না। লজ্জায় ও দ্বিধায় আপন মনে এগিয়ে চললাম। ভারতী বললেন, একটু দাঁড়ান। ঐ লোকটা খোঁড়াতে খোঁড়াতে ছুটে আসছে।

এবার দাঁড়াতেই হল।

একটু পরে ভিখারীটি আমাদের সামনে এসে জিজ্ঞাসা করল, খাজা সাহেবের দরগায় গিয়েছেন ?

ভারতী বললেন, কালকে গিয়েছিলাম। আজ আবার যাচ্ছি।

আমি এই কথা জিজ্ঞাসা করার জন্যই ছুটে এলাম।

আমি চুপ করে দাঁড়িয়েই রইলাম।

ভারতী বললেন, আচ্ছা ভাই, চলি।

যান ভাবী যান। আপনাদের আর আটকাব না।

কোন কথা না বলে আমরা দুজনে নিঃশব্দে খাজা সাহেবের দরগায় গেলাম। আমি শ্বেত পাথরের চত্বরে দাঁড়িয়ে রইলাম। ভারতী কাজীসাহেবকে খুঁজতে গেলেন।

আমি দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে এদিক-ওদিক দেখছি। হঠাৎ কাজীসাহেব আমার সামনে এসে বললেন, আপনি একলা একলা এখানে কেন ?

ভারতী ত আপনাকে খুঁজতেই গিয়েছে।

একটু কথাবার্তা বলতে না বলতেই ভারতী এলেন।

ওঁকে দেখেই কাজীসাহেব হাসতে হাসতে বললেন, দেখেছেন, খাজা সাহেব আমাকে ঠিক সময় আপনার মালিকের কাছে পাঠিয়ে দিয়েছেন।

ভারতী সঙ্গে সঙ্গে প্রশ্ন করলেন, আপনি কি করে বুঝলেন, ইনিই আমার মালিক ?

কাজীসাহেব মুহূর্তের জন্য চোখ বন্ধ করে একটু হাসলেন। তারপর বললেন, সারাটা জীবন খাজা সাহেবের দরগায় প্রার্থনা করেই কাটিয়ে দিলাম। এটুকু সত্য উপলব্ধি করার ক্ষমতা খাজা সাহেব নিশ্চয়ই আমাকে দিয়েছেন।

॥ তিন ॥

সকাল সাড়ে সাতটায় প্যাসেঞ্জার ট্রেনে দুজনে চিতোর যাচ্ছি। দুজনেই জানলার ধারে মুখোমুখি বসেছি কিন্তু দুজনেই বাইরের দিকে চেয়ে আছি। কেউই কোন কথা বলছি না। দূরের আকাশ, কাছের মানুষ দেখছি। দু একটা ছোট ষ্টেশনও পার হয়ে গেল। আমি মাথা কাত করে বসে থাকতে থাকতে কখন যে তন্দ্রাচ্ছন্ন হয়ে পড়েছি, বুঝতে পারি নি। কে যেন আমার গায়ে হাত দিয়ে জাগিয়ে দিলেন।

গোটা চারেক বিস্কুট, একটা কলা আর একটা আপেল আমার দিকে এগিয়ে দিয়ে ভারতী বললেন, এই নিন।

আমি অবাক হয়ে বললাম, এত কে খাবে ?

তর্ক না করে খেয়ে নিন।

তন্দ্রার ভাব ভালভাবে কেটে যেতেই হাসতে হাসতে জিজ্ঞাসা করলাম, তর্ক করব না কেন ?

খাজা সাহেব রাগ করবেন।

কথাটা বলেই উনি হেসে উঠলেন। আমিও না হেসে পারলাম না।

হাসি থামলে জিজ্ঞাসা করলাম, দুপুরের রান্না কি চিতোর পেঁছে করবেন ?

উনি আমার দিকে তাকিয়ে চাপা হাসি হাসতে হাসতে জিজ্ঞাসা করলেন, আমাকে আর কী করতে হবে ?

সব কিছু।

সব কিছু মানে ?

মানে আমার মত অপদার্থকে নিয়ে পথ চলতে হলে যা যা করতে হয়।

আপনি কী আমার ভরসায় দেশ ঘুরতে বেরিয়েছেন ?

না।

তবে ?

আমি হঠাৎ গম্ভীর হয়ে ওঁর দিকে তাকিয়ে জিজ্ঞাসা করলাম, সত্যি বলুন ত কেন এমন হঠাৎ আমাদের দেখা হল ? কেন কাজীসাহেব বার বার ওকথা বললেন ?

আপনার দুর্ভাগ্য।

না না, দুর্ভাগ্য কেন হবে, কিন্তু…

আমি লজ্জায়, দ্বিধায় কথাটা শেষ করতে পারি না।

ভারতী জিজ্ঞাসা করলেন, কিন্তু কী ?

কিন্তু তা কি সম্ভব ?

কি সম্ভব ?

কাজীসাহেবের কথা কি সত্য হতে পারে ?

এ সংসারে সবই সম্ভব।

এমন কী কাজীসাহেব যা বলেছেন, তাও সম্ভব হতে পারে ?

স্নিগ্ধ, শান্ত দৃষ্টিতে উনি আমার দিকে তাকিয়ে শুধু একটু মাথা নাড়লেন।

আমি বিস্ময়ে ওর দিকে তাকিয়ে জিজ্ঞাসা করলাম, জীবনের এত গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপার এত সহজে আপনি মেনে নিতে পারবেন ?

মানুষের জীবন বড় বিচিত্র। জীবনের ছোটখাট প্রশ্নের সমাধান খুঁজতে আমরা অনেকেই হিমশিম খেয়ে গেলেও অনেক বড় বড় সমস্যা অত্যন্ত সহজে মিটে যায়।

আমি চুপ করে ভাবি। কোন কথা বলি না।

একটু পরে ভারতী বললেন, আমার বেশ ক্ষিদে লেগেছে, কিন্তু আপনার জন্য খেতে পারছি না।

কেন ?

আপনি না খেলে আমি খাই কেমন করে ?

একটা বিস্কুট খেয়েই আমি প্রশ্ন করলাম, এত খাবার দাবার আনলেন কেন ?

জানতাম আপনার ভরসায় থাকলে কপালে বিশেষ কিছু জুটবে না।

যাক, তাহলে আপনি আমাকে ঠিকই চিনেছেন।

দুজনেই একটু হাসি।

কিছুক্ষণ পর গুলাবপুরায় গাড়ী থামতেই দু ভাঁড় চা কিনলাম। চা খেতে খেতেই ভারতী জিজ্ঞাসা করলেন, আপনি কী ডায়েরী লেখেন ?

না। আপনি লেখেন বুঝি ?

হ্যাঁ।

বরাবর ?

কলেজে ভর্তি হবার পর থেকে লিখছি।

রোজ লেখেন ?

ডায়েরী তো রোজই লিখতে হয়।

আজমীরে এসেও লিখেছেন ?

লিখব না কেন ?

তাহলে ত আমাকে ডুবিয়েছেন।

কিভাবে ?

আজমীরে এসেও যখন ডায়েরী লিখেছেন তখন আমার বিষয়ে নিশ্চয়ই যা-তা লিখেছেন।

আপনার বিষয়ে আমি কিচ্ছু লিখি নি।

তা হতেই পারে না।

আমি বলছি লিখি নি, তবু আপনি জোর করবেন ?

আপনার মুখের দিকে তাকিয়ে বেশ বুঝতে পারছি, আপনি সত্যি কথা বলছেন না।

চাপা হাসি হাসতে উনি মাথা নেড়ে বললেন, সত্যি আপনার বিষয়ে কিছু লিখিনি।

আমাকে ছুঁয়ে বলুন।

আমি কাউকে ছুঁয়ে প্রতিজ্ঞা করি না।

কারুর সঙ্গে আমার তুলনা হয় না।

কেন?

কথায় কথায় কাজীসাহেবকে টেনে আনা কি ঠিক হবে?

কেউ আপনাকে টেনে আনতে বলছে না।

প্যাসেঞ্জার ট্রেন তার স্বভাবমত চলছে, থামছে। যাত্রী উঠছে, নামছে। আমাদের আশেপাশের যাত্রীরা অবাক হয়ে আমাদের দেখছেন ও কথা শুনছেন। সহজ, সরল গ্রাম্য মানুষ ওরা। বেশ বুঝতে পারছি ওদের দু'চারজন আমাদের নিয়েই আলোচনা করছেন। কখনও কখনও ওরা আমাদের দেখে বা কথাবার্তা শুনে একটু হাসাহাসিও করছেন।

আরো দু একটা ষ্টেশন পার হবার পর আমি বললাম, রাত সাড়ে দশটা পর্যন্ত এইভাবে প্যাসেঞ্জার ট্রেনে থাকলে আমি বোধহয় পাগল হয়ে যাব।

তাহলে চলুন চিতোর থেকে বাসে যাই।

তার চাইতে আজ আমরা চিতোরে থেকে যাই। কাল সকালে চিতোর ফোর্ট-টোর্ট দেখে একটু বিশ্রাম করে সন্ধ্যের দিকে উদয়পুর রওনা হবো।

কিন্তু...

কিন্তু করার কোন কারণ নেই। আমরা দুজনে দু ঘরে থাকব।

ভারতী হাসতে হাসতে আমার দিকে তাকিয়ে বললেন, সে ত থাকবই।

তাহলে, আমরা চিতোরে নামছি।

দু-এক মিনিট পরে উনি বললেন, আমি বরং আজই চলে যাই। আপনি কাল রাত্রে উদয়পুর আসুন। আমি পরশু সকালেই আপনার সঙ্গে দেখা করব।

মনে মনে একটু আহত হলেও বললাম, ঠিক আছে।

চিতোর পেঁছিবার আগেই ভারতী বললেন, টুরিষ্ট বাংলোয় থাকবেন। বেশ পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন আছে। তাছাড়া চার্জও বেশী নয়।

আচ্ছা।

আমি কী আপনার জন্য উদয়পুরেও টুরিষ্ট বাংলো বুক করে রাখব?

তা রাখলে ভালোই হয়।

আপনি তাহলে কাল রাত্রে ষ্টেশন বা বাস ষ্ট্যান্ড থেকে সোজা টুরিষ্ট বাংলোয় চলে যাবেন।

আমি মাথা নেড়ে সম্মতি জানালাম।

চিতোরে ট্রেন পেঁছিবার সঙ্গে সঙ্গেই ভারতী বললেন, একটা রিক্‌শা বা

টাঙ্গা নিয়ে চলে যান। স্নান, খাওয়া-দাওয়া করে একটু বিশ্রাম করুন।

আপনি ?

আমার জন্য চিন্তা করবেন না। আমি লেডিজ ওয়েটিং রুমে স্নান করে খেয়েদেয়ে বিশ্রাম করব।

সত্যি আমি আর দেরী করলাম না। ষ্টেশন থেকে বেরিয়েই একটা টাঙ্গা নিয়ে টুরিষ্ট বাংলো গেলাম। ঘর পেতে কোন অসুবিধা হলো না। স্নান করলাম। ডাইনিং রুমে গিয়ে খেলাম। বেয়ারাকে পয়সা দেবার সময়ই ডাইনিং রুমের দেয়াল ঘড়িতে ঢং ঢং করে তিনটে বাজল। ভারতীর ট্রেন ছাড়তে এখনও পঞ্চান্ন মিনিট বাকি।

ডাইনিং রুম থেকে নিজের ঘরে ফিরলাম না। বোধহয় ফিরতে পারলাম না। টুরিষ্ট বাংলো থেকে বেরিয়েই একটা টাঙ্গায় চড়ে বললাম, জলদি ষ্টেশন চলিয়ে।

মিনিট পনের-কুড়ির মধ্যেই ষ্টেশনে পেঁছেই উদয়পুর প্যাসেঞ্জার ট্রেনের সামনে একটু ঘোরাঘুরি করতে না করতেই ভারতী একটা কম্পার্টমেণ্টের ভেতর থেকে বেশ জোরেই ডাকলেন অজয়বাবু।

আমি থমকে দাঁড়াতেই উনি প্ল্যাটফর্মে নেমে এসে বেশ বিস্ময়ের সঙ্গে জিজ্ঞাসা করলেন, কী ব্যাপার ? আপনি আবার ষ্টেশনে এলেন কেন ?

ভেবেছিলাম বলব, আপনি যাবেন না। কাল একসঙ্গে ফিরবো কিন্তু পারলাম না। একটু ম্লান হেসে বললাম, এমনি এলাম।

ভারতী একটু হেসে জিজ্ঞাসা করলেন, আপনি কি আমাকে নামিয়ে নিতে এসেছেন ?

আমি একটু উত্তেজিত হয়ে জিজ্ঞাসা করলাম, আপনি নামবেন।

তখন ওঁর মুখে হাসি। বললেন, আমি জানতাম না আপনি এত ছেলেমানুষী করবেন।

তার মানে ?

এত বীরত্ব দেখিয়ে চলে যাবার পর যখন আবার ষ্টেশনে এসেছেন তখন বোধহয় আমার আজ না যাওয়াই উচিত, তাই না ?

আমি হেসে বললাম, সেটা আপনার বিবেচনার বিষয়। তবে আমি একটা কথা জানাতে এসেছি।

বলুন।

কাজীসাহেবের কথা কী সত্যি হবে ?

নিশ্চয়ই হবে।

আমি আনন্দে, উত্তেজনায় ওর দুটি হাত ধরে বললাম, তাহলে আজ তুমি যাবে না।

ভারতী গম্ভীর হয়ে আমার দিকে তাকিয়েই জিজ্ঞাসা করলেন, হঠাৎ কোন মোহের ঘোরে বা উত্তেজনায় আমাকে এ অনুরোধ করছেন না ত ?

না।

ঠিক ত ?

হ্যাঁ।

তাহলে থেকে যাব ?

হ্যাঁ।

ভারতীর ঘরে বসে চা খাচ্ছিলাম। চা খাওয়া শেষ হবার পরই ও বললো, এবার যে আজমীরে একটা কিছু ঘটবে, তা আমি জানতাম।

কেমন করে ?

প্রায় সারাটা জীবনই একলা একলা কাটালাম। আর যেন ভাল লাগছিল না। এর আগেরবার খাজা সাহেবের কাছে তাই বলেছিলাম...

কী বলেছিলে।

বলেছিলাম এই নিঃসঙ্গতা ঘোচাবার জন্য।

তাই জানতে এবারে আমার দেখা পাবে ?

না, তা জানতাম না। তবে কেন জানি না মনে মনে বিশ্বাস ছিল, এবার খাজা সাহেব আমাকে খালি হাতে ফিরিয়ে দেবেন না।

আমি একটু হাসি।

তাই তো মেয়ো কলেজের মধ্যে আপনাকে দেখেই...

আপনাকে না, তোমাকে।

চমকে উঠেছিলাম।

কাকে দেখে ?

এরকম জোর করা ঠিক না।

আমি ত জোর করছি না। শুধু জানতে চাইছি কাকে দেখে চমকে উঠেছিলে ?

অজয় চৌধুরীকে দেখে।

দুজনেই হেসে উঠি।

হাসি থামলে আমি বললাম, তোমাকে প্রথম দিন আমাদের অফিসে দেখেই আমার খুব ভাল লেগেছিল।

কিন্তু কোনদিন ত কিছু বলেননি।

সাহস হয় নি।

কেন ?

তোমার মত সুন্দরী উচ্চশিক্ষিত মেয়েকে আমার ভাল লাগার অধিকার থাকতে পারে বলে ভাবতে পারি নি।

আপনি বুঝি খুব কুৎসিত ও অশিক্ষিত ?

কুৎসিত বা অশিক্ষিত না হলেও খাজা সাহেবের দয়া ছাড়া তোমাকে পেতাম না।

এখন ত পেয়েছেন ?

পেয়েছি ? তাহলে রাত্রে আমাকে তোমার ঘর থেকে যেতে বলো না।

এমন অন্যায় কথা কি আমি বলতে পারি ?

আবার হাসি।

তারপর ভারতী বললো, আর ঘরের মধ্যে বসে থাকতে ভাল লাগছে না। স্নান করে চলুন একটু ঘুরে আসি।

এখানে ফোর্ট ছাড়া ত কিছু দেখার নেই।

এমনি শহরের মধ্যে ঘুরব।

ঠিক আছে।

তাহলে আর বসবেন না। উঠুন। আমি একটু ভাল করে স্নান করি।

উঠলাম। নিজের ঘরে এলাম। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে স্নান করতে গেলাম না। সেই সাতসকালে উঠে তৈরী হয়ে পৌনে সাতটায় স্টেশন পৌঁছেছি তারপর ঐ প্যাসেঞ্জার ট্রেন। চিতোর এসেও একটুও বিশ্রাম হয়নি। তাই নিজের ঘরে এসেই দশ-পনের মিনিটের জন্য হাত-পা ছড়িয়ে শুয়ে পড়লাম। বোধহয় মিনিট-খানেকও জেগে ছিলাম না। প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই ঘুমিয়ে পড়েছি।

ঘুম ভাঙ্গতেই দেখি ভারতী আমার বিছানার পাশে দাঁড়িয়ে হাসছে। আমি কিছু বলার আগেই ও জিজ্ঞাসা করল, ঘুম ভাঙ্গল?

কটা বাজে?

ভারতী ঘড়ি দেখে বললো, ন'টা চল্লিশ।

এত রাত হয়েছে?

কিছুক্ষণ আমার দিকে তাকিয়ে থাকার পর ও হাসতে হাসতে বললো, খাজা সাহেব আমাকে ঠিক মানুষই জুটিয়ে দিয়েছেন।

আমি হাসতে হাসতে জিজ্ঞাসা করলাম, হঠাৎ একথা বলছ কেন?

নিশ্চয়ই কারণ আছে?

সেই কারণটাই ত জানতে চাইছি।

যে লোকটা ঘুমিয়ে ঘুমিয়েও আমাকে এমন করে চায় সে···

আমি ঘুমিয়ে ঘুমিয়ে কি বলছিলাম?

বহু মানুষ জেগে জেগে যা ভাবে কিন্তু বলতে পারে না, ঘুমিয়ে ঘুমিয়ে তাই বলে।

কি বলেছিলাম, তাই বল।

বলব না।

কেন?

বলতে পারব না।

এমনই কথা বলছিলাম, যা বলা যায় না?

সেরকম কিছু না হলেও বলতে পারব না। ভারতী নীচু হয়ে আমার কানে কানে বললো, আমি আর আপনি বলব না।

আমি সঙ্গে সঙ্গে দু'হাত দিয়ে ওর গলা জড়িয়ে ধরে বললাম, তাহলে ত তোমাকে কিছু পুরস্কার দিতেই হয়।

ভারতী তাড়াতাড়ি নিজেকে মুক্ত করে নিয়ে বললো, অসভ্যতা করলেই মার খাবে।

আমি বিছানায় উঠে বসে বললাম, আর তোমার রেহাই নেই।

আমি যেন খোকার হাতের মোয়া।

খোকার হাতের মোয়া হবে কেন ? অজয় চৌধুরীর হাতের মোয়া।

অসভ্যতা না করে তাড়াতাড়ি স্নান করে জামাকাপড় বদলে নাও। এর পর ক্যান্টিন বন্ধ হয়ে যাবে।

ক্যান্টিন কটায় বন্ধ হয় ?

সাড়ে দশটায়।

তাহলে ত খাওয়া-দাওয়া না সেরে তোমাকে পুরস্কার দিতে পারছি না।

খাওয়া-দাওয়ার পরও তোমাকে পুরস্কার দিতে হবে না।

আমার নৈতিক দায়িত্ব আমাকে পালন করতেই হবে।

কোন প্রয়োজন নেই।

প্রয়োজনের সঙ্গে নৈতিক দায়িত্বের কোন সম্পর্ক নেই। এবার হাত দিয়ে আমার সুটকেসটা দেখিয়ে বললাম সুটকেস থেকে আমাকে পায়জামা-পাঞ্জাবি আন্ডারওয়ার-গেঞ্জি দাও ত।

আমি দেব ?

তুমি ছাড়া আর কাকে বলব ?

সুটকেসের চাবি কোথায় ?

আমার মন, প্রাণ, সুটকেস—সবকিছুই খোলা। তা না হলে খাজা সাহেব···

থাক, আর নিজের প্রশংসা করতে হবে না।

ভারতী আমাকে আন্ডারওয়ার-গেঞ্জি পায়জামা-পাঞ্জাবি দিতেই বললাম, তুমি ক্যান্টিনে বলে দাও আমাদের খাবার এখানে দিতে।

বাথরুমে স্নান সেরে ধোপাবাড়ীর পায়জামা পরতে গিয়েই দেখি দড়ি নেই। বাথরুমের দরজা একটু ফাঁক করে ডাকলাম, ভারতী, শুনে যাও।

ভারতী বললো, বাথরুমে আবার কি হল ?

দরজার ফাঁক দিয়ে পায়জামাটা বের করে ওর হাতে দিয়ে বললাম, আমার ময়লা পায়জামার দড়িটা এই পায়জামায় ভরে দাও।

দু-এক মিনিট পরেই বাথরুমের দরজায় ঠক্-ঠক্ আওয়াজ হতেই হাত বাড়িয়ে নিলাম।

বাথরুম থেকে বেরিয়ে আসতেই ভারতী জিজ্ঞাসা করল, কলকাতায় কি মণিকা পায়জামায় দড়ি ভরে দেবে ?

আমি ড্রেসিং টেবিলের সামনে দাঁড়িয়ে চুল আঁচড়াতে আঁচড়াতে বললাম, তুমি সত্যিই আমাকে ভালবেসেছ।

কিভাবে বুঝলে ?

আমাকে ভাল না বাসলে মণিকার উপর এরকম ঈর্ষা হতো না।

আমি মণিকাকে একটুও ঈর্ষা করছি না।

যাই হোক, আমি ওর প্রেমে পড়িনি ওর গান আমার ভাল লেগেছে।

মণিকাকে দেখতেও ভারী সুন্দর।

নিশ্চয়ই সুন্দর তবে তুমি আরো অনেক সুন্দর।

দু'জন বেয়ারা আমাদের খাবার আনতেই মণিকাকে নিয়ে আমাদের তর্ক এগুতে পারল না। সেণ্টার টেবিলে খাবার সাজিয়ে দিতেই আমি বললাম, এত কে খাবে।

তোমার সঙ্গে বন্ধুত্ব সম্ভব কিন্তু তোমাকে নিয়ে সংসার করতে পারব না।

কেন?

সামান্য খাওয়া-দাওয়ার ব্যাপারে যে আমাকে স্বাধীনতা দেবে না, তার সঙ্গে সংসার করা অসম্ভব।

কোন কথা না বলে ভারতী যা দিল, তাই খেয়ে নিলাম। তারপর বললাম, এবার একটা অনুরোধ করব।

বলো।

কাল আমি উপবাস করব।

ও হাসতে হাসতে বললো, কেন? খুব বেশী খেয়েছ?

তোমার কথা মত যখন খেয়েছি তখন নিশ্চয়ই বেশী খাই নি।

কাল একাদশী বলে উপবাস করব।

ওর হাসি তখনও থামে নি। বললো, তোমার কাছে না হেরে উপায় নেই।

যাক নিশ্চিন্ত হলাম।

কেন?

এবার যে কোন দাবি করিই না কেন, তুমি প্রতিবাদ করবে না।

আজে-বাজে দাবী করলেই তোমাকে আমার খাজা সাহেবের দরগায় ফিরিয়ে দেব।

আজে-বাজে দাবী মানে?

আমি বলতে পারব না।

বেয়ারা এল। খাবার-দাবারের পাত্রগুলো ট্রেতে ওঠাতে ওঠাতে জিজ্ঞাসা করল, সকালে ক'টায় চা দেব?

ভারতী বললো, দু'ঘরেই সাড়ে ছ'টায় চা দিও।

আমি বললাম, অত ভোরে?

সাড়ে সাত-আটটার মধ্যে আমরা বেরব। বেয়ারা চলে যেতেই ভারতী বললো, আমি এবার শুতে যাচ্ছি। তুমিও শুয়ে পড়ো।

আমি ত এইমাত্র ঘুম থেকে উঠলাম। এখুনি শুয়ে কি করব?

আমি ত ঘুম থেকে উঠিনি। আমার ঘুম পাচ্ছে। আমি যাই।

আমি ওঁর আঁচলের কোণা ধরে বললাম, না, তুমি এখুনি যেতে পারবে না।

বিশ্বাস কর, আমি বেশী রাত পর্যন্ত জাগতে পারি না।

এখন ত পুরানো অভ্যাসগুলো ছাড়তে হবে।

কাল থেকে ছাড়ব। আজ যাই।

চিতোর!

চিতোরগড় !

নাম শুনেই যেন আমাদের মনে মনে কেমন একটা চাপা উত্তেজনা বোধ করি। ভারতবর্ষের বহু শহরে-নগরে, গ্রামে-গঞ্জে, পাহাড়ে-জঙ্গলে পাঁচ হাজার বছরের অসংখ্য স্মৃতি আজও অম্লান হয়ে দাঁড়িয়ে আছে। পুরানো দিনের রাজা-মহারাজার স্মৃতি দেখে আমরা মুগ্ধ হই, স্তম্ভিত হই শিল্প নৈপুণ্যের পরিচয় পেয়ে। চিতোরেও রাজা-মহারাজার প্রাসাদ আছে। রাণীর মহল আছে। টাকশাল-হাতিশাল আছে। অভাব নেই দেব-দেবীর মন্দিরের। আগ্রা ফোর্ট বা লালকেল্লায় যা নেই—সেই বিজয় স্তম্ভ ও কীর্তি স্তম্ভও চিতোরে আছে। আরো কত কি আছে, তার ঠিকঠিকানা নেই।

তা হোক। চিতোর শুধু প্রাসাদের জন্য বিখ্যাত নয়। এর বিচিত্র স্থাপত্য শিল্প বৈশিষ্ট্যের দাবী রাখলেও শতশত বছর ধরে লক্ষ-কোটি মানুষকে তা টেনে আনে নি। যা কিছু চোখে দেখা হাতে স্পর্শ করা যায়, শুধু তাই চিতোর, চিতোরগড় নয়। চিতোরে আরো কিছু আছে।

চিতোর একটা স্বপ্ন। অনেক সূক্ষ্ম অনুভূতির মাল্য। একটা অনন্য আদর্শের চিরন্তন প্রতীক্ষা।

আর ?

একটা অসমাপ্ত সাধনা।

আর ?

একটা বিচিত্র ব্যথা। কয়েক ফোঁটা চোখের জল।

কিছুক্ষণ ঘোরাঘুরির পর রাণা কুম্ভের প্রাসাদের নীচে একটু বসলাম। ভারতী পাশে বসল। আনমনা হয়ে উদাস দৃষ্টিতে এদিক-ওদিক দেখছিলাম। কিন্তু কোন কথা বলছিলাম না।

কিছুক্ষণ পরে ভারতী জিজ্ঞাসা করল, কী ভাবছ ?

অনেক কিছু।

অনেক কিছু মানে ?

এখানে বসে কত কি যে মনে পড়ছে, তা বলে শেষ করতে পারব না। সেই কবে কোন ছোটবেলায় ধাত্রী পান্নার কথা পড়েছিলাম তা মনে নেই। কিন্তু ধাত্রী পান্নাকে আজো ভুলতে পারি নি। কোনদিনই ভুলতে পারব না।

সত্যি ধাত্রী পান্নাকে কেউ কোনদিন ভুলতে পারব না।

সব ঐতিহাসিক কীর্তির সঙ্গেই রাজা-রাণীর কীর্তি জড়িয়ে আছে কিন্তু এখানে এসে রাজা-রাণীর সঙ্গে একই নিঃশ্বাসে ধাত্রী পান্নার কথা বলতেই হবে।

তা ত বটেই। ভারতী একটু থেমে বললো, এ দেশে কত শতশত রাজা-মহারাজা রাজত্ব করেছেন। তাদের সেবা করেছেন লক্ষ কোটি মানুষ কিন্তু কোথাও আর একটা পান্নার খবর কেউ জানাতে পারেন নি।

এসব চরিত্র ইতিহাসের স্ফুলিঙ্গ। এরা কখনই সব সময় সর্বত্র দেখা দেয় না।

দুজনে আবার চুপ করে বসে থাকি।

একটু পরে ভারতী বললো, পান্না না থাকলে আমরা রাণা প্রতাপকেও পেতাম না।

শুধু রাণা প্রতাপকেই নয়, যে ইতিহাসের জন্য আমরা সবাই চিতোর ছুটে আসি, সে ইতিহাসই সৃষ্টি হতো না।

আমরা আর বসে থাকি না। আবার টাঙ্গায় চড়ি। মীরাবাঈ আর কুম্ভ-শ্যামের মন্দিরের সামনে টাঙ্গা থামে। আমরা নামি।

মীরাবাঈ। ইতিহাসের একটি স্ফুলিঙ্গ। রূপ-যৌবন, সম্পদ-সম্ভোগ অগ্রাহ্য করে কৃষ্ণপ্রেমে বিভোর হয়েই জীবন কাটিয়ে দিলেন। যেন ভগবান বুদ্ধের মেবার সংস্করণ।

মন্দিরে কোন বিগ্রহ নেই। একজন অন্ধ গায়ক একটা ভাঙ্গা হারমোনিয়াম বাজিয়ে মীরার ভজন গাইছেন—বসো মেরে নৈনন মে নন্দলাল।

দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে গান শুনলাম দুজনে। গান শেষ হলে ভারতী ব্যাগ থেকে একটা টাকা বের করে ওর হাতে দিল। অন্ধ মানুষ। শুধু স্পর্শ, গন্ধ, শ্রবণ দ্বারাই এই পৃথিবীকে সে জানতে পারে। তাইতো সে সঙ্গে সঙ্গে বললো, মা, ভগবান তোমাকে সুখী করুন।

ভারতী কিছু বলে না।

অন্ধ গায়ক এবার প্রশ্ন করে, মা, তুমি একলা এসেছ ?

না।

বাবুজি এসেছেন ?

হ্যাঁ।

ছেলেমেয়েদের আন নি ?

ভারতী একবার আমার দিকে তাকিয়ে বললো, এখনো আমার ছেলেমেয়ে হবার সময় হয় নি।

ও। একটু থেমে আবার বললো, ভগবান, তোমাদের দুজনকে সুখী করুন।

মন্দির থেকে বেরুতে বেরুতে ভারতী বললো, এসব জায়গায় কত কম লোক আসে, তাই না ?

এখানে ত ক্যাবারেও নেই, স্মাগল্ড্ জিনিসপত্রও বিক্রী হয় না। লোকজন ত কম আসবেই।

এবার পদ্মিনীর প্রাসাদ দেখলাম। যে ছোট্ট ঘরে দাঁড়িয়ে আলাউদ্দীন খিলজি এই অসামান্যা রূপসীকে দেখেছিলেন, সেখানেও গেলাম। তারপর কালিকা মাতার মন্দির। দুজনে প্রণাম করলাম। টিকা পরলাম, নির্মাল্য আর চরণামৃত নিলাম।

সব শেষে জয়-জয়ন্ত।

ভারতীকে জিজ্ঞাসা করলাম, উপরে উঠবে ত ?

নিশ্চয়ই !

দুজনেই ভিতরে ঢুকলাম। আগে ভারতী, পিছনে আমি। সিঁড়িগুলো বেশ উঁচু উঁচু। বললাম, শাড়ী একটু উঠিয়ে সাবধানে উঠো।

ভারতী বললো, মাথা সামলে উঠো। নয়ত মাথায় গুঁতো লাগবে।

দুজনেই বেশ সাবধানে উঠছি। দেখছি ভিতরের কারুকার্য। কত অস্ত্রশস্ত্র দেবদেবীর মূর্তি ছাড়াও নানা গায়ক-গায়িকাকে বাদ্যযন্ত্র বাজাবার নিখুঁত পাথরের ছবি খোদা রয়েছে। বললাম, মালওয়ার সুলতানকে হারিয়ে রাণা কুম্ভ এই জয়স্তম্ভ তৈরী করেন কিন্তু এর সর্বাগ্রে কত শিল্পীর মূর্তি খোদাই করা দেখেছ ?

হ্যাঁ।

আমরা আরো খানিকটা উঠেছি। দুজনেই একটু হাঁপাচ্ছি।

একটু অন্যমনস্ক হয়ে মোড় ঘুরতে গিয়ে আমার মাথায় গুঁতো লাগল।

ইস্। ভারতী সঙ্গে সঙ্গে পিছন ফিরে বললো, কোথায় লাগল ?

হাত দিয়ে দেখালাম। মুখে কিছু বললাম না। মাথাটা ঝিমঝিম করছে। বসে পড়লাম।

ভারতী হাত দিয়ে মালিশ করতেই বললাম, দারুণ লাগছে।

এখন মালিশ না করলে পরে খুব বেশী ব্যথা হবে।

দু' এক মিনিট পরে বললাম, থাক। আর মালিশ করতে হবে না।

চল, নেমে যাই।

না না, নামব না।

আবার যদি মাথায় গুঁতো খাও ?

আবার মালিশ করবে।

একেবারে উপরে উঠে দুজনে চারদিক দেখছি। সমস্ত চিতোরগড় দেখতে পাচ্ছি। বললাম, ভারতী, এবার ঠিক ভাল করে চিতোর দেখা হল না। আরেকবার আমরা আসব।

আমার যখন ছুটি থাকবে, তখন এসো। দুজনে মিলে সমস্ত রাজপুতানা ঘুরব।

ঠিক ঘুরবে ?

নিশ্চয়ই ঘুরব।

সব জায়গায় ডবল-বেডের ঘর চাই।

শাখা-সিঁদুর দিলেই ডবল-বেডের ঘর পাবে।

এগ্রিড।

বিকেলের দিকে বাসে উদয়পুর রওনা হলাম। চিতোর থেকে রওনা হবার ঘণ্টাখানেকের মধ্যেই সন্ধ্যে হল। বিশেষ যাত্রী ছিল না বলে সামনের সীটে পা ছড়িয়ে কাত হয়ে বসলাম। মাঝে মাঝেই তন্দ্রাচ্ছন্ন হয়ে পড়ছিলাম। ছোটখাট শহরে বা বড় বড় গ্রামে বাস থামছে। কিছু যাত্রী ওঠানামা করছেন। কেউ কেউ ক্লান্তি আর পিপাসা দূর করার জন্য এক গেলাস আখের রস খাচ্ছেন। ড্রাইভার-সাহেব মৌজ করে একটা বিড়ি খান। আবার বাস ছাড়ে।

সাতটা, আটটা ন'টা বেজে গেল।

কণ্ডাকটরকে জিজ্ঞাসা করলাম, কটায় উদয়পুর পেঁাছবে ?

সাড়ে দশটা নাগাদ।

এবার ভারতীকে জিজ্ঞাসা করলাম, অত রাত্রে পেঁাছে কোথায় উঠব ?

টুরিস্ট বাংলোয়।

যদি জায়গা না পাই ?

ও হেসে বললো, চিতোর টুরিস্ট বাংলো থেকে খবর পাঠিয়ে দেবার ব্যবস্থা করেছি। তোমার চিন্তা করতে হবে না।

চিন্তা করব না ?

না। অন্তত উদয়পুরের ব্যাপারে তোমাকে কিছু ভাবতে হবে না।

আমি একটু হাসি আর কোন প্রশ্ন করি না।

একটু পরে ভারতী বললো, আমি তোমাকে টুরিস্ট বাংলোয় পেঁাছে দিয়ে হস্টেলে যাব। আবার কাল সকালে আসব।

তারপর ?

যদি দু-এক দিন ছুটির ব্যবস্থা করতে পারি তাহলে তোমার সঙ্গে ঘুরব।

যদি কোন কারণে ছুটি না পাও তাহলে রাত্রিটা আমরা একসঙ্গে কাটাব, কি বল ?

তুমি বুঝি বিয়ের আগেই ফুলশয্যাটা সেরে নিতে চাও ?

শুভ কাজে বিলম্ব করে কি লাভ ?

তুমিই বোধহয় কয়েক জন্ম আগে আলাউদ্দীন খিলজি ছিলে।

আর তুমি নিশ্চয়ই পদ্মিনী ছিলে !

উদয়পুর !

লক্ষ-কোটি মানুষের সুখ-দুঃখ, আশা-আকাঙ্ক্ষা, সাফল্য-ব্যর্থতা এক একটা শহরের ইতিহাসের সঙ্গে জড়িয়ে থাকে। এই পৃথিবীটাতেই···এমন কিছু শহর-নগর আছে যার সঙ্গে শুধু এক একটি মানুষের স্মৃতিই চিরকালের জন্য অম্লান হয়ে আছে। উদয়পুরের ইতিহাস দীর্ঘ ও ঘটনাবহুল। গুপ্ত সাম্রাজ্যের পতনের পর প্রায় দেড় হাজার বছর আগে গুহদত্ত নামে কোন এক অখ্যাত প্রধান আজকের উদয়পুরের পশ্চিমেই একটা ছোট রাজ্য প্রতিষ্ঠা করেন। তারপর থেকেই ঘটনার পর ঘটনা, যুদ্ধের পর যুদ্ধ। কিছু গ্লানির কাহিনীতে ভরা আছে ইতিহাসের পাতা। কত প্রাসাদ, দুর্গ, মন্দির তৈরী হয়েছে রাজাদের আনুকূল্যে, আবার আক্রমণকারীর প্রতিহিংসায় সে সব কীর্তি চিরদিনের মত হারিয়ে গেছে :

এই শত শত বছরের সুদীর্ঘ ঘটনাবহুল ইতিহাসকে ম্লান করে দিয়েছে একটি অনন্য চরিত্র—মহারাণা প্রতাপ !

ভারতবর্ষের মানুষের কাছে মেবারের ইতিহাস চিরকালের জন্য অম্লান থাকবে। এই অমর স্বাধীনতা-প্রেমী মহারাণা প্রতাপ আর পান্না, পদ্মিনী, মীরাবাঈ-এর জন্য। আর মনে থাকবে চৈতককে।

উদয়পুর থেকে বাসে নাথদ্বারা। সেখান থেকে তেরো-চৌদ্দ মাইল টাঙ্গায় যাবার পর হলদিঘাট পেঁাছলাম।

ভারতীকে জিজ্ঞাসা করলাম, এখানকার নাম হলদিঘাট কেন, বলতে পারো?

না।

এখানকার আরাবল্লীর পাথর গুঁড়ো করলে ঠিক হলুদের মত হয় বলে এখানকার নাম হলদিঘাট!

ভারতী সঙ্গে সঙ্গে নীচু হয়ে এক মুঠো মাটি হাতে তুলে নিয়ে ভাল করে দেখে বললো, ঠিকই বলেছ।

কিছুক্ষণ এদিক-ওদিক ঘোরাঘুরির পর চৈতকের স্মৃতিস্তম্ভের সামনে হাজির হলাম। দুজনেই চুপ করে কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে রইলাম।

ভারতী বললো, কত রাজা মহারাজার কাহিনী ইতিহাস থেকে মুছে গেছে কিন্তু সামান্য একটা ঘোড়া প্রভুভক্তির জন্য চিরকালের জন্য অমর হয়ে আছে।

আমি বললাম, ভারতবর্ষের ইতিহাসের পাতায় যেমন বিজয়ী আকবর ও বিজিত প্রতাপের কাহিনী পাশাপাশি লেখা আছে ও থাকবে, কিন্তু কেন?

ভারতী কিছু বলার আগেই আমি বললাম, হলদিঘাটের যুদ্ধে হেরে গেলেও দেশপ্রেম ও আত্মত্যাগের জন্য চিরকালের মানুষের মনে মনে বিজয়ী বীরের আসন লাভ করেছেন।

খুব দুর্লভ চরিত্র!

একশ বার।

ভারতী হঠাৎ আমাকে প্রশ্ন করল, উদয়পুরের এত প্রাসাদ-লেক দেখার পর কি তোমার মনে সব চাইতে দাগ কেটেছে?

একটা পেণ্টিং।

কোনটা?

সিটি প্যালেসে রায় অঙ্গনে হলদিঘাটের যুদ্ধের কিছু অস্ত্রশস্ত্র ছাড়াও কয়েকটা খুব সুন্দর পেণ্টিং আছে। তার মধ্যে মহারাণা প্রতাপের কোলে চৈতকের মৃত্যুর দৃশ্যটা আমি কোনদিন ভুলতে পারব না।

ঠিক বলেছ। এবার একটু হেসে আমার দিকে তাকিয়ে বললো, দেখেছ, আমাদের দুজনের দৃষ্টিভঙ্গীর কত মিল।

মিশনারী স্কুল-কলেজে পড়লেও দেবদেবীতে ভারতীর অশেষ ভক্তি। তাই ফেরার পথে নাথদ্বারায় শ্রীনাথজীর দর্শন করলাম। বৈষ্ণবদের বল্লভাচার্য গোষ্ঠীর মহাতীর্থে এসে ভারতী বললো, লোকের বিশ্বাস ভগবান শ্রীকৃষ্ণ এখনও এখানে আছেন।

বলতে পারি না।

তোমাকে কিছু বলতে হবে না, তবে আমাদের বিয়ের পর আবার এখানে আসব।

মন্দির থেকে বেরিয়ে দুজনেই বাজারের মধ্যে ঘোরাঘুরি করছিলাম।

হঠাৎ দেখি ভারতী পাশে নেই। একটু পরেই ফিরে এসে আমার বুশ শার্টের পুরানো কাফলিংক দুটো খুলে দুটো নতুন কাফলিংক পরিয়ে দিল।

আমি বললাম, একি !

আমার সামান্য একটু স্মৃতিচিহ্ন তোমার কাছে থাক।

পরের দিন টুরিস্ট বাংলো থেকে স্টেশনে যাবার পথে ভারতী বললো, আমাকে ভুলে যেও না। আর যদি কোন অন্যায় করে থাকি তাহলে ক্ষমা করো।

আমি আলতো করে ডান হাত দিয়ে ওকে একটু জড়িয়ে বললাম, যাবার সময় এসব কথা বলে কেন আমাকে দুঃখ দিচ্ছ ?

সারা রাস্তা আর কোন কথা হলো না।

অটো রিক্শা স্টেশন এরিয়ায় ঢুকতেই ভারতী হঠাৎ নীচু হয়ে আমার পায়ে হাত দিয়ে প্রণাম করতেই আমি ওকে জড়িয়ে ধরলাম।

ভারতী কাঁদতে কাঁদতে বললো, হঠাৎ একবার দুম করে চলে এসো। খুব খুশী হবো।

আসব, নিশ্চয়ই আসব।

॥ চার ॥

এই পৃথিবীর মত সংসারেও সর্বত্র সমতল ভূমি নেই। কিছুটা সোজাসুজি সমতল ভূমিতে বিচরণ করার পরই শুরু হয় চড়াই-উতরাই। হয়ত বা বড় বড় পাহাড়-পর্বত। অথবা সুদীর্ঘ জলাভূমি বা সুগভীর সমুদ্র।

সুখের দিনে আনন্দের সময় মানুষ ভাবে না ভাবতে পারে না বসন্ত কখনও চিরস্থায়ী হয় না। হতে পারে না। সূর্য যত শক্তিশালীই হোক না কেন, দিনের শেষে তাকেও অস্ত যেতে হয়।

একে-একে দুই, দু'এ দু'এ চার অংক বইতে ঠিক, কিন্তু মানুষের জীবনের হিসাব কোন অংক বইয়ের নিয়ম মেনে চলে না। মেনে চলে না ভাল-মন্দ, ইচ্ছা-অনিচ্ছা বা কোর্ট-কাছারীর হুকুম। শুধু এই মাটির পৃথিবীতেই নয়, দিগন্ত বিস্তৃত মহাসমুদ্রের বুকে চিহ্নিত আছে জাহাজ চলাচলের পথ, মহাকাশের মধ্যেই রয়েছে বিমানের নির্দিষ্ট যাত্রাপথ। পথ নেই শুধু মানুষের জীবনের। কোথায় কখন মানুষের জীবন মোড় ঘুরবে, কেউ তা জানে না।

কলকাতা থেকে বেরিয়েছিলাম দেশভ্রমণে। ঘুরব-ফিরব দেখব-জানব বলে কিন্তু পুণ্য সাধক খাজা মইনুদ্দীন চিস্তির পবিত্র সমাধির স্পর্শে সবকিছু বদলে গেল।

উদয়পুর থেকে ফেরার পথে আবার আজমীরে আসতেই শূন্যতার জ্বালা অসহ্য মনে হল। একবার মনে হল উদয়পুর ফিরে যাই। কি হবে কলকাতায় গিয়ে? যখন রেলের অফিসে কেরাণীগিরিই করছি তখন চেষ্টা করলে উদয়পুরেও কিছু জুটে যাবে। তাছাড়া জীবনের সব দৈন্য সব অপূর্ণতাই ত ভারতী ভরিয়ে দেবে।

না শেষ পর্যন্ত এগিয়ে চললাম, এলাম জয়পুর। দুদিন থাকলাম। দিল্লি আসার পথে একটা দিন আলোয়ারেও রইলাম। আবার দিল্লি। সঙ্গে সঙ্গে রিজার্ভেশন না পাওয়ায় বাধ্য হয়ে তিনটে দিন যত্র-তত্র বিচরণ করেই কাটিয়ে দিলাম।

তারপর সমাজতান্ত্রিক ভারত গঠনে ভারতীয় রেলপথের অনবদ্য অবদান জনতা এক্সপ্রেসে চাপলাম। দুদিন ধরে রেল কোম্পানির জনতা-প্রেম প্রাণ ভরে উপভোগ করে মাত্র সাড়ে তিন ঘণ্টা লেটে পুণ্য ভাগীরথীর পাড়ে হাওড়া ষ্টেশনে অবতীর্ণ হলাম।

বাড়ীতে ঢুকতেই মা বললেন, আমি তোর জন্য মিনিটে মিনিটে দরজার কাছে আসছি।

মাত্র সাড়ে তিন ঘণ্টা লেটে ট্রেন এলো।

হা ভগবান।

আমি নিজের ঘরে গিয়ে জামা কাপড় বদলে নিতেই মা চা নিয়ে এলেন।

আমার হাতে চায়ের কাপ দিতে দিতে বললেন, পুরো ছুটিটাই বাইরে কাটিয়ে এলি।

বাইরে ঘুরবো বলেই ত ছুটি নিয়েছিলাম।

তাহলেও দু' একদিন আগে ফিরতে পারতিস।

চায়ের কাপে চুমুক দিয়ে বললাম, চেষ্টা করেছিলাম কিন্তু রিজার্ভেশন পেলাম না।

মা কিছু বললেন না কিন্তু চলে গেলেন না। আমার সামনে দাঁড়িয়ে রইলেন।

আমার চা খাওয়া শেষ হতেই জিজ্ঞাসা করলাম, আমাকে কিছু বলবে।

মা একটু খুশীর হাসি চেপে বললেন, রাণী, মণিকা আর শিউলি দুদিন এসেছিল।

আমি অবাক হয়ে বললাম, তাই নাকি ?

হ্যাঁ।

হঠাৎ ?

এসেছিল তোর খবর নিতে···।

মা যেন কথাটা শেষ করেন না।

আমি বললাম, আজমীরে ওদের সঙ্গে একদিনের জন্য দেখা হয়েছিল।

মা এবার একটু হেসে বললেন, তোর বাবা ত মণিকার গান শুনে দারুণ মুগ্ধ।

মণিকা গানও গেয়েছে। একটু থেমে জিজ্ঞাসা করলাম, ও গান জানে তোমরা জানলে কি করে ?

আমি জানতাম না। রাণী বললো বলেই ও গান গাইল।

রাণীদিকে আমার খুব ভাল লেগেছে। সত্যি খুব স্নেহশীলা মহিলা।

ওরা সবাই খুব ভাল। তাছাড়া প্রথমদিন মণিকার গান শুনে এত ভাল লাগল যে গত রবিবার ওদের কজনকে নেমন্তন্ন করেছিলাম।

আমি হাসতে হাসতে বললাম, তোমরা এত দূর এগিয়ে গেছ।

আজ মণিকাদের বাড়ি আমার আর তোর নেমন্তন্ন।

হা আল্লা। আমি যাচ্ছি না।

মা অবাক হয়ে বললেন, কেন ?

আমি ওদের বাড়ির কাউকে চিনি না, জানি না, হঠাৎ নেমন্তন্ন খেতে যাব কেন ?

ওর বৌদি এসে আমাকে বলে গেছে। আমি যাব বলেছি। এখন না গেলে অত্যন্ত অভদ্রতা হবে।

তুমি বলে দিও আমি ফিরি নি।

তা কি করে বলব ? ওরা তোর টেলিগ্রাম দেখেছেন। তাছাড়া সবাই জানে কাল তোর অফিস আছে।

মনে মনে মণিকার গান শোনার লোভ থাকলেও বললাম, ওদের এত খবর

জানবার কী দরকার ছিল ?

বাজে বকিস না। এসব এমন কি গোপন খবর যে বলে অন্যায় করেছি। মা একটু থেমে বললেন, মেয়েটা রাণীর সঙ্গে এসেছে, গান শুনিয়েছে, আমাদের ভাল লেগেছে। তারপর আমি ওদের খাইয়েছি বলেই ওরাও ভদ্রতা করে নেমন্তন্ন করেছে। এর মধ্যে অন্যায়টা কি হয়েছে শুনি ?

আমি হেসে বললাম, তাহলে বলে দিও আমার ভীষণ পেট খারাপ।

বলব তোর মাথা খারাপ হয়েছে।

মা এই কথা বলেই ঘর থেকে বেরিয়ে গেলেন। আমিও চীৎকার করে বললাম, তাই বলো।

দুপুরবেলায় খেয়েদেয়ে শুয়ে শুয়ে কয়েকদিনের পুরানো বাংলা খবরের কাগজ পড়ছিলাম। হঠাৎ পাশের ঘর থেকে মাকে বলতে শুনলাম, অজু তোর টেলিফোন।

উঠে গেলাম।

হ্যালো।

আমি রাণীদি। কেমন আছেন ভাই ?

আপনার খবর নিতে এর মধ্যে একদিন আপনার বাড়িতে গিয়ে মাসীমা-মেসোমশাইয়ের সঙ্গে খুব ভাব হয়েছে।

মণিকার গান শুনে ত মাসীমা-মেসোমশাই মুগ্ধ।

তাও শুনলাম।

আর কি শুনলেন ?

শুনলাম, নেমন্তন্ন খাওয়াবার পালাও শুরু হয়েছে।

আজ ত মণিকাদের বাড়িতে নরক গুলজার হবে।

তার মানে ?

ওদিক থেকে আপনি আর মাসীমা আসছেন, এদিক থেকে আমরা একদল যাচ্ছি।

আমি একটু হাসতে হাসতে বললাম, খাইয়ে দাইয়ে যে কেউ গান শোনায় তা আগে জানতাম না।

না-ভাই ওকথা বলবেন না। আপনি আর মাসীমা আসছেন বলেই আমাদের ক'জনকে বলেছে।

কিন্তু আমি বোধহয় যেতে পারব না। আমার শরীরটা বিশেষ ভাল না।

এখন চুপচাপ ঘুমিয়ে থাকুন। বিকেলের দিকে শরীর ঠিক হয়ে যাবে।

মনে হয় না।

না না, আপনাকে আসতেই হবে।

কেন ?

আজমীরে ভাল করে আলাপ হয়নি বলে আপনার সঙ্গে আলাপ করবে বলে সবাই হাঁ করে বসে আছে।

আমি এমন কিছু মহাপুরুষ না যে আমার সঙ্গে আলাপ করার জন্য কেউ

হাঁ করে বসে থাকবে।

ওসব কথা ছাড়ুন। আপনি না এলে আমরা সবাই খুব দুঃখ পাব।

আচ্ছা দেখি।

আচ্ছা দেখি বললে হবে না, আমি আপনাকে আর মাসীমাকে নিয়ে মণিকাদের ওখানে যাব।

না না, তার দরকার হবে না।

কেন ? আপনাদের বাড়ি ত আমার যাবার পথেই পড়বে !

আমি ঘরে শুয়ে শুয়ে রাণীদিদের কথা, মণিকার কথা ভাবছিলাম। ওদের সঙ্গে মার হৃদ্যতা ত দূরের কথা, আলাপ হবে—একথাও আমি স্বপ্নে ভাবিনি। কেমন যেন একটু অবাক লাগল। তবু মনে মনে অখুশী হলাম না। বোধহয় এ বয়সে মেয়েদের সঙ্গে আলাপ-পরিচয় হলে কেউ অখুশী হয় না। হতে পারে না। তাছাড়া বিশেষ করে রাণীদি ও মণিকার সঙ্গে আলাপ হয়ে ভাল লেগেছে। রাণীদিকে দেখলেই দিদি বলে ডাকতে ইচ্ছে করে। মনে হয় ছোট্ট ভাই হিসেবে ওর কাছে যখন তখন যা খুশী দাবী করা যায়। আর মণিকা ? ওর গান, ওর হাসি-খুশী প্রাণচঞ্চল ভাব সবারই ভাল লাগবে। এই মণিকার কথা ভাবতে ভাবতে কখন যে ঘুমিয়ে পড়েছি তা টের পাই নি।

ঘুম ভাঙল মার ডাকাডাকিতে। অজু ওঠ। সন্ধ্যে হয়ে এলো। আর ঘুমোয় না।

বিছানায় উঠে বসতেই মা বললেন, যা, তোর বাবার সঙ্গে দেখা করে আয়।

যাচ্ছি।

চোখে-মুখে জল দিয়ে বাবার সঙ্গে দেখা করে এলাম। মামুলি দুটো একটা কথাবার্তা জিজ্ঞাসা করলেন। অবশ্য বাবা কোনকালেই বেশী কথা বলেন না। আমি আবার আমার ঘরে আসতেই মা চা দিয়ে জিজ্ঞাসা করলেন, আম খাবি ?

দাও।

আমি চা খাওয়া শেষ করতেই মা আম দিয়ে গেলেন আর বললেন, এবার আস্তে আস্তে তৈরী হয়ে নে।

এখন তো মোটে সাতটা বাজে। এখুনি তৈরী হয়ে কি করব ?

রাণী বোধহয় সাড়ে সাতটা নাগাদ আসবে।

আমি আর কিছু বললাম না। মা নিজের কাজে চলে গেলেন। তবে মনে মনে ভাবলাম মণিকাদের বাড়ী যাবার ব্যাপারে মা বড় বেশী উৎসাহী। শুধু কী গান শোনার জন্য ?

যাই হোক, সাড়ে সাতটায় না, প্রায় আটটা নাগাদ রাণীদি ট্যাক্সি নিয়ে আসতেই আমরা সঙ্গে সঙ্গে বেরিয়ে গেলাম। মণিকাদের বাড়ী পৌঁছাতে মিনিট পাঁচেকও লাগল না।

আমাদের ট্যাক্সি থামতেই যাঁরা অভ্যর্থনার জন্য এগিয়ে এলেন, তাঁদের মধ্যে মণিকাকে না দেখে একটু অবাক হলাম। দু'তিন জনকে আজমীরে

দেখেছি বলে মনে হল। অন্যান্যদের ঠিক চিনতে পারলাম না। ওরা সবাই মিলে অত্যন্ত সমাদর ও আন্তরিকতার সঙ্গে আমাকে ও মাকে অভ্যর্থনা করলেন।

বসার ঘরে ঢুকতেই ওরা একে একে মাকে প্রণাম করলেন। সব শেষে মণিকা। আমি ওকে জিজ্ঞাসা করলাম, কেমন আছেন?

উনি একটু সলজ্জ হাসি হেসে বললেন, ভাল।

এবার আমি বললাম, আমার ধারণা আপনি সত্যি ভাল গায়িকা, কিন্তু আজ কলকাতায় এসে শুনলাম নেমন্তন্ন না করলে কেউ আপনার গান শোনেন না।

তাহলে বুঝতে পারছেন যে আমি কত ভাল গায়িকা।

তবে কেরাণী অজয় চৌধুরীকে নেমন্তন্ন না করলেও চলতো।

মা সঙ্গে সঙ্গে আমাকে বকুনি দিয়ে বললেন, তুই কী সারা জীবনই কেরাণী থাকবি?

তোমার ত ধারণা তোমার পুত্র এই ভূ-ভারতে প্রথম এম-এ পাশ করে ইতিহাস সৃষ্টি করেছে।

মা কিছু বলার আগেই রাণীদি বললেন, তাই বলে এম-এ পাশ করাটা ছেলেখেলা নয়।

রাণীদির কথায় মার গায়ের জোর বেড়ে গেল। বললেন, তোমরাই বলো ত মা।

এতক্ষণ আমাদের কথাবার্তা শুনে ঘরের সবাই উপভোগ করছিলেন। এবার একজন বর্ষীয়সী বিধবা মহিলা বললেন, আমি মণিকার মা। রাণী ত তোমার প্রশংসায় পঞ্চমুখ।

আমি কিছু জবাব দেবার আগেই মা হুকুম করলেন, যা অজু প্রণাম কর।

বিশেষ ইচ্ছা না থাকলেও প্রণাম করলাম। বললাম, রাণীদি আমাকে বিশেষ চেনেন না বলেই আমার প্রশংসা করেছেন।

ঘরের এক কোণা থেকে আজমীর পার্টির একজন সদস্য হাসতে হাসতে বললেন, ছোড়দা বেশ ঝগড়া করতে পারেন।

কালবিলম্ব না করে আমি বললাম, মুক্ত কণ্ঠে মতামত প্রকাশ করাকে ঝগড়া করা বলে না।

আমার কথায় সবাই হাসলেন।

মা আত্মগর্বের একটু হাসি হেসে বললেন, এই অসভ্য ছেলেকে নিয়ে আমার ঘর করতে হয়।

রাণীদি সঙ্গে সঙ্গে বললেন, ছেলেরা মিনমিনে হলে একটুও ভাল লাগে না।

একজন মধ্যবয়সী বিবাহিতা মহিলা বললেন, তা ঠিক।

আমি বললাম, আপনি আমাকে সমর্থন করছেন কিন্তু আপনাকে ত চিনতে পারছি না।

মৃদু হাসির তরঙ্গ উঠল চারদিক থেকে।

মণিকার মা বললেন, ও আমার বড় বৌমা।

আমি দু'হাত জোড় করে বললাম, নমস্কার।

উনি হাসতে হাসতে প্রতি নমস্কার করলেন।

এবার আমি মণিকার দিকে তাকিয়ে জিজ্ঞাসা করলাম, আজ কী শুধু ভোজনের নিমন্ত্রণ, নাকি ভাল কিছু শ্রবণেরও ব্যবস্থা করবেন?

দু'তিন জন একসঙ্গে বলে উঠলেন, হ্যাঁ হ্যাঁ, এবার গান হোক।

হারমোনিয়াম এলো। মণিকা বসল।

মা বললেন, পূজা পর্যায়ের গান শোনাও।

মণিকা শুরু করল—আমার মাথা নত করে দাও হে তোমার চরণ ধূলার তলে।

শেষ হতেই মা বললেন, অপূর্ব।

এবার মণিকা শোনাল—এই লভিনু সঙ্গ তব সুন্দর হে সুন্দর। পুণ্য হল অঙ্গ মম, ধন্য হল অন্তর, সুন্দর হে সুন্দর।

গান শেষ হতেই আমি বললাম এর আগেরবার মা প্রশংসা করেছেন। এবার বোধহয় আমার প্রশংসা করা উচিত।

ঘরসুদ্ধ সবাই হো হো করে হেসে উঠলেন।

মণিকার পিছন থেকে একজন ভদ্রমহিলা বললেন, রাণীদি তোমার নতুন আবিষ্কার করা ভাইটি সত্যি বেশ ইণ্টারেষ্টিং।

আমি ওঁর দিকে তাকিয়ে বললাম, আপনার ভুল হল। আমি ইণ্টারেষ্টিং না, আমার কথাগুলো ইণ্টারেষ্টিং।

আবার হাসি।

রাণীদি বললেন, মণিকা হাসিস না।

মণিকা বললো, এত হাসির পর আমি আর গাইতে পারছি না।

এমন সময় এক ডাক্তারবাবু ঘরে ঢুকতেই মণিকার মা আমাকে বললেন, আমার বড় ছেলে।

আমি সঙ্গে সঙ্গে হাতজোড় করে নমস্কার করে বললাম, আমি অজয় চৌধুরী।

বুঝতে পেরেছি।

রাণীদি বললেন, দাদা, বসুন।

ডাক্তারবাবু বললেন, না আমি বসব না। আমি অজয়বাবুকে বলতে এলাম যে আমি থাকতে পারব না বলে উনি যেন কিছু মনে না করেন।

মণিকার মা ওকে জিজ্ঞাসা করলেন, তুই এখনি যাবি?

ডাক্তারবাবু বললেন, হ্যাঁ মা, যাদবপুরেয় সেই ভদ্রলোকের অবস্থা বিশেষ সুবিধের না। এবার আমার মাকে বললেন, মাসীমা আজ যাচ্ছি। আরেক দিন দেখা হবে।

মা বললেন, আমাদের বাড়ীতে এসো।

নিশ্চয় আসব।

ডাক্তারবাবু চলে যাবার পরেও গান হলো, তবে মণিকা না, অন্য দুজনে গাইলেন।

এর পর ভোজনপর্ব।

আমি ব্যাপক আয়োজন ও সযত্ন আয়োজন দেখেই চমকে বললাম, বাপ্‌রে বাপ। এ তো দেখছি জামাইষষ্ঠীর খাওয়া।

আমার সামনের দিক থেকে মণিকার এক বান্ধবী বললেন, আপনাকে ত জামাই হতে হবে।

কার জামাই হবো? আপনার?

না না, আমার জামাই কেন হবেন? এবার মণিকার মার দিকে হাত দেখিয়ে বললেন, এইরকম কোন মাসীমারই ত জামাই হবেন।

এক জ্যোতিষী বলেছেন শাশুড়ী আদর আমার কপালে নেই।

আমার কথা শুনেই মা বকুনি দিলেন, অজু, এবার তুই আমার কাছে সত্যি মার খাবি।

ভূরিভোজ শেষ হবার পর বিদায় সম্বর্ধনাও যথেষ্ট আন্তরিকতার সঙ্গে শেষ হল।

বাড়ী ফেরার পথে আমি মাকে বললাম, এরা যেন অহেতুক একটু বেশী খাতির করল, তাই না, মা?

মা গম্ভীর হয়ে বললেন, ভদ্র সভ্য ফ্যামিলীতে এই রকমই আদর যত্ন করে।

মার জবাবে আমি ঠিক সন্তুষ্ট হতে পারলাম না। মনের মধ্যে একটু প্রশ্ন থেকেই গেল।

পরের দিব থেকে আবার কয়লাঘাটার রেলের অফিসে যাতায়াত শুরু করলাম। প্রথম দিন সামান্য একটু চাঞ্চল্য একটু হাসিখুশী গল্পগুজব হলেও পরের দিন থেকে সেই গড্ডালিকা প্রবাহে জীবন ভাসিয়ে দিলাম।

দিন দশেক হয়ে গেল। তবু ভারতীর কোন চিঠি পাচ্ছি না বলে মন বেশ খারাপ। সেকেণ্ডস্যাটারডে অফিস নেই। তবু বারোটা নাগাদ বাড়ী থেকে বেরিয়ে হাঁটতে হাঁটতে রাসবিহারীর মোড়ে এসে ডালহৌসীর ট্রামে উঠলাম। নামলাম ভবানীপুরে। গেলাম সুবীরের বাড়ী। ভেবেছিলাম ওকে নিয়ে বেরুব কিন্তু তা সম্ভব হল না। সেদিন ভোরবেলায় ওর দিদি-জামাইবাবু জার্মানী থেকে এসেছেন বলে বাড়ীতে উৎসব শুরু হয়েছে। বেশ কিছুক্ষণ ওখানে আড্ডা দিয়ে আবার পূর্ণ সিনেমার সামনে এসে এসপ্ল্যানেডে যাব বলে ট্রামে উঠলাম।

প্রায় দুটো বাজে। ট্রামে বিশেষ যাত্রী নেই। সামনের দিকে একটা সীটের জানলার ধারে বসব বলে এগুচ্ছি। হঠাৎ মণিকা ডাকল, কোথায় চললেন?

আরে আপনি?

বসুন।

ওর পাশে বসে জিজ্ঞাসা করলাম, অফিস চললেন?

অফিস যাচ্ছি তবে ডিউটি দিতে না।

তাহলে অফিস যাচ্ছেন কেন ?

দাদা-বৌদির ম্যাটিনী শোতে সিনেমা দেখার কথা ছিল কিন্তু বৌদির দাঁতে ব্যথা বলে ওরা যেতে পারবে না। তাই সেই দুটো টিকিট আমার ঘাড়ে গছিয়ে বললো, অফিসের কাউকে নিয়ে···

অফিসের কাউকে অলরেডি বলেছেন ?

না, কাউকে বলি নি।

তাহলে আর অফিসে যেতে হবে না।

আপনি যাবেন ? চলুন।

যেতে পারি কিন্তু একটা সর্তে।

কি সর্ত শুনি।

টিকিটের দাম নিতে হবে।

কিন্তু আমি ত দাম দিয়ে টিকিট নিই নি।

তাহলে কী করা যায় ?

আমাকে চা খাইয়ে দেবেন।

ঠিক আছে।

কণ্ডাকটর আসতেই মণিকা আমার টিকিট কাটল।

আমি বললাম, আস্তে আস্তে আপনার কাছে আমার ঋণ বেড়েই যাচ্ছে।

সুদ-আসলে শোধ করে দেবেন।

কেরাণীরা কোনকালেই ঋণ শোধ করে না।

তাহলে শোধ করবেন না।

একটু ভেবে বললাম, এবার আমি আপনাকে একটা সিনেমা দেখিয়ে দেব।

তাহলে ত ঋণ শোধ হবে কিন্তু সুদ দেওয়া হবে না।

তাহলে দুটো সিনেমা দেখাব।

আমি তাহলে বেশী সুদ নিয়ে ফেলব। সেই সুদ ফেরত দিতে আবার আপনাকে আমার সিনেমা দেখাতে হবে।

লাইট হাউসের ড্রেস সার্কেলে দুজনে পাশাপাশি বসেছি। তখনও সিনেমা আরম্ভ হতে একটু দেরী আছে। জিজ্ঞাসা করলাম, বাড়ীতে গিয়ে কী বলবেন ?

সিনেমা দেখার ব্যাপারে কি বলব ? তাই জানতে চাইছেন ?

হ্যাঁ।

বাড়ীতে ত জানেই সিনেমা এসেছি।

কোন বন্ধুকে নিয়ে সিনেমা দেখলেন তা বলবেন না।

অত কেউ জিজ্ঞাসা করবে না।

যদি করে ?

বলব আপনাকে নিয়ে গেছি।

দোহাই আপনার! আমার কথা বলবেন না।

কেন ?

আমাকে নিয়ে সিনেমা দেখেছেন শুনলেই সবাই কোন রহস্য আবিষ্কার করবেন।

কিন্তু আপনাকে ত আমাদের বাড়ীর সবার খুব ভাল লেগেছে।

তা লাগুক কিন্তু আমাদের দেশে ছেলেমেয়েদের বন্ধুত্ব হয় না। তার উপর আপনি সুন্দরী-সুগায়িকা আর আমি। আমি ব্যাচেলার! ওরে বাব্বা!

না না, আপনার কথা বলব না। বৌদি জানলেই সঙ্গে সঙ্গে অফিসের সবাইকে জানিয়ে দেবে।

এবং তাহলেই কেলেংকারী।

কেলেংকারী কিছু না তবে বহু-জনের হাসি-ঠাট্টার খোরাক হতে হবে।

আপনি শুধু সুন্দরী আর সুগায়িকা না, যথেষ্ট বুদ্ধিমতীও।

আর কিছু বিশেষণ দেবেন না।

ছবি শুরু হল। আমরা আর কথা বলি না।

কিছুক্ষণ পরে মণিকা জিজ্ঞাসা করল, আপনাকে ত সিনেমায় টেনে আনলাম; আপনার কোন কাজের ক্ষতি হলো না ত?

কি আবার কাজের ক্ষতি হবে?

যখন ছুটির দিনেও বেরিয়েছিলেন তখন নিশ্চয়ই কোন কাজ ছিল।

কোন কাজ ছিল না। বাড়ীতে ভাল লাগছিল না বলে বেরিয়ে পড়েছিলাম।

আবার দুজনে ছবি দেখি।

কিছুক্ষণ পর আমি বললাম, সেদিন আপনারা যেমন আমাকে নিয়ে বাড়াবাড়ি করেছেন, আমিও সেইরকম বাঁদরামী করেছি।

আমরা কি বাড়াবাড়ি করলাম?

অজ্ঞাত একজন অজ্ঞাতকুলশীল কেরাণীকে ঐভাবে খাতির করার কোন মানে হয়?

আপনি নিজেকে এত ছোট মনে করেন কেন?

বড় না বলে।

কথায় আপনার সঙ্গে কেউ পারবে না

যাই হোক সেদিন আপনাদের বাড়ীতে এমন বাঁদরামি করেছি যে আর কোনদিন মুখ দেখাতে পারব না।

কিচ্ছু বাঁদরামি করেন নি; বরং আপনার প্রত্যেক কথায় সবাই দারুণ এনজয় করেছেন।

মা আমাকে কী বললেন জানেন?

কি?

বললেন, তোর বাঁদরামির জন্য ভাল করে মণিকার গান শুনতে পারলাম না।

মাসীমা আমার গান খুব পছন্দ করেন।

শুধু আপনার গান না, আপনাকেও মার খুব ভাল লাগে।

আপনি কি করে জানলেন ?

মা আজকাল কারণে-অকারণে যখন তখন আমার কাছে এসে আপনার প্রশংসা করেন।

আপনি বিরক্ত হন না ?

বিরক্ত হই না তবে মাকে বলি, আমার কাছে ওর প্রশংসা করে কী লাভ ?

আচ্ছা রাণীদির মারফত মাসীমার সঙ্গে আমাদের যোগাযোগ না হলে আপনি কলকাতায় এসে আমাদের সঙ্গে যোগাযোগ করতেন।

আপনার আর রাণীদির সঙ্গে যোগাযোগ করতাম।

তখন ছবি প্রায় শেষ হয়ে এসেছে। আমি জিজ্ঞাসা করলাম, সামনের সপ্তাহে কবে আপনার ছুটি ?

এ মাসে প্রত্যেক শনিবারই আমার ছুটি।

ইভনিং শোতে যেতে কি আপনার অসুবিধে হবে ?

না, অসুবিধে কিছু নেই। তবে আমি সিনেমা দেখলাম বলেই আপনাকে দেখাতে হবে না।

না, তা না। তবে আপনি গেলে আমারও যাওয়া হবে।

তবে দু-একদিন আগে জানাবেন।

আপনার অফিসে ফোন করব ?

আপনি অফিসে ফোন করলে সবাই জেনে যাবে। তার চাইতে আমিই আপনাকে ফোন করব।

আমার অফিসের নম্বর জানেন কী ?

জানি।

বাড়ী ফিরতেই বাবা দুখানা চিঠি আমার হাতে দিয়ে বললেন, তোর চিঠি।

প্রায় দৌড়ে গিয়ে নিজের ঘরে গিয়ে দেখি, দুটো চিঠিই ভারতী লিখেছে। ...তোমার জয়পুর থেকে লেখা চিঠি আজ পেলাম। আমিও মনে মনে ভাবছিলাম, তোমার কলকাতা পেঁছিতে পেঁছিতে বেশ ক'দিন সময় লাগবে! তাই তুমি যদি দিল্লী থেকে চিঠি দাও, তাহলে খুব ভাল হয়। জয়পুর থেকে লেখা তোমার চিঠি পেয়ে বুঝলাম, শুধু আমিই তোমার কথা ভাবি না। তুমিও প্রতি মুহূর্তে আমার কথা ভাবছ। আমি জানতাম খাজা সাহেব ভুল করতে পারেন না।

আমার বাবা চিরকাল আমাকে মাকে শুধু উপেক্ষা নয়, অত্যন্ত দুঃখও দিয়েছেন। স্বামী পর হয়ে যাবার চাইতে বড় দুঃখ মেয়েদের হতে পারে না। আমার মাকে সেই দুঃখ সহ্য করতে হয়েছে বছরের পর বছর। অনেক দিন হল মা মারা গিয়েছেন কিন্তু মার মৃত্যুর জন্য বাবার জীবনে কোন শূন্যতা আসে নি।

এসব কথা লিখতেও ঘেন্না হয়, কিন্তু এইজন্যই লিখছি যে বাবার জন্য কোনদিনই আমি পুরুষদের শ্রদ্ধার চোখে দেখতে পারি নি। তাইতো আপন মনে নিঃসঙ্গভাবে এগিয়ে চলেছিলাম কিন্তু এই উদয়পুর আসার পর থেকেই

আর যেন নিঃসঙ্গতা সহ্য করতে পারছিলাম না। তাই একদিন খাজা সাহেবের দরগায় গিয়ে কাঁদতে কাঁদতে বলেছিলাম, বাবা তুমি আমাকে পথ দেখাও। তুমি আমাকে কারুর হাতে তুলে দাও। পরের বার খাজা সাহেবের দরগায় গেলে বাবা নিজ হাতে আমাকে তোমার হাতে তুলে দিলেন। অজয়, তুমি শুধু আমার প্রিয় নয়, তুমি আমার পরম শ্রদ্ধার।

পরের চিঠিটা ছোট্ট। আজ সকালেই তোমাকে চিঠি দিয়েছি। এইমাত্র তোমার দিল্লী থেকে লেখা চিঠি পেলাম। অশেষ, অশেষ অশেষ ধন্যবাদ। চিঠিটা এত সুন্দর লিখেছ যে এখন তোমাকে কাছে পেলে বোধহয় আনন্দে খুশীতে তোমাকে সবকিছু বিলিয়ে দিতাম। এখুনি ক্লাশে ছুটতে হবে। আর লেখার সময় নেই। কলকাতায় গিয়ে মণিকাকে কাছে পেয়ে আর তার গান শুনে আমাকে ভুলে যেও না। তুমি ভুলে গেলে আমি পাগল হয়ে যাব।

কলকাতায় এসেই আমি ভারতীকে চিঠি দিয়েছি। সে চিঠিতে মণিকার বাড়ীর নেমন্তন্নের কথাও লিখেছি। একবার ভেবেছিলাম ওসব কিছু লিখব না। পরে মনে হল, ওকে সবকিছু জানান আমার কর্তব্য।

যাই হোক রাত্রে খাওয়া-দাওয়ার পর ভারতীকে দীর্ঘ পত্র লিখলাম। ভারতীর জবাব আসে, আমি আবার জবাব দিই।

এদিকে রাণীদি, মণিকা, মণিকার মা আর বৌদি মাঝে মাঝে আমাদের বাড়ীতে আসেন। মা কখনও কখনও ওদের ওখানে যান কিন্তু আমি যাই না। মণিকার সঙ্গে আমার মাঝে মাঝে টেলিফোনে কথা হয় বা দুজনে একসঙ্গে সিনেমা যাই কিন্তু নিঝক বন্ধুত্বের বেশী কিছু নয়। ভারতী আমার জীবনে এসেছে, একথা আমি কখনই ভুলে যাই না।

দিনগুলো মোটামুটি এইভাবেই কেটে যাচ্ছে। দেখতে দেখতে বেশ কয়েকটা মাস পার হয়ে গেল।

সেদিন অফিসে বেশ কাজের চাপ। একমনে একটার পর একটা ফাইল পড়ছি, আর লিখছি, বড়দাকে দিয়ে আসছি। হঠাৎ গোটা চারেকের সময় বড়দা ডাকলেন অজয় তোমার টেলিফোন।

হ্যালো।

আমি মণিকার বৌদি বলছি। আপনি এখুনি বাড়ী চলে আসুন। মেসোমশাই হঠাৎ অসুস্থ হয়ে পড়েছেন।

কী হয়েছে বাবার ? আমি বেশ উত্তেজনার সঙ্গেই চীৎকার করে জিজ্ঞাসা করি।

কোর্টে ঘণ্টা তিনেক আর্গুমেণ্ট করে বার লাইব্রেরীতে এসেই হঠাৎ মাথা ঘুরে পড়ে যান।

ডাক্তার এসেছেন ?

মণিকার দাদা ছাড়াও আরো একজন ডাক্তার এসেছেন। আপনি চলে আসুন।

আপনি কি আমাদের বাড়ী…

হ্যাঁ, আপনাদের বাড়ী থেকেই কথা বলছি। আর কথা বলবেন না। আপনি চলে আসুন।

আমি টেলিফোনের রিসিভার নামাতেই বড়দা জিজ্ঞাসা করলেন, তোমার বাবা কি হঠাৎ অসুস্থ হয়ে পড়েছেন?

হ্যাঁ।

যাও যাও এক্ষুনি যাও। সঙ্গে সঙ্গে চীৎকার করে বললেন, প্রিয়, তুই ওর সঙ্গে যা। দরকার হলে আমাদের টেলিফোন করিস।

আমি আর প্রিয়দা বাড়ী আসতেই দেখি নীচের ঘরে অনেক উকিলবাবুর ভীড়। তাড়াতাড়ি উপরে উঠলাম। বাবার ঘরে দুজন ডাক্তার আর মণিকার বৌদি। দুজন নার্স। বাবার দুপাশে দুটো মেসিন। বাবার নাকে মুখে হাতে কয়েকটা নল ঢোকান।

আমি মুহূর্তের জন্য থমকে দাঁড়িয়ে মণিকার দাদাকে জিজ্ঞাসা করলাম, হার্ট এ্যাটাক নাকি?

উনি শুধু মাথা নেড়ে সম্মতি জানালেন।

মা পাশের ঘরে বোবা হয়ে বসেছিলেন। আমি কোন মতে সমস্ত শক্তি সঞ্চয় করে বললাম, চিন্তা করো না। আজকাল হার্ট এ্যাটাকের অনেক ওষুধ বেরিয়েছে।

ঘণ্টা দুয়েক পরে মণিকার দাদা বারান্দায় বেরিয়ে আসতেই জিজ্ঞাসা করলাম, কণ্ডিসন কেমন দেখছেন?

বাহাত্তর ঘণ্টা না পার হলে কিছু বলা যায় না। তবে ব্লাড প্রেসারটা বেশ কিছুটা নেমে এসেছে।

না, বাহাত্তর ঘণ্টাও অপেক্ষা করতে হলো না। পরের দিন ভোরবেলায় বাবা চলে গেলেন।

সব কাজকর্ম মিটে গেল। কাকা কাকিমা, মাসীরা, ছোট মামা আর বড় মামীমা চলে গেছেন। সেদিন দিদি জামাইবাবুর সঙ্গে মাকেও পাঠিয়ে দিলাম। আমার সব ছুটি ফুরিয়ে গেছে বলে আমি যেতে পারলাম না।

ষ্টেশন থেকে বাড়ী ফিরতেই বাবার ক্লার্ক অশ্বিনীদা আমাকে কয়েকটা চিঠি দিয়ে বললেন, এই চিঠিগুলো বিকেলের ডাকে এসেছে।

আমি ওকে বললাম, অশ্বিনীদা, এবার আপনি বাড়ী যান।

অশ্বিনীদা চলে যাবার পরই মণিকা আর তার বৌদি এলেন। ওদের দেখেই বললাম, ষ্টেশন থেকে বাড়ী গিয়েই আবার কেন এলেন? আপনারা ত অনেক করলেন। এবার কদিন বিশ্রাম করুন।

মণিকার বৌদি বললেন, আমরা এমন কিছু করি নি যে বিশ্রাম করতে হবে।

না না, বৌদি, ওকথা বলবেন না। আপনারা যা করলেন তার কোন তুলনা হয় না। সারা জীবনেও আপনাদের ঋণ শোধ করতে পারব না।

মণিকা বললো, এসব বিপদের দিনে সবাই যা করে আমরাও তাই করেছি। তার বেশী কিছু করি নি।

না ভাই, তা বলবেন না। বৌদির কথা আর কি বলব! আপনি যা করেছেন তা আপন বোন ছাড়া কেউ করতে পারেন না।

আমাদের বহু পুরানো চাকর মণিলাল দরজার পাশেই দাঁড়িয়েছিল। বৌদি ওকে বললেন, মণিলাল, এবার তুমি আর দাদাবাবু খেয়ে নাও। বেশী রাত করো না।

মণিলাল বললো, ভাত বসিয়েছি। ভাত হলেই দাদাবাবুকে খেতে দেব।

হঠাৎ মণিকা জিজ্ঞাসা করল, ভাল কথা, টেলিফোনের নীচে দুটো-একটা চিঠি আর একটা শ্লিপ আছে। দেখেছেন কী?

কিসের শ্লিপ?

কালকে দু-তিনজন টেলিফোন করেছিলেন। আমি তাদের নাম ঐ শ্লিপে লিখে রেখেছি।

আচ্ছা উপরে গিয়ে দেখব।

একটু পরে ওরা চলে গেলেন। আমি চিঠিগুলো হাতে করে উপরে আমার ঘরে গেলাম। চিঠিগুলো পড়লাম। বড়মামার আর কাকার চিঠি পড়ার পর খামের চিঠিটা দেখেই চমকে উঠলাম। ভারতীর চিঠি।

হাওড়া ষ্টেশনে দাঁড়িয়ে এ চিঠি লিখছি। তোমার বাবার মৃত্যুসংবাদ পেয়ে কলকাতা ছুটে এসেছিলাম। কারণ মনে হয়েছিল তোমার এ বিপদের দিনে তোমার পাশে দাঁড়ান আমার অবশ্যকর্তব্য কিন্তু তা সম্ভব হল না। তোমার বাড়ীতে টেলিফোন করেছিলাম। আর কেউ নয়, মণিকাই টেলিফোন ধরেছিল। তাই মনে হল, আমি বৃথাই দেড় হাজার মাইল দূর থেকে ছুটে এসেছিলাম। ফিরে যাচ্ছি। আর কোনদিন তোমাকে বিরক্ত করব না। তোমরা সুখী হও।

খুব জোরে একটা দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলে বললাম, ভগবান।

আস্তে আস্তে টেলিফোনের কাছে এগিয়ে গিয়ে মণিকার হাতে লেখা শ্লিপটা তুলে দেখি তাতে সবার উপরে লেখা আছে অধ্যাপিকা ভারতী রায়।

॥ পাঁচ ॥

সাত বছর পরের কথা।

খামের ঠিকানা লেখা দেখেই বুঝলাম দিদির চিঠি—ভাই অজু আজ প্রায় ছ বছর তুই কলকাতা ছেড়ে আজমীরে গেছিস। কি কারণে হঠাৎ কলকাতার চাকরি-বাকরি ঘরবাড়ী ছেড়ে রেলের স্কুলে মাষ্টারী নিয়ে আজমীর গেলি, তা কিছুই বুঝলাম না। এই ছ বছরে তুই মাত্র দুবার এদিকে এসেছিস। ছ বছর আগে মা মারা না গেলে বোধহয় তোর দেখা পেতাম না। যাই হোক, সব সময় তোর জন্য বড় চিন্তা হয়। আর কতকাল একলা একলা কাটাবি। লক্ষ্মী ভাই আমার, এবার বিয়ে কর। তোকে ঠিক মত সংসারী না করা পর্যন্ত আমার মনে শান্তি নেই। দিদিকে আর কষ্ট দিস না।

দীর্ঘ চিঠি। চিঠি ত নয়, দিদি যেন কাঁদছে। সত্যি দিদি-জামাইবাবু আমাকে খুব ভালবাসেন। আমি জানি আমি মেসে ভালমন্দ খেতে পাই না বলে দিদি আমার প্রিয় ছোলার ডাল আর আমের মিষ্টি চাটনী খাওয়া ছেড়ে দিয়েছে, কিন্তু দিদিকে আমি কি করে সুখী করি? দিদি আমার চাইতে অনেক বড়। তাকি কি করে আমার মনের কথা বলি।

বিকেল বেলায় স্কুল থেকে ফিরে এসে নিজের ঘরে একলা বসে বসে দিদির কথা ভাবি। ভাবি কি করে দিদিকে লিখি, দিদি, যখনই সময় পাই, তখনই খাজা সাহেবের দরগায় গিয়ে বার বার শুধু একটা কথাই বলছি, বাবা, তুমি ত জান আমি ভারতীকে প্রতারণা করি নি। তবে কেন সে এভাবে চলে গেল? সে কী একবার আমার সঙ্গে দেখা করতে পারত না?

ভাবতে ভাবতে মাথাটা ঝিম ঝিম করে। শুয়ে পড়ি। লখন সিং পর পর দুবার ডেকে যাবার পর খেতে যাই। আবার এসেই শুয়ে পড়ি কিন্তু সারা দিনের ক্লান্তির পরও ঘুম আসে না। মনে মনে হাজার বার বলি, খাজা সাহেব, তুমিই ভারতীকে আমার কাছে পাঠিয়েছিলে। তবে কেন এভাবে তাকে সরিয়ে নিলে? না, আমি তাকে কোনদিন চিঠি লিখব না। আমি লিখতে পারব না, আমি সৎ, আমি ভাল। আমি অন্যায় করি নি। আমি শুধু তোমাকেই স্ত্রী বলে কল্পনা করেছি। মুহূর্তের জন্যও মণিকাকে তোমার জায়গায় বসাতে চাই নি।

মাঝে মাঝে খাজা সাহেবের উপর খুব রাগ হয়। আম্মার কবরের সামনে দাঁড়িয়ে বলি, আম্মা, আমি আর খাজা সাহেবকে কিছু বলব না। কেন বলব? এতদিন ধরে তোমাদের স্বামীর কাছে যাচ্ছি আর তিনি কী আমার কান্না শুনতে পান না?

আম্মাদের উপরেও রেগে যাই। বলি, তোমাদের দুজনের মজারের এই জালিতে লাল সুতো বেঁধে যাচ্ছি। আমি অনেক ধৈর্য ধরেছি। আর পারছি

না। তিন মাসের মধ্যে যদি খাজা সাহেব ভারতীকে আমার কাছে না এনে দেন তাহলে আমি আর কোনদিন তোমাদের কিছু বলব না। তোমাদের ছুঁয়ে বলছি আম্মা আমি আর কোনদিন তোমাদের বিরক্ত করব না।

একটু হাসি। বলি, এই তিন মাসের মধ্যে যদি ভারতীকে ফিরিয়ে দাও তাহলে পুরো এক মাসের মাইনের টাকা দিয়ে দুধ আর মালিদা কিনে তোমাকে দেব আর কয়েক শ' গরীব ছেলেমেয়ে তোমার সে প্রসাদ পাবে।

মেসে ফিরে আসার আগে আরেকবার বলি, আম্মা, ছেলেকে কষ্ট দিও না।

দরগা থেকে ফিরতে গিয়ে থমকে দাঁড়াই। কাজী সাহেবের একটা গল্প মনে পড়ে।...জানেন ভাইসাব, এক অন্ধ ভিখারী এখানে ভিক্ষা করত। মোগল সম্রাট ঔরঙ্গজেব এখানে এলে ভিখারি তাঁর কাছেও ভিক্ষা চাইল। সম্রাট রেগে বললেন, সারা জীবন বাবার দরগায় কাটালি শুধু একটা পয়সা ভিক্ষা চেয়ে। বাবার কাছে চোখ দুটো চাইতে পারলি না? আজ বিকেলের মধ্যে যদি তুই বাবার কাছ থেকে দৃষ্টি ফিরে না পাস, তাহলে তোর মৃত্যু হবে।

ঔরঙ্গজেবের কথা শুনে আমি আর ভারতী হাসি।

কাজীসাহেব একবার থেমে আবার শুরু করেন।...মৃত্যুর ভয়ে ভিখারী কাঁদতে কাঁদতে বাবার কাছে গিয়ে লুটিয়ে পড়ল। সারাদিন ধরে পাগলের মত কাঁদতে কাঁদতে বেচারী বেহুঁশ হয়ে পড়ল।

তারপর?

যখন তার জ্ঞান ফিরে এলো, তখন সে তার দৃষ্টি ফিরে পেয়েছে।

বৃদ্ধ কাজীসাহেব নেই কিন্তু তাঁর কথা সব সময় মনে হয়—ভাইসাব, যদি সত্যি প্রাণ মন দিয়ে বাবাকে দুঃখের কথা বলতে পারেন, তাহলে বাবা সে দুঃখ দূর করবেনই। বাবা তাঁর সন্তানদের দুঃখ-কষ্ট সহ্য করতে পারেন না।

যত ভাবি যাব না, কিন্তু শেষ পর্যন্ত প্রায় রোজ বিকেলের দিকেই হাঁটতে হাঁটতে খাজা সাহেবের দরগায় চলে যাই। না গিয়ে পারি না।

সেদিন যখন দরগায় পৌঁছলাম তখন সন্ধ্যের আলো জ্বলে উঠেছে চারিদিকে। মাথা নীচু করে খাজা সাহেবের কবরে প্রণাম করলাম। তারপর ঐ পবিত্র সমাধি ঘরের এক কোণায় চুপ করে বসে রইলাম।

কতক্ষণ এভাবে চুপ করে বসেছিলাম খেয়াল নেই। হঠাৎ একটি মেয়ের কান্না শুনে চমকে উঠলাম।

কে?

আমি চমকে দাঁড়ালাম। দু-এক পা এগিয়ে সম্রাট সাজাহানের তৈরি রুপোর রেলিঙ ধরে দাঁড়াতেই চমকে উঠলাম। ভারতী!

ভারতী কাঁদতে কাঁদতে আমার দুটো হাত জড়িয়ে ধরে বললো, তুমি!

আনন্দে, খুশীতে কাঁদতে কাঁদতে আমরা দুজনে খাজা সাহেবকে প্রণাম করেই আম্মার কাছে ছুটে গেলাম।

———
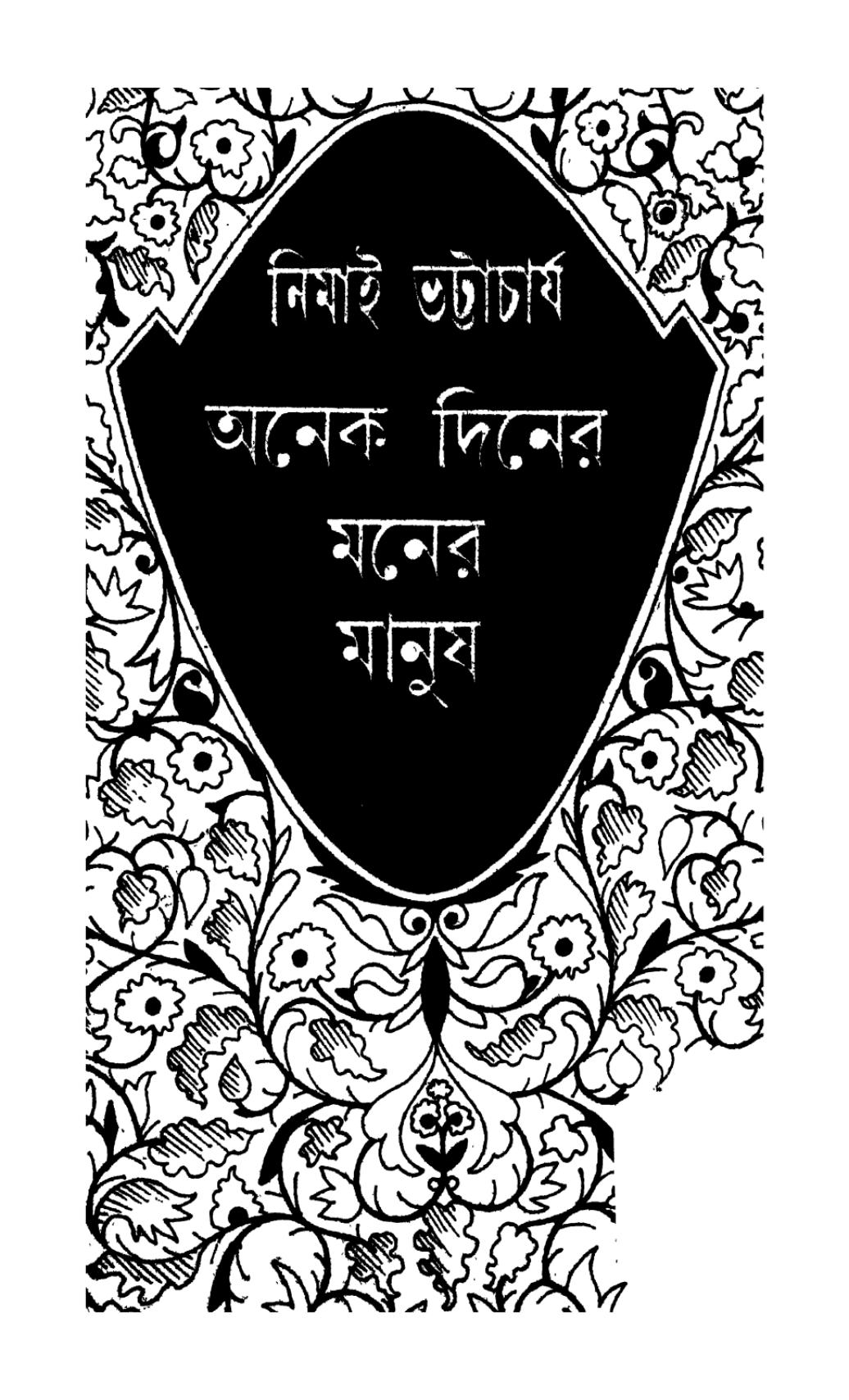
নিমাই ভট্টাচার্য
অনেক দিনের
মনের
মানুষ